মহাত্মা দেবেন্দ্রনাথ

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা ও শ্রীশ্রীচণ্ডীর অনুবাদক
ব্রহ্মচারী প্রাণেশকুমার কর্ত্তৃক
সঙ্কলিত ও প্রকাশিত

কলিকাতা

ইকনমিক প্রেস, ২৫ নং রায়বাগান ষ্ট্রীট,
শ্রীযুক্ত মনোহর সরকার কর্ত্তৃক
মুদ্রিত।

১৩৩৭

মূল্য ১॥০ টাকা,
বাঁধাই ২৲ টাকা।

প্রাপ্তিস্থান—

১। শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ অর্চ্চনালয়,
৩৯নং দেব লেন, ইটালী, কলিকাতা।

২। উদ্বোধন অফিস ১নং মুখার্জ্জির লেন, কলিকাতা।

৩। গুরুসঙ্গ লাইব্রেরী, ২০৮।৪ কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

৪। ভিক্টোরিয়া লাইব্রেরী, ঢাকা।

৫। কলিকাতার প্রধান প্রধান পুস্তকালয়।

প্রকাশক—ব্রহ্মচারী প্রাণেশকুমার
৬নং পাশিবাগান লেন,
কলিকাতা।

উৎসর্গ

যাঁহার আশীর্ব্বাদ লইয়া এই গ্রন্থের প্রণয়ণকার্য্যে ব্রতী হইয়াছিলাম, সেই ভগবান্ শ্রীরামকৃষ্ণ-দেবের প্রতিনিধিস্বরূপ—

পরমপূজ্যপাদ

শ্রীমৎ স্বামী শিবানন্দ মহারাজের

শ্রীকরকমলে

তাঁহারই গুরুভ্রাতার এই জীবনচরিত গ্রন্থখানি সাদরে সমর্পিত হইল।

আশীর্ব্বাদাকাঙ্ক্ষী

শ্রীপ্রাণেশকুমার

নিবেদন

মহাত্মা দেবেন্দ্রনাথের জীবনচরিত প্রকাশের জন্য ভক্তসম্প্রদায় বহুকাল কামনা করিতেছিলেন। তদনুসারে ইহার সঙ্কলনে যে সঙ্কল্প হয় তাহা এতদিনে সিদ্ধ হইল।

পার্থিব সুখ দুঃখলেশশূন্য নহে; শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ অর্চ্চনালয়ের ভূতপূর্ব্ব সম্পাদক ও বঙ্গবাসী কলেজের অধ্যাপক ভাই নলিনীকান্ত সেন গুপ্ত এম, এ, বি, এল, মহাশয় উক্ত জীবনচরিত লিখিবার ভার গ্রহণ করিয়াছিলেন। তিনি সোৎসাহে কার্য্য আরম্ভ করেন এবং অনেক দূর অগ্রসরও হন; কিন্তু, সহসা তাঁহার শরীর অসুস্থ হয় এবং দীর্ঘকাল অসুস্থ থাকিয়া অকালে মানবলীলা সংবরণ করেন—আরব্ধকার্য্য অসম্পূর্ণ থাকিয়া যায়; লিখিতাংশ সংশোধন করিবার অবকাশও তিনি পান নাই। সুতরাং বিশেষ সন্তর্পণে আমাদের এই কার্য্যে হস্তক্ষেপ করিতে হইয়াছে। গুরুগতপ্রাণ নলিনীকান্তের স্বর্গীয় আত্মার শুভেচ্ছা আমরা কামনা করি।

এই গ্রন্থখানি তাঁহারই হস্তলিখিত পুস্তক অবলম্বনে রচিত হইয়াছে। অনেক নূতন কথা পরে সংগৃহীত ও তাঁহার লিখিতাংশ সংশোধিত করা হইয়াছে। 'শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ পুঁথি' হইতেও আমরা প্রাসঙ্গিক কবিতা উদ্ধৃত করিয়াছি এবং শ্রীম-কথিত 'শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ কথামৃত' হইতেও একটী অংশ গ্রহণ করিয়াছি। এতদ্ভিন্ন উদ্বোধন, জন্মভূমি ও তত্ত্বমঞ্জরী পত্রিকায় দেবেন্দ্রনাথ সম্বন্ধে প্রকাশিত প্রবন্ধগুলির যথাযথ ব্যবহার করিয়াছি। শ্রীমৎ স্বামী বিবেকানন্দের মধ্যম ভ্রাতা শ্রীযুক্ত মহেন্দ্রনাথ দত্ত মহাশয়ের দেবেন্দ্রনাথ সম্বন্ধে রচনার কিয়দংশ

পরিশিষ্টরূপে এই গ্রন্থের শেষভাগে সন্নিবেশিত করা হইয়াছে। এই ভাবে পাঁচ ফুলের একটা সাজি সাজাইয়া পাঠক পাঠিকার জন্য এই উপহার প্রস্তুত করা হইল। ইহাতে ত্রুটী থাকা অনিবার্য্য এবং সে সকলই আমাদের। কোনরূপ ত্রুটী প্রদর্শিত হইলে, বারান্তরে কৃতজ্ঞ অন্তঃকরণে সংশোধন করিবার ইচ্ছা রহিল।

এই জীবনচরিত রচনা ও প্রকাশ করিতে আমরা বহু সহৃদয় ব্যক্তির নিকট নানারূপ সাহায্য প্রাপ্ত হইয়াছি। নাম প্রকাশে অনেকের আপত্তি থাকায় উদ্দেশে সকলকে আমাদের আন্তরিক কৃতজ্ঞতা ও ধন্যবাদ জানাইতেছি। ইতি—

শ্রীশ্রীপঞ্চমী
৯ই মাঘ, ১৩৩৭ সাল,
কলিকাতা।

বিনীত
শ্রীপ্রাণেশকুমার

অবতরণিকা

"আমি মূর্খ মানুষ, লেখা পড়া জানি না, 'সেবক' এতদিন 'ষ' দিয়া লিখিতাম ; তোমাদের সংসর্গে এসে 'স' করেছি। কিন্তু আমি এমন একখানা গ্রন্থ পাঠ করেছি, যাহা তোমরা কেউ বড় কর নাই। আমি আমার জীবনগ্রন্থখানি তন্ন তন্ন করে পড়েছি ; আমার জীবনের প্রতি ঘটনা আমি নিরপেক্ষভাবে বিচার করে দেখে চলে এসেছি। তাই বিদ্বান্ পণ্ডিতগণও আমার নিকট কথা শুনিতে আসেন।"

যাঁহার জীবনেতিহাস লিখিত হইয়াছে, তাঁহার নিকট আমরা এইরূপই শুনিতাম। বাস্তবিক পক্ষে তাঁহার জীবনচরিত তাঁহারই দ্বারা যথাযথ বর্ণিত হইতে পারে। অন্যের পক্ষে তাঁহার জীবনের নিগূঢ় কেন্দ্রস্থলে দাঁড়াইয়া সমগ্র জীবনের ঘটনাপ্রবাহের মধ্যে ব্যক্তিগত বিশেষত্বের পরিস্ফুট অভিব্যক্তি অবলোকন করা একরূপ অসম্ভব। আর এইরূপ দৃষ্টিবিহীনের পক্ষে জীবনচরিত লেখা, আর অন্ধের হস্তিরূপ বর্ণনা করা একই কথা। 'যদ্দৃষ্টং তল্লিখিতং'—জীবনের বিভিন্ন ঘটনাবলী পরস্পর অসংলগ্ন ভাবে দৈনিক পত্রিকার ন্যায় বর্ণিত ও পঠিত হইতে পারে মাত্র।

মানব-মন কোন মহাপুরুষের জীবনী সেরূপ নিরস ভাবে পড়িয়া কালক্ষেপ করিতে সম্মত নহে। মহাপুরুষের অমৃত-নিঃসরিণী জীবন-ধারা হৃদে অঙ্কিত করিয়া, আজীবন তাহা হইতে প্রয়োজনানুরূপ সুধাপান ও পূর্ণত্বের প্রেরণালাভই তাদৃশ জীবনচরিত পুনঃ পুনঃ পাঠের অভিলক্ষ্য। এইরূপ আশার পরিতৃপ্তি-সম্পাদন করিবার উপযুক্ত

চিত্রকর আমরা নহি। বিশেষতঃ, যাঁহার জীবন নিভৃতে নীরব সাধনা-ময় ছিল—সর্ব্বদা সর্ব্বকার্য্যে আত্মপরিচয় গোপন করা যাঁহার ব্রত ছিল—যাঁহার জীবনে লৌকিক বিদ্যার গরিমা বা ঐশ্বর্য্যের ঝঙ্কার—অথবা জীবনব্যাপী ঘটনাপারম্পর্য্যের বাহুল্য মোটেই ছিল না—যাঁহার কর্ম্মভূমি অতীব সঙ্কীর্ণ—পরিচিত বন্ধু বান্ধবও যাঁহার মুষ্টিমেয়, তাঁহার জীবনের নীরবতারূপ সরসীর পঙ্কিল গুরুস্থ তলদেশ হইতে মধুময় দেবচরিত্রের, শিশির-স্নাত স্নিগ্ধ পঙ্কজ কোরকের ন্যায় শ্রীরামকৃষ্ণ-সূর্য্যোদয়ে পূর্ণবিকাশ প্রদর্শন আমাদের পক্ষে অসাধ্য। কেন না, বাহ্য-বিকার-পরিশূন্য নিস্তব্ধ গম্ভীরতার মধ্যে আত্মার ক্রমিক বিকশনের পরিপাক প্রক্রিয়া প্রদর্শন অতীন্দ্রিয় শক্তিসাপেক্ষ। সেরূপ শক্তি আমাদের নাই। আমরা তাঁহার স্বর্গীয় সুঠাম রূপজ্যোতির্দর্শনে ও তৃষিত সংসার মরুভূমিতে তাঁহার প্রেমবিগলিত মধুর সম্ভাষণ ও নিরন্তর আশ্বাস বাণীতে বিমুগ্ধ হইয়া সে দিক নিরীক্ষণ ও অনুশীলন করিতে অবকাশ পাই নাই। আমরা আমাদের আত্মতৃপ্তির সংবাদ সাধারণের নিকট জ্ঞাপনার্থ আলোচ্য জীবনের একটী রেখাপাত মাত্র করিয়া যাই-তেছি। ভবিষ্যতে যদি কখনও তেমন কুশলী চিত্রকর তুলিকা গ্রহণ করেন, তাঁহারই নিমিত্ত উপকরণস্বরূপ মহাত্মা দেবেন্দ্র-নাথের জীবনের ঘটনাবলী তাঁহার মুখ হইতে যেরূপ আমরা শুনিয়াছি এবং প্রত্যক্ষ করিয়াছি, তাহাই বর্ত্তমান গ্রন্থমধ্যে লিপিবদ্ধ করিলাম। প্রসঙ্গক্রমে তাঁহার লিখিত পত্রাংশও সন্নিবেশিত হইয়াছে। এই সমুদয় হইতে সুধী পাঠক ও সাধক আপন চিন্তা ও সাধনাবলে মহাত্মা দেবেন্দ্র-নাথের জীবনের মাধুর্য্যটুকু আহরণ করিয়া লইবেন।

যে সমুদয় মহাত্মা, যুগাবতার ভগবান্ শ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংস-দেবের সমন্বয়-ধর্ম্মের আলোকে আলোকিত হইয়া জনসমাজে তাঁহার

প্রদর্শিত সনাতন ধর্ম্ম নবযুগোপযোগী করিয়া প্রচারিত করিয়া গিয়াছেন বা করিতেছেন, দেবেন্দ্রনাথ সেই অন্তরঙ্গগণের অন্যতম। তাঁহার আশ্রিত ভক্তগণকর্ত্তৃক তাঁহারই পদাঙ্ক অনুসরণ করিয়া এই শ্রীরামকৃষ্ণময় গ্রন্থখানি গঙ্গাজলে গঙ্গার্চ্চনার ন্যায় শ্রীরামকৃষ্ণ অর্চ্চনার্থ সমর্পিত হইল। পাঠকবর্গ প্রসন্নচিত্তে প্রসাদ গ্রহণ করিলে কৃতার্থ হইব।

সূচীপত্র

প্রয়োজনীয় ভ্রমসংশোধন

পৃষ্ঠা	পংক্তি	অশুদ্ধ	শুদ্ধ
১৯১	১৯	গোপালকৃষ্ণ	কৃষ্ণগোপাল
ঐ	ঐ	মন্মথনাথ শীল	মন্মথনাথ শী
২৬৭	১৩	একশ	লাকশ

মহাত্মা দেবেন্দ্রনাথ
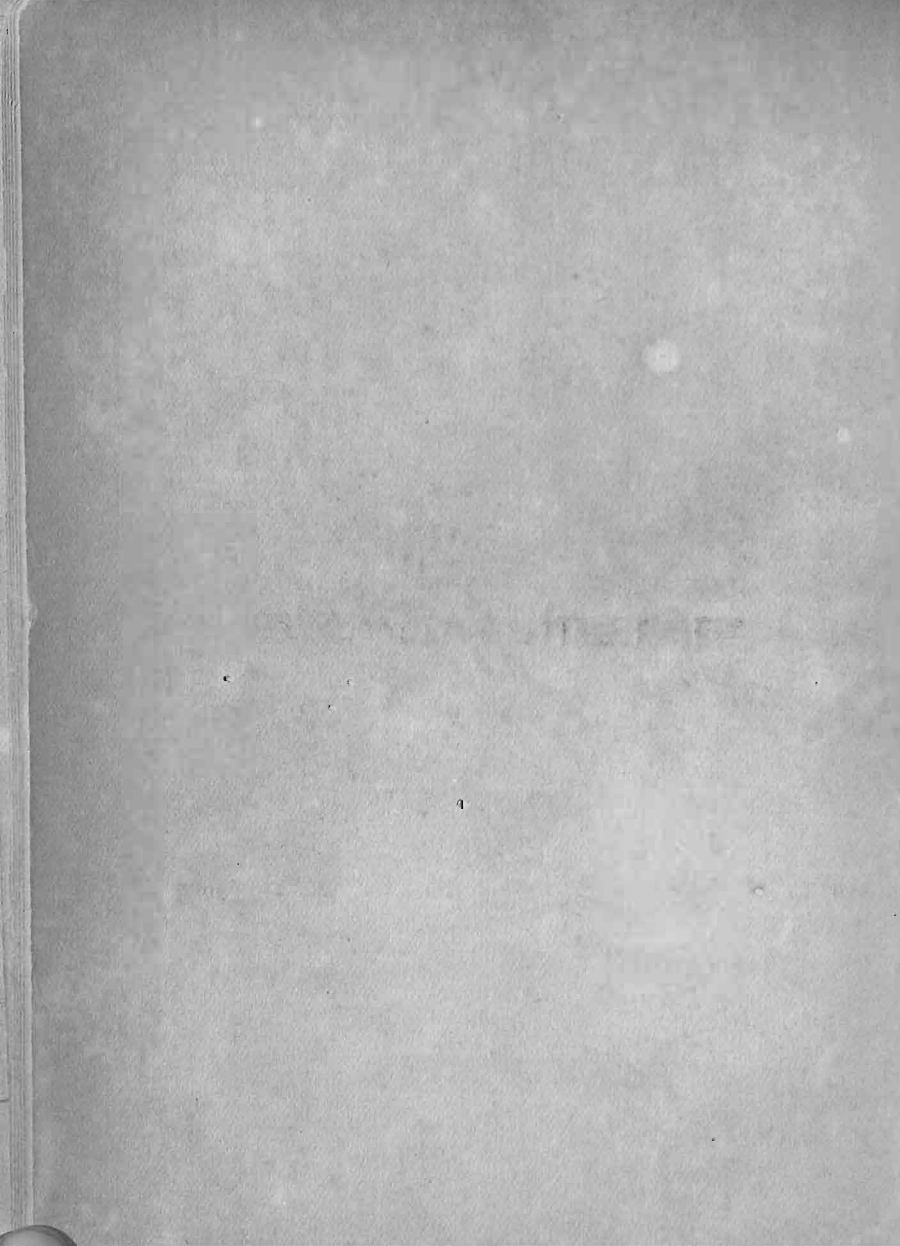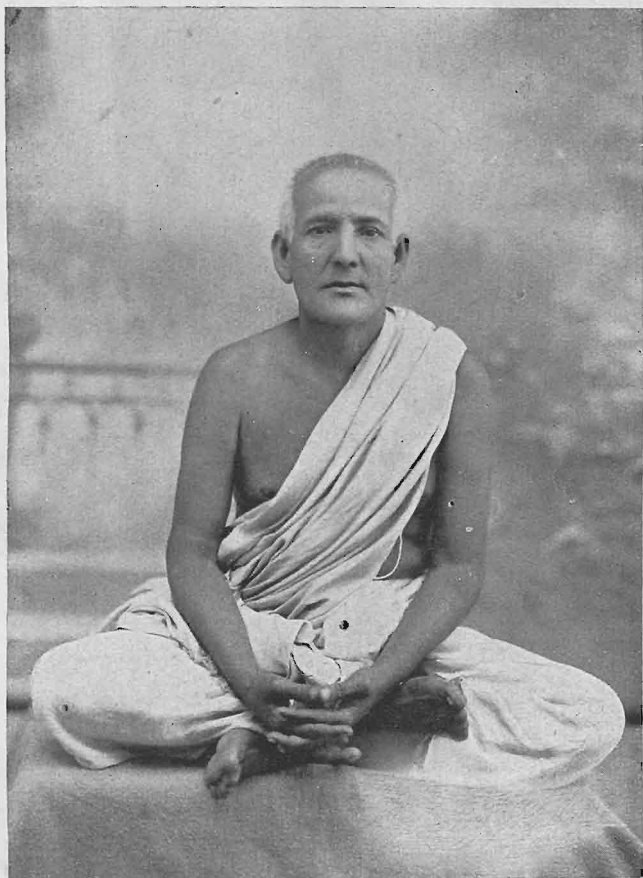
ভাবস্থ—দেবেন্দ্রনাথ

মহাত্মা দেবেন্দ্রনাথ

প্রথম পরিচ্ছেদ

জন্ম, জন্মস্থান ও বংশপরিচয়।

জন্ম—বাংলা ১২৫০ সন, ২৪শে পৌষ, রবিবার,—ইং ১৮৪৪, জানুয়ারী।

সুজলা, সুফলা, শস্যশ্যামলা, বীরপ্রসবিনী বঙ্গজননীর যে ভূমিভাগ প্রাচীনকাল হইতে রাজন্যবর্গ ও মহাত্মগণকর্তৃক গৌরবান্বিত হইয়া আসিয়াছে, সেই প্রতাপাদিত্য ও সীতারামের যশঃস্থলী—রূপ-সনাতন, লোকনাথ, যবন-হরিদাস ও শ্রীজীব গোস্বামী প্রভৃতির নাম ও প্রেমপ্রচারের আদি প্রস্রবণ যশোর—বর্ত্তমান যশোহর-খুলনা—এখনও মহাপুরুষ ও কবীন্দ্রগণের আবির্ভাবদ্বারা পুণ্য-সৌরভ বিকীর্ণ করিতেছে। সপ্তাশীতিবর্ষ পূর্ব্বে, বাংলা ১২৫০ সালের ২৪শে পৌষ, পুষ্যানক্ষত্রান্বিত কৃষ্ণাদ্বিতীয়া তিথিতে, যশোহর জেলার অন্তঃপাতী নড়াইল মহকুমার অধীন জগন্নাথপুর গ্রামে ব্রাহ্মণকুলে মহাত্মা দেবেন্দ্রনাথ জন্মগ্রহণ করেন। তাঁহার পিতার নাম ৺প্রসন্ননাথ মজুমদার, মাতা ৺বামাসুন্দরী দেবী। জন্মের দুইমাস পূর্ব্বে পিতা স্বর্গারোহণ করেন। মাতা বৃদ্ধ বয়স পর্য্যন্ত জীবিতা ছিলেন।

কোষ্ঠীফল বিচার

দেবেন্দ্রনাথের মাতা এক বিজ্ঞ জ্যোতির্ব্বিদ্‌দ্বারা নবজাত পুত্রের জন্মপত্রিকা প্রস্তুত করাইয়াছিলেন। কোষ্ঠী খানি এক্ষণে আমাদের

নিকট রহিয়াছে। তাহার আলোচনা করিলে দেখা যায় যে, জাতক সৎস্বভাবান্বিত ধার্ম্মিক ও যোগী হইবে। ইহাতে জন্মপতি, ধনপতি, বিদ্যাপতি, রিপুপতি, ধর্ম্মপতি ও কর্ম্মপতি ধর্ম্মস্থানে অধিষ্ঠিত এবং জায়াপতি, নিধনপতি, আয় ও ব্যয়পতি কর্ম্মস্থানে অধিষ্ঠিত হওয়ায় জীবন ধর্ম্ম ও তপঃকর্ম্মময় হইয়াছিল। এ বিষয়ে মাত্র দুই একটী শাস্ত্রবচন এখানে উদ্ধৃত করিয়া আমরা নিরস্ত হইব। জন্মকুণ্ডলী পরপৃষ্ঠায় প্রদত্ত হইল।

"ধর্ম্মকর্ম্মাধিনেতারৌ একত্বে যোগ কারকৌ।
অন্যত্রিকোনপতিনা সম্বন্ধো যদি কিং পরং॥
যত্র তত্র স্থিতো ভৌম গুরু যুক্তো ভবেৎ যদি।
তত্রোচ্চ ফলমাপ্নোতি স্যাদুচ্চে দ্বিগুণং ফলম্॥"—পরাশরঃ

এই বচনানুসারে—জাতকের বৃষলগ্নে নবম-দশমপতি অর্থাৎ ধর্ম্ম ও কর্ম্মপতি একাই রাজযোগ কারক হইয়া, অন্য ত্রিকোণপতি বুধের সহিত যে সম্বন্ধ যোগ করিয়াছে তাহা একটী প্রবল রাজযোগ এবং ধার্ম্মিকযোগ বিশেষ। ইহার সহিত আবার গুরু ও উচ্চস্থ মঙ্গল যোগ হওয়ায় আরও উচ্চ ফলপ্রদ হইয়াছে।

"মতিস্তস্য তিক্তা ন তিক্তং তু শীলং,
রতির্যোগশাস্ত্রে গুণো রাজসঃ স্যাৎ।
সুহৃদ্বর্গতো দুঃখিতো দীন বুদ্ধ্যা,
শনি র্ধর্ম্মগঃ শর্ম্মকৃৎ সন্ন্যাসং বা॥"—চঃ চিঃ

বলবান্ শনি ধর্ম্মভাবস্থ হইলে জাতকের মনোবুদ্ধি তিক্তা অর্থাৎ সাংসারিক বিষয়ে বিরক্ত ভাবাপন্ন হয়, কিন্তু সে সৎস্বভাবান্বিত, রজোগুণী, যোগশাস্ত্রে অনুরাগী বা যোগাভ্যাসে প্রীতিযুক্ত কিংবা কল্যাণকারী সন্নাসী হয়।

জন্মকুণ্ডলী।

জন্মসময়—শকাব্দা—১৭৬৫।৮।২৩।২০।৫০।
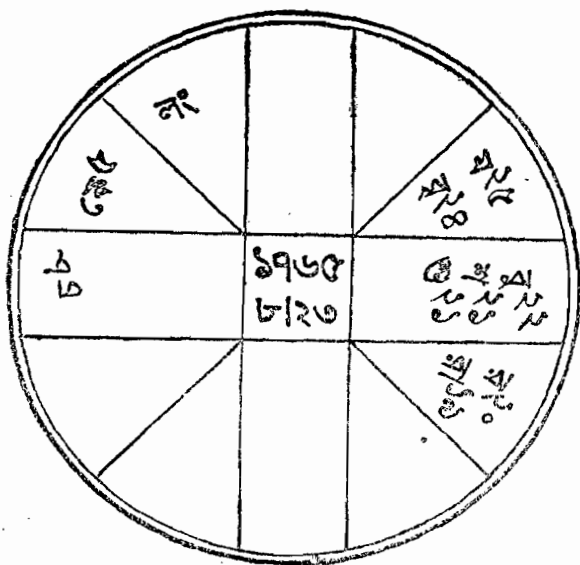
জন্মস্থান—জগন্নাথপুরের প্রাচীন ইতিহাস।

জগন্নাথপুর গ্রাম প্রসিদ্ধ ভৈরব নদের উপকূলে এবং পূর্ব্ববঙ্গ রেলপথের খুলনা-শাখাস্থ চেঙ্গুটিয়া ষ্টেশনের এক মাইল উত্তর-পশ্চিমে অবস্থিত। এক কালে ভৈরব বেগবান্ ও আয়তনে বিশাল ছিল এবং জগন্নাথপুরও সমৃদ্ধিসম্পন্ন ছিল। এখন উভয়েরই পূর্ব্বগৌরব লুপ্ত হইয়াছে।

প্রবাদ আছে যে, মহারাজ বল্লালসেনের পিতা বিজয়সেনের জগন্নাথপুরে একটী রাজবাড়ী ছিল। তিনি ও তাঁহার পুত্র বল্লালসেন

এবং পৌত্র লক্ষ্মণসেন এইস্থানে বহু দেবতার প্রস্তর-বিগ্রহ ও ইষ্টক-নির্ম্মিত মন্দির এবং জলাশয়াদি প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন। 'যশোহর-খুলনার ইতিহাস' লেখক শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র মিত্র মহাশয় অনুমান করেন যে, পূর্ব্বকালে এই জগন্নাথপুর একটী প্রকাণ্ড রাজধানী ছিল। কালে ভৈরব নানাভাবে প্রবাহিত হইয়া স্থানটীকে খণ্ড খণ্ড করিয়া বিভক্ত করিয়াছে—উত্তরদিকে বহির্ভাগ বা বাহিরভাগ, পূর্ব্বদিকে দেবভাগ, দক্ষিণদিকে তপোবনভাগ বা তর্পণভাগ বা তপনভাগ এবং পশ্চিমদিকে প্রেমভাগ বা পমভাগ। বাহিরভাগে রাজবর্ত্ম, দেবভাগে প্রধান প্রধান দেবালয়, তপনভাগে নিষ্ঠাবান্ ব্রাহ্মণদিগের বাসস্থান এবং প্রেমভাগে পান্থনিবাস ছিল। চারিভাগের পরিমাণ—চারি মাইল দীর্ঘ এবং চারি মাইল প্রস্থ। পূর্ব্বকীর্ত্তির নিদর্শন এখনও অনেক দেখিতে পাওয়া যায়।

"এক সময়ে তপনভাগ বা তপোবন ভাগ এবং প্রেমভাগ পরস্পর সংলগ্ন গ্রাম ছিল এবং উহা সেখহাটী বা জগন্নাথপুরেরই অংশ-বিশেষ ছিল।"—যশোহর-খুলনার ইতিহাস, প্রথম খণ্ড, ৩৫৩ পৃষ্ঠা।

"যে ভগবৎপ্রেমের লীলারঙ্গে এক সময়ে সমগ্র ভারতভূমি প্লাবিত হইয়াছিল, সে প্রেমের আদি প্রস্রবণভূমি প্রেমভাগ আজ শ্মশানে পরিণত হইয়া রহিয়াছে। যাঁহারা মথুরা-বৃন্দাবনের অসংখ্য লুপ্ত তীর্থের পুনরুদ্ধার করিয়া কৃষ্ণলীলা পুনর্জ্জীবিত করিয়াছিলেন, আজ তাঁহাদের জন্মভূমির গুপ্ততত্ত্ব উদ্ঘাটিত করিবার কেহ নাই।" ঐ—৩৫২-৩৫৩ পৃঃ।

যশোহরের গৌরব।

"আজ যে মথুরা বৃন্দাবনের যেখানে সেখানে কৃষ্ণলীলার ঐতিহাসিকতা প্রতিপাদন করিতেছে, আজ যে ব্রজমণ্ডলে বৃন্দাবন-

ধাম বাঙ্গালীর প্রতিপত্তি, বাঙ্গালীর কীর্ত্তিকথায় পূর্ণ হইয়া রহিয়াছে, রূপ-সনাতন তাহার মূল। এ বিষয়ে যশোহরবাসীর যথেষ্ট গৌরব করিবার আছে।"—ঐ ৩৫৪ পৃঃ।

আরও গৌরব করিবার আছে যে, বর্ত্তমান যুগের আদিকবি মধুসূদন, স্বভাবকবি কৃষ্ণচন্দ্র মজুমদার এবং ঋষিকবি সুরেন্দ্রনাথ এই যশোহর-মৃত্তিকাসম্ভূত।

প্রেমভাগে রূপ-সনাতনের কীর্ত্তি—পশ্চিমের গ্রাম জগন্নাথপুর।

এই প্রেমভাগ এখন বাস্তবিকই পূর্ব্বকীর্ত্তির এক বিরাট সমাধি-ভূমি। এখানে আজিও রূপ-সনাতনের বসতবাটী, বাঁধাঘাট, পুষ্করিণী, মঠবাড়ী, ফুলবাড়ী, বাগানবাড়ী, দেবালয় প্রভৃতির প্রকৃষ্ট পরিচয় পাওয়া যায়। মূল জগন্নাথপুর এই প্রেমভাগ বা পমভাগের পশ্চিমের গ্রাম। ইহা এক্ষণে আয়তনে সঙ্কীর্ণ, হতশ্রী, জনবিরল ক্ষুদ্রগ্রামে পর্য্যবসিত।

মজুমদারবংশ—পীরালী।

প্রায় দুইশত বৎসর পূর্ব্বে জগন্নাথপুরে মজুমদারবংশের বিশেষ খ্যাতি ও প্রতিপত্তি ছিল, এবং এই বংশে অনেক ভক্তিমান্ ব্যক্তি জন্মগ্রহণ করত দেশের প্রভূত কল্যাণসাধন করিয়াছিলেন বলিয়া কথিত আছে। কলিকাতার বিখ্যাত ঠাকুরবংশের ন্যায় মজুমদার-বংশও সংশ্রব দোষে "পীরালী" আখ্যাপ্রাপ্ত হন। উভয়ই ভট্টনারায়ণের সন্তান—শাণ্ডিল্য গোত্রীয় কুশারী গাঁইভুক্ত বন্দ্যোবংশীয় ব্রাহ্মণ। পীরালীগণ সমাজে নিন্দনীয় হইবার কারণ তাঁহাদের স্বধর্ম্মানুরাগ ও হৃদয়ের প্রশস্ততা; যাঁহাদিগকে মুসলমান শাসকগণ বল ও কৌশল-পূর্ব্বক আচারভ্রষ্ট বা মুসলমান করিয়াছিল তাঁহাদের আত্মীয়গণকে

সমাজ পরিত্যাগ করিলেও ইঁহারা পরিত্যাগ করিতেন না। সমাজের মহা অন্ধযুগে ইঁহাদের পূর্ব্বপুরুষগণ যে সৎসাহস ও মহত্ত্বের পরিচয় দিয়াছিলেন তাহার উপকারিতা সম্বন্ধে বিশেষ উল্লেখ বর্ত্তমানে নিষ্প্রয়োজন। ইঁহাদের দ্বারাও যশোহর যথেষ্ট গৌরবান্বিত হইয়াছে।

পূর্ব্বকালে ভারতের সর্ব্বত্র সঙ্গতিসম্পন্ন গৃহস্থমাত্রেরই গৃহে দেবালয়, গোশালা, অতিথিশালা, চতুষ্পাঠী, পুস্তকাগার বিরাজ করিত। এই সমুদয়ই তখন হৃদয়বান্ ও অর্থবানের অর্থ সামর্থ্যের পরিচায়ক ছিল। এখনও কুত্রাপি শ্রীরাধাগোবিন্দ বিগ্রহ বা শালগ্রামশীলা অতি দীনভাবে পূজিত হইয়া পুণ্যবান্ পূর্ব্বপুরুষগণের পরিচয় প্রদান করিতেছে। কোথাও শ্রদ্ধাবান্ বংশধরকর্ত্তৃক বংশগৌরবের পুনঃ প্রতিষ্ঠা করিতে দেখা যাইতেছে। কোথাও বা অনর্থজ্ঞানে ঐ সমুদয় পরিত্যক্ত হইয়া তদ্বিনিময়ে বিদেশীয় ভাবে বিদেশজাত বিলাস-দ্রব্যসম্ভারে গৃহপূর্ণ হইয়া উঠিতেছে; অধিকাংশ স্থলে অন্নাভাবে সমস্তই লুপ্তপ্রায় হইয়া যাইতেছে!

বংশের গোবিন্দজী জাগ্রত দেবতা।

জগন্নাথপুরের মজুমদারগণ এককালে ধর্ম্মনিষ্ঠ সঙ্গতিসম্পন্ন গৃহস্থ ছিলেন।* তাঁহাদের গৃহে সমর্থ গৃহস্থের অবশ্যকরণীয় উক্ত অনুষ্ঠান-গুলি সকলই আচরিত হইত। দেবেন্দ্রনাথের জন্মকালে আর্থিক

---

* একদিন শ্রীরামকৃষ্ণপরমহংসদেবের পরম ভক্ত শ্রীযুত বলরাম বাবুর বাড়ীতে বসিয়া পূজ্যপাদ স্বামী বিবেকানন্দের মধ্যম ভ্রাতা শ্রীযুক্ত মহেন্দ্রনাথ দত্ত মহাশয় ও অন্যান্য ভক্তগণের নিকট দেবেন্দ্রনাথ আপন বংশাবলীকথনপ্রসঙ্গে বলিয়াছিলেন যে তাঁহার পূর্ব্বপুরুষ একজন সন্ন্যাসী ছিলেন। ঐ সন্ন্যাসী একদা কোন এক ধনবান্ ব্রাহ্মণ গৃহস্থের অতিথি হন। বহু কন্যাদায়গ্রস্ত গৃহস্থ কৌশলে সন্ন্যাসীকে এক প্রতিজ্ঞাবদ্ধ করেন। প্রতিশ্রুতি রক্ষার্থ সন্ন্যাসী নয়টী কন্যার পাণিগ্রহণ করিতে বাধ্য হন এবং

স্বচ্ছলতা না থাকিলেও দেবতা-বিগ্রহের পূজা যথাশক্তি ভক্তিসহকারে নিত্যই সম্পাদিত হইত। তাঁহাদের বংশের বিগ্রহ ৺গোবিন্দজি জাগ্রত দেবতা বলিয়া দেশস্থ হিন্দু মুসলমান সকলেই মান্য করিত। ৺গোবিন্দজি সম্বন্ধে অনেক অলৌকিক কিংবদন্তী এখনও শুনিতে পাওয়া যায়। বংশধরগণকে ৺গোবিন্দজি অনেক সময় দর্শনাদি দিয়া কৃতার্থ করিতেন। ৺গোবিন্দজি দেখিতে অতি সুন্দর। তৎপ্রতি আকৃষ্ট হইয়া শৈশবে দেবেন্দ্রনাথ তাঁহাকে লইয়া অন্যের অলক্ষ্যে খেলিতে ও আলিঙ্গন করিতে বড় ভালবাসিতেন। অনেক সময় কোলে তুলিতে যাইতেন, না পারিয়া বিগ্রহের মুখের দিকে চাহিয়া কাঁদিতেন। এই অজ্ঞান বালকের ক্রন্দনের সহিত বার্দ্ধক্যে ভাবস্থ দেবেন্দ্রনাথের প্রেমবিগলিত অশ্রুধারার কি কোন সম্বন্ধ আছে ?

শ্বশুরের সম্পত্তি লাভ করেন। ভগবদ্ অভিপ্রায় জানিয়া অতিশয় নিষ্ঠাপূর্ব্বক সন্ন্যাসী সংসারধর্ম্ম পালন করিতে থাকেন। দেবেন্দ্রনাথ তাঁহার অষ্টম পুরুষ পরে জন্মগ্রহণ করেন।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

গ্রাম্য শৈশব—খেলাধূলা—বিদ্যারম্ভ।

(১২৫২-৬৫)

সংসারে—জ্যেষ্ঠতাত, স্নেহশীলা জননী, অগ্রজ সুরেন্দ্রনাথ ও জ্যেষ্ঠা ভগিনী।

পিতৃহীন বালক অশেষস্নেহশীলা জননীর ক্রোড়ে স্থান পাইয়া শশিকলার ন্যায় দিন দিন বর্দ্ধিত হইতে লাগিল। রূপজ্যোতি দর্শকবৃন্দের নয়নানন্দদায়ক ছিল। তাহাই আবার চরমে স্বর্গীয় শোভায় উদ্ভাসিত হইয়া ভক্তগণের চিত্তবিনোদন করিত। দেবেন্দ্রনাথের জ্যেষ্ঠভ্রাতা সুবিখ্যাত ঋষিকবি সুরেন্দ্রনাথ। সুরেন্দ্রনাথ দেবেন্দ্রনাথ হইতে পাঁচ বৎসরের বড়। তাঁহাদের এক জ্যেষ্ঠা ভগিনী ছিলেন। পিতার পরলোকপ্রাপ্তির পর জ্যেষ্ঠতাত সংসারের ভার গ্রহণ করেন। যৎসামান্য জমিজমা ছিল, তাহার দ্বারাই সাংসারিক ব্যয় সঙ্কুলন হইত।

দেবেন্দ্রনাথ মাতার নিতান্ত আদরের ও অনুগত।

দেবেন্দ্রনাথ মাতার অতি আদরের সন্তান; তাঁহারই মুখ চাহিয়া পতিশোক লাঘব করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। দেবেন্দ্রনাথও মাতার নিতান্ত অনুগত ছিলেন। মাতা ও সন্তানের মধ্যে দীর্ঘকালের বিচ্ছেদ খুব কমই ঘটিয়াছিল। মার অনুমতি ব্যতীত বা অসন্তোষ জন্মাইয়া কোন কাজই তিনি জীবনে করেন নাই—এইরূপ আমাদিগকে বলিতেন। আরও বলিতেন,—"এইরূপ প্রসন্নময়ী জননীর ক্রোড়ে লালিত পালিত না হইলে আমি জীবনে কৃতার্থতা লাভ করিতে পারিতাম কি না সন্দেহ।" বাস্তবিক মাতার উপরই সন্তানের ভবিষ্যৎ জীবন অনেক নির্ভর করিয়া থাকে।

দুরন্ত বালক দেবেন্দ্রনাথ।

মাতার আদর পাইয়া চঞ্চল বালক দেবেন্দ্রনাথ একটু দুরন্ত হইয়া উঠিয়াছিলেন। সর্ব্বদাই খেলাধূলা, ছুটাছুটীতে রত থাকিতেন। কিন্তু কখন কাহারও মনে ক্লেশ দিয়া বা কাহারও সহিত রূঢ় ব্যবহার-দ্বারা আমোদ করিতে ভালবাসিতেন না; বরং নিজে আনন্দ করা ও পরকে আমোদিত করাই তাঁহার অন্তরের অভিলাষ ছিল। পরকে মুহূর্ত্তে আপন করিয়া ফেলিতে—প্রাণদিয়া ভালবাসিতে যে তিনি সিদ্ধিলাভ করিবেন, তাহারই ইঙ্গিত আমরা এই দুরন্ত বালকের সচঞ্চল ধূলা খেলার মধ্যে পাইয়া থাকি।

ভালবাসাপ্রিয় লাবণ্যের খনি দেবেন্দ্রনাথ।

বালক দেবেন্দ্রনাথ দেখিতে অতি সুকুমার গৌরবর্ণ—লাবণ্যের খনি! হাসিখুসী ছেলেটীকে পল্লীস্থ সকলেই দেখিতে আসিত ও আদর করিয়া কোলে তুলিয়া লইত। বালকও নিঃসঙ্কোচে সকলের নিকট যাইত এবং যে যাহা দিত তাহাই খাইত। ভালবাসাপ্রিয় দেবেন্দ্রনাথ কখনও ভালবাসার ডাক বা সামগ্রী প্রত্যাখ্যান করিতে পারিতেন না। ইহা আমরাও পরে স্বচক্ষে সর্ব্বদা দেখিয়াছি। তিনিও শৈশবাবধি তাঁহার নিজ স্বভাব সম্বন্ধে এইরূপই মত প্রকাশ করিতেন, আর বলিতেন—"ভালবাসায় কোন দোষ নাই। ভালবাসার গুণে বিষও অমৃত হয়। দেখ, আমাদের এক বৃদ্ধা পরিচারিকা ছিল। সে আমাকে এত ভালবাসিত যে, আমার কোনরূপ কষ্ট দেখিলে সহ্য করিতে পারিত না। আমার জ্বর হইলে খাবার কষ্ট দেখিয়া গোপনে আমাকে কুপথ্য খাইতে দিত। আর বলিত—'খাও না, সেরে যাবে।' কি আশ্চর্য্য! সে সমুদয় খাইয়া আমার কখনও রোগ লাঘব বই বৃদ্ধি পায় নাই।"

বামহস্ত ভঙ্গ।

দেবেন্দ্রনাথ মাতার অতিশয় স্নেহের সন্তান হইলেও মাতা তাঁহার দৌরাত্ম্যের প্রশ্রয় দিতেন না। অন্যায় কার্য্য করিতে দেখিলে যথোচিত তাড়না করিতে কুণ্ঠিত হইতেন না। একদিন চাঞ্চল্য একটু বেশী মাত্রায় প্রকাশ পাইলে মাতা বিরক্ত হইয়া তাঁহাকে প্রহার করিতে উদ্যত হন; প্রহারের হস্ত হইতে নিষ্কৃতি পাইবার জন্য বালক লম্ফ প্রদান করে এবং পড়িয়া যাইয়া বামহস্তখানি ভাঙ্গিয়া ফেলে। হস্তখানি লইয়া অনেক দিন ভুগিতে হইয়াছিল। হস্তটী পূর্ব্বাবস্থা আর প্রাপ্ত হয় নাই; একটু বাঁকিয়া গিয়াছিল। পূজ্যপাদ স্বামী বিবেকানন্দ মহাত্মা দেবেন্দ্রনাথের বাল্যকালের কথা শুনিয়া বলিয়াছিলেন,—"যে সব ছেলে অতিশয় শান্ত শিষ্ট, জোর ক'রে কোন কথা বল্‌তে বা কোন কাজ কর্‌তে পারে না, তাহাদের দ্বারা কোন মহৎ কার্য্য সম্পাদিত হয় না। ছেলেবেলায় খুব দৌড়ঝাঁপ কর্‌বে, খুব সাহসী হবে, তবে ত বড় হ'লে বড় কাজ কর্‌তে পার্‌বে।" বলা বাহুল্য, স্বামীজি স্বয়ংই নিজ বাক্যের উদাহরণস্থল।

সন্ন্যাসীর আদেশ।

মাতা ও ভ্রাতা প্রভৃতি আত্মীয় স্বজনের স্নেহাতিশয্যে পরিবর্দ্ধিত দেবেন্দ্রনাথের স্বভাব অভিমানী হইয়া উঠিয়াছিল; তাঁহাকে কেহ কখন তিরস্কার বা গায়ে হাত দিলে তাঁহার অসহ্য অপমান বোধ হইত। একদিন মাতা তাঁহাকে সামান্য প্রহার করেন, তাহাতে বালক কাঁদিতে কাঁদিতে নীলবর্ণ হইয়া যায় ও মূর্চ্ছিত হইয়া পড়ে। এই ঘটনার অল্পদিন পরে হঠাৎ এক সন্ন্যাসী আসিয়া মাতা বামাসুন্দরী দেবীকে—"মা, তোমার ছেলের গায়ে কখন হাত তুলিও না"—এই

বলিয়া অদৃশ্য হন। মাতা তদবধি অভিমানী পুত্রের আত্মমর্য্যাদা কখনও ক্ষুণ্ণ করেন নাই।

পাঠশালায় দেবেন্দ্রনাথ।

ক্রমে বিদ্যাভ্যাসের সময় উপস্থিত হইলে দেবেন্দ্রনাথকে গ্রাম্য পাঠশালায় ভর্ত্তি করা হয়। লেখাপড়ায়, বড় মন ছিল না, খেলা করিয়াই দিন কাটিয়া যাইত। আদুরে ছেলের উপর তেমন শাসনও চলিত না, কাজে কাজেই কোন উন্নতি না দেখিয়া অপর এক গ্রামে এক আত্মীয়ের বাড়ীতে তাঁহাকে পাঠান হয়। সেখানে কিছুদিন থাকিয়া পড়া শুনা করিতে লাগিলেন। কিন্তু ভালবাসার অভাব ও আদর যত্নের বৈষম্য দেখিয়া তথায় তাঁহার মন বেশী দিন টিকিল না।

হস্তাক্ষর সুন্দর—দলিল-পত্রে ও হিসাবে পটুতা লাভ।

অল্পকাল পরে স্নেহপিপাসু বালক মাতৃক্রোড়ে ফিরিয়া আসিল এবং আবার নিজ গ্রামের পাঠশালায় পড়িতে লাগিল। এখানে তাঁহার হস্তাক্ষর, বড়ই সুন্দর হইয়া উঠিয়াছিল * এবং হিসাব ও দলিলপত্র লিখনে বেশ পটুতা জন্মিয়াছিল।

গ্রামে "মাঠের মাঝে আকাশ ধরা।"

এই সময় মাঠে, মেঘনির্ম্মুক্ত আকাশের নিম্নে, নদীতটে এবং গ্রাম্য উপবনে একাকী ভ্রমণ করিয়া তিনি প্রকৃতি-দেবীর সহিত যে ঘনিষ্ঠতা লাভ করিয়াছিলেন, তাহার কিঞ্চিৎ পরিচয় তাঁহার রচিত সঙ্গীত মধ্যে আমরা পাইয়া থাকি। গ্রাম্য-শৈশবের এই সমুদয় অভিজ্ঞতার কথা তিনি অতিশয় আহ্লাদের সহিত বৃদ্ধ বয়সে বর্ণনা করিতেন। আমরা একদিনের কথা মাত্র

* বৃদ্ধ বয়সের কম্পিত হস্তের প্রতিলিপি অন্যত্র দেওয়া হইয়াছে।

এখানে উল্লেখ করিতেছি,—একটী চতুর গোপ-বালক দেবেন্দ্রনাথকে অতিশয় সরল বিশ্বাসী ভাল মানুষটী দেখিয়া কৌতূহলপরবশ হইয়া তাঁহাকে একদিন মাঠের প্রান্তে আকাশ ধরিতে বলে। তিনি মাঠময় দৌড়াইতে লাগিলেন, অবশেষে আকাশের সীমা না পাইয়া বিষণ্ণচিত্তে নিরস্ত হইয়া ফিরিয়া আসিলেন। এই শৈশবস্মৃতি, পরে ঈশ্বরের অপার অনন্ত মহীয়সী মায়া যে মনুষ্যবুদ্ধির অগম্য, তাহা তাঁহার রচিত সঙ্গীত-মধ্যে উপমারূপে—

"সৃষ্টিজোড়া তোমার মায়া, কায়া নাই কেবলই ছায়া,
মাঠের মাঝে আকাশ ধরা,
ঘুরে সারা, চারি ধারে।"

এইরূপ আকার ধারণ করিয়াছে। তাঁহার রচিত সঙ্গীতগুলি তাঁহার দেহত্যাগের পরে "দেব-গীতি" নামে প্রকাশিত হইয়াছে। সঙ্গীতগুলি ভক্তসমাজে সুপরিচিত এবং বিশেষ আদরের ও ভক্তির সহিত গীত হইয়া থাকে।

প্রথমবার কলিকাতায় আগমন।

নয় বৎসর বয়সে দেবেন্দ্রনাথ একবার অল্পদিনের জন্য কলিকাতায় আসিয়াছিলেন। সঙ্গে মাতা ও জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা ছিলেন। এখনকার মত তখন খুলনা-শাখার রেলপথ ছিল না। কলিকাতায় আসিতে হইলে নৌকাযোগে কিংবা গো-যানে বা পদব্রজে চাক্‌দহষ্টেশন পর্য্যন্ত আসিয়া তথা হইতে রেলপথে আসিতে হইত। নৌকাপথে দেশে আসিবার সময় নদীমধ্যে প্রবল ঝড় উত্থিত হওয়ায় নৌকাখানি জলমগ্ন হইয়াছিল। কোন প্রকারে সকলে অতি কষ্টে প্রাণে বাঁচিয়া বাড়ী আসিয়াছিলেন।

সমস্ত সময় খেলায় মত্ত—পাঠে সম্পূর্ণ উদাসীন।

ক্রমে দেবেন্দ্রনাথের বয়স বাড়িতে লাগিল, কিন্তু বিদ্যানুরাগ বৃদ্ধি পাইল না। সঙ্গিগণের সহিত সমস্ত দিন ইচ্ছানুযায়ী ক্রীড়া করিয়া বা রাস্তায় রাস্তায় বেড়াইয়া তাঁহার সময় অতিবাহিত হইতে লাগিল। মাতার আদরের ছেলেকে কেহ কিছুই বলিতে সাহস করিত না, কাজেই পড়াশুনায় বালক ক্রমেই সম্পূর্ণ উদাসীন হইয়া উঠিল। এই ভাবে প্রায় দুই বৎসর কাটিয়া গেল। দেবেন্দ্রনাথের এই অমনোযোগিতার বিষয় তিনি আমাদিগকে নিজে না বলিলে শেষ বয়সে তাঁহার সঙ্গীতচর্চ্চা বা ধর্ম্মশাস্ত্রানুশীলনে অনুরাগ দেখিয়া আমরা কখনই উহা বিশ্বাস করিতে পারিতাম না।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

কলিকাতায় আগমন ও বিদ্যালয়ে শিক্ষা, অভিভাবক—জ্যেষ্ঠভ্রাতা সুরেন্দ্রনাথ—শ্রীযুক্ত গিরিশচন্দ্র ঘোষের সহিত পরিচয়।

(১২৬৫—১২৭৭)

সুরেন্দ্রনাথের নিকট কলিকাতায় ৪।৫ বৎসর বিদ্যালয়ে অতিবাহিত।

সুরেন্দ্রনাথ এই সময় কলিকাতায় থাকিয়া লেখা পড়া করিতেন। জ্যেষ্ঠতাত সংসারের অভিভাবক ছিলেন। সুতরাং তাঁহাকে সংসারের কোন ভাবনা ভাবিতে হইত না। নির্ব্বিঘ্নে বিদ্যাচর্চ্চা করিতেন। কিন্তু এ অবস্থা বেশীদিন চলিল না। ১২৬৫ সালে যখন তাঁহার বয়স ২০ বৎসর, তখন তাঁহার জ্যেষ্ঠতাত পরলোক গমন করেন। অগত্যা সুরেন্দ্রনাথকে লেখাপড়া পরিত্যাগ করিয়া সংসারের ভার গ্রহণ করিতে হইল। তিনি প্রসন্নকুমার ঠাকুরের এষ্টেটে একটী কার্য্যের যোগাড় করিয়া লইলেন। এই সময়ে দেবেন্দ্রনাথের বয়স ১৪।১৫ বৎসর। দেশে ভ্রাতার লেখাপড়া কিছুই হইতেছে না জানিয়া সুরেন্দ্রনাথ তাঁহাকে কলিকাতা আনাইয়া আপনার নিকট রাখিলেন ও বিদ্যালয়ে ভর্ত্তি করিয়া দিলেন। কিন্তু দুঃখের বিষয় দেবেন্দ্রনাথ পূর্ব্বের অভ্যাস পরিত্যাগ করিতে পারিলেন না। ভ্রাতার ভয়ে স্কুলে যাইতেন বটে, কিন্তু বিদ্যাভ্যাসে বিশেষ মনোযোগী হইতে পারেন নাই। বিদ্যালয়ে কোন ক্রমে ৪।৫ বৎসর কাটাইলেন, কিন্তু তাঁহার শিক্ষা প্রকৃতপক্ষে

কিছুই হইল না। অগত্যা ১৮।১৯ বৎসর বয়সে তিনি বিদ্যালয় পরিত্যাগ করেন। ইহার পর কখনও ভ্রাতার নিকট কখনও বা মাতুলালয়ে থাকিতেন এবং মধ্যে মধ্যে ভ্রাতার সহিত দেশে যাইয়া স্নেহময়ী জননীর চরণ বন্দনা করিয়া আসিতেন।

দেবেন্দ্রনাথের উন্নতির মূল—সত্যানুরাগ।

সুরেন্দ্রনাথ অবসর পাইলেই বিদ্যাচর্চ্চায় ও বাণীর সেবায় রত থাকিতেন, ভ্রাতার দিকে লক্ষ্য রাখিতে পারিতেন না। পড়াশুনা করা অপেক্ষা সমবয়স্ক বালকগণের সহিত খেলা করা দেবেন্দ্রনাথের অধিক ভাল লাগিত। তাঁহাকে পল্লীস্থ উচ্ছৃঙ্খল বালকবৃন্দের সহিত ক্রীড়া করিতে দেখিয়া এক আত্মীয় তাঁহার বিরুদ্ধে অভিযোগ করাতে সুরেন্দ্রনাথ বলিয়াছিলেন, "দেবী * এখন যতই খারাপ হউক না কেন সে একদিন না একদিন ভাল হইবেই হইবে। কারণ সে কখনও মিথ্যা কথা বলে না।" সুরেন্দ্রনাথের এই ভবিষ্যৎ বাণী যে কালে ফলবতী হইয়াছিল, ইহা বলা বাহুল্য। এ সম্বন্ধে তাঁহার নিজের উক্তি আছে,—"আমার যাহা কিছু হইয়াছে তাহা এই সত্যানুরাগের ফলেই হইয়াছে। বাল্যকাল হইঁতে আমি কখনও সত্যভ্রষ্ট হই নাই।" অসীম সত্যানুরাগই দেবেন্দ্রনাথকে ধর্ম্মজগতে উচ্চ সোপানে আরূঢ় করাইয়াছিল। সুরেন্দ্রনাথ ভ্রাতাকে অত্যধিক স্নেহ করিতেন। তাঁহার ধারণা ছিল, এই ভালবাসা ও সত্যনিষ্ঠার গুণে দেবেন্দ্রনাথ আপনা আপনি ভাল হইবে।

একবার কলিকাতা হইতে রওনা হইয়া দেবেন্দ্রনাথের বাটী পৌছিতে নির্দ্দিষ্ট সময় অতীত হইয়াছে দেখিয়া সুরেন্দ্রনাথ

---

* আদর করিয়া দেবেন্দ্রনাথকে শৈশবে সুরেন্দ্রনাথ "দেবী" বলিয়া ডাকিতেন।

বড় চিন্তিত ও উৎকণ্ঠিত হইয়া পড়েন এবং ভ্রাতার আগমনের প্রতীক্ষায় ঘর বাহির করিতে থাকেন। তাঁহার চাঞ্চল্য ও উৎকণ্ঠা দেখিয়া একজন প্রতিবেশী বলিল,—"বোধ হয় দেবী আজ কলিকাতা হইতে রওনা হইতে পারে নাই।" তদুত্তরে সুরেন্দ্রনাথ বলিয়াছিলেন,—"না, দেবী যখন লিখিয়াছে আজ বাড়ী আসিবে, তখন তাহার শরীর ভাল থাকিলে সে নিশ্চয়ই আসিবে।" সত্য সত্যই দেবন্দ্রনাথ একটু অধিক রাত্রিতে বাটী আসিয়া পৌঁছিয়া ছিলেন। পথে আলোক ও সঙ্গীর অভাবে তাঁহার বিলম্ব হইয়াছিল।

শৈশবাবধি অন্যায় কাজ করিলেই দেবেন্দ্রনাথের অসহ্য মানসিক যন্ত্রণা হইত। যে পর্য্যন্ত তাহা প্রকাশদ্বারা বা অন্য কোন উপায়ে তাহার প্রতিকার করিতে না পারিতেন, সে পর্য্যন্ত অন্য কোন কাজ করিতে পারিতেন না। এই সম্বন্ধে তাঁহার কথিত বাল্যজীবনের একটী ঘটনা আমরা এস্থলে উল্লেখ করিয়া এ বিষয়ের উপসংহার করিব।

ঘটনাটী এই—একদিন এক প্রতিবেশী মুদি, বালক দেবেন্দ্র-নাথকে বিশ্বাসী জানিয়া তাঁহাকে দোকানে প্রহরী রাখিয়া কিয়ৎক্ষণের জন্য অন্যত্র চলিয়া যায়। মুদির ফিরিতে বিলম্ব হয়। ক্ষুধায় কাতর হইয়া প্রহরী-বালক নিজ হস্তে মুদির পাত্র হইতে এক মুষ্টি মুড়্‌কী লইয়া খাইয়াছিল। মুদির অজ্ঞাতে ও বিনানুমতিতে মুড়্‌কী খাওয়ার পর হইতে দেবেন্দ্রনাথ ভয়ে ও দুশ্চিন্তায় একেবারে স্তব্ধ ও বিবর্ণ হইয়া গেলেন। মুদি ফিরিয়া আসিয়া তাঁহার ঐ অবস্থা দেখিবামাত্র কারণ জিজ্ঞাসা করিলে তিনি সমস্ত প্রকাশ করিয়া বলিলেন। মুদি হাসিয়া

তাঁহাকে অভয় দিলে তিনি প্রকৃতিস্থ হন। এতক্ষণ যে দারুণ মানসিক ক্লেশ ভোগ করিয়াছেন, তাহা তিনি শেষ জীবন পর্য্যন্তও ভুলিতে পারেন নাই। এই স্মৃতি তাঁহাকে অনুক্ষণ সত্যপথে থাকিতে সহায়তা করিয়াছিল—ইহা তিনি বহুবার আমাদিগকে বলিয়াছেন।

সুরেন্দ্রনাথের ইতিহাস ও কাব্যালোচনা।

সংসারের সকল ভার হঠাৎ সুরেন্দ্রনাথের উপর পড়াতে তিনি বিদ্যালয় ত্যাগ করিয়া কর্ম্ম গ্রহণ করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন সত্য, কিন্তু ইহাতে তাঁহার বিদ্যাশিক্ষার স্পৃহা অন্তর্হিত হয় নাই। অবকাশ পাইলেই তিনি ইংরাজী দর্শন ও ইতিহাস চর্চ্চা করিতেন; কলেজের অনেক ছাত্রকে তিনি দর্শনশাস্ত্র পড়াইতেন। শ্রীযুত অধর সেন—যিনি পরে ডেপুটী ম্যাজিষ্ট্রেট হইয়াছিলেন এবং শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণদেবের আশ্রয় লাভ করিয়াছিলেন, তিনি সুরেন্দ্রনাথের নিকট ইতিহাস পড়িতেন। এতদ্ভিন্ন কাব্যালোচনা তাঁহার বড় প্রিয় ছিল। তৎপ্রণীত "মহিলা", "সবিতা-সুদর্শন" প্রভৃতি কাব্য তাঁহার কবিত্ব-শক্তির বিশেষ পরিচায়ক।

দেবেন্দ্রনাথের ঐ আলোচনা শ্রবণ ও কবিত্বশক্তির স্ফুরণ।

ভারতীর কৃতী সন্তান বঙ্গ-রঙ্গালয়ের প্রতিষ্ঠাতা স্বনাম-ধন্য নাট্য-সম্রাট্ শ্রীযুক্ত গিরিশচন্দ্র ঘোষ এই সময়ে প্রায় প্রত্যহ আফিস হইতে প্রত্যাগমনকালে সুরেন্দ্রনাথের নিকট আসিতেন এবং উভয়ে অধিক রাত্রি পর্য্যন্ত কাব্যালোচনা করিতেন। দেবেন্দ্রনাথও প্রায় প্রত্যহ তথায় উপস্থিত থাকিয়া তাঁহাদের কথাবার্ত্তা

শ্রবণ করিতেন। ইহার ফলে অজ্ঞাতসারে দেবেন্দ্রনাথের ভিতর কবিত্ব-শক্তি জাগিয়া উঠে। এই সময় হইতেই তিনি দুটী একটী করিয়া গান রচনা করিতে আরম্ভ করেন।

দেবেন্দ্রনাথের গুরুভাগ্য।

দেবেন্দ্রনাথের বিদ্যালয়ের শিক্ষা অধিক দূর অগ্রসর না হইলেও জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার দর্শন, ইতিহাস ও কাব্যালোচনাতে মনোযোগের সহিত বহুকাল যোগদান করিবার ফলে নানা বিষয়ে তাঁহার যে জ্ঞান জন্মিয়াছিল, তাহাতে সন্দেহ নাই। দেবেন্দ্রনাথ আমাদিগকে প্রায়ই বলিতেন যে, "আমি দাদার নিকট বহু বিষয়ে ঋণী।" তাঁহার কথা বলিতে যাইয়া অনেক সময় বলিতে শুনিয়াছি যে, "আমার গুরুভাগ্য বড় প্রবল;—প্রথমে, সংসার-পথে দাদার মত জ্ঞানী পণ্ডিত অভিভাবক গুরু, দ্বিতীয়, সেতার-শিক্ষায় লক্ষ্ণৌর ছোট ওস্তাদজী এবং তৃতীয়, ধর্ম্মজগতে ঠাকুরকে গুরুরূপে লাভ করিয়া ধন্য হইয়াছি।"

শ্রীযুত গিরিশ ঘোষ ও দেবেন্দ্রনাথের সৌহার্দ্দ।

শ্রীযুক্ত গিরিশচন্দ্র ঘোষের সহিত দেবেন্দ্রনাথের এই সময়ে যে আলাপ হয়, তাহা পরে প্রগাঢ় সৌহার্দ্দে পরিণত হইয়াছিল। গিরিশ বাবু সুরেন্দ্রনাথকে গুরুর সম্মান দান করিতেন। তিনি সুরেন্দ্র-নাথের লেখার বিশেষ পক্ষপাতী ছিলেন। তৎপ্রণীত বহু গ্রন্থে সুরেন্দ্র-নাথের ভাবরাশি দেখিতে পাওয়া যায়। গিরিশ বাবু তাঁহার কোন গ্রন্থে সুরেন্দ্রনাথের লেখা হইতে দুই এক ছত্র অবিকল উদ্ধৃত করায় তাঁহার নিকট প্রশ্ন উঠে, তদুত্তরে তিনি বলিয়াছিলেন,—"গুরুর ধনে শিষ্য অধিকারী।"

স্বরেন্দ্রনাথের কাব্যগ্রন্থ প্রকাশ।

ঋষি-কবি স্বরেন্দ্রনাথ বহু কাব্য ও কবিতা লিখিয়া গিয়াছেন। তাঁহার নাম-যশের কোনই আকাঙ্ক্ষা ছিল না। এজন্য তাঁহার জীবদ্দশায় দুই একখানি ভিন্ন তাঁহার রচিত কবিতা প্রকাশিত হয় নাই; কেবল এক বন্ধু গোপনে তাঁহার "সবিতা-স্বদর্শন" নামক কাব্যখানি প্রকাশ করিয়াছিলেন। ইহা জানিতে পারিয়া স্বরেন্দ্রনাথ সমুদয় মুদ্রিত পুস্তকগুলি আটক করিয়া রাখেন, প্রচার করিতে দেন নাই। তাঁহার মৃত্যুর বহুকাল পরে দেবেন্দ্রনাথ "মহিলা", "বর্ষবর্ত্তণ" প্রভৃতি দুই চারিখানি কাব্য প্রকাশ করিয়াছিলেন এবং বর্ত্তমানে "বস্থমতী" পত্রিকার স্বত্বাধিকারী শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র মুখোপাধ্যায় মহাশয় "স্বরেন্দ্রনাথের গ্রন্থাবলী" প্রকাশ করিতেছেন।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ

সুরেন্দ্রনাথের নিকট যোগশিক্ষা ও মাতার আগ্রহে বিবাহ।

যোগাভ্যাস ও সেতার শিক্ষা।

ধর্ম্মজীবন-লাভাকাঙ্ক্ষায় জ্যেষ্ঠ ভ্রাতাকে যোগমার্গাবলম্বন করিতে দেখিয়া ধর্ম্মপিপাসু দেবেন্দ্রনাথও ভ্রাতার ভাবে অনুপ্রাণিত হইয়া তাঁহার নিকট যোগ শিক্ষা করিতে আরম্ভ করিলেন। দেবেন্দ্রনাথ একাগ্রচিত্তে অনেক সময় যোগাভ্যাসে রত থাকেন এবং অবসর মত তাঁহারই নিকট সেতার শিক্ষা আরম্ভ করেন। পরে, লক্ষ্ণৌর ছোট ওস্তাদজির নিকট সেতার শিক্ষা করিয়া বিশেষ পটুতা লাভ করেন। সেতার বাজনায় তাঁহার হাত অতিশয় মিষ্ট ছিল।

বিবাহের জন্য মাতা অস্থির—দেবেন্দ্রনাথের নিতান্ত অনিচ্ছা।

ক্রমে দেবেন্দ্রনাথ বিবাহযোগ্য বয়সে উপনীত হইলে তাঁহার মাতা তাঁহার বিবাহের জন্য অস্থির হইয়া পড়েন। কিন্তু বিবাহে দেবেন্দ্রনাথের আদৌ আগ্রহ হইত না। তাঁহার ইচ্ছা ছিল, সংসারে স্বাধীনভাবে কালাতিপাত করেন। সংসারে বন্ধনের ভিতর যাইতে তাঁহার মন কিছুতেই চাহিত না। মাতা পীড়াপীড়ি করিলেও সুরেন্দ্রনাথ কখনও তাঁহার "দেবীকে" বিবাহ করিতে অনুরোধ করেন নাই; কারণ, বিবাহ সম্বন্ধে তাঁহার মত ছিল যে,—"ইহ-জীবনের সুখ-স্বচ্ছন্দতার প্রতি ;স্ত্রীজাতির অধিক দৃষ্টি—তাহার তুষ্টি অর্থাধীন। অতএব স্থায়ী সম্পত্তির অভাবে যে ব্যক্তি বিবাহ করে, তাহার সাহস অতি নিন্দনীয়!"

জ্যেষ্ঠের এই যুক্তিপূর্ণ অভিমত দেবেন্দ্রনাথ অন্তরের সহিত পোষণ করিতেন। ইহা যে তাঁহার সংসারবন্ধন হইতে

আপনাকে মুক্ত রখিবার আন্তরিক বাসনা দৃঢ়ভাবে ধরিয়া থাকিতে এবং মাতার শত অনুরোধসত্ত্বেও নিজ সঙ্কল্পে অটল থাকিতে সহায়তা করিয়াছিল, তাহাতে সন্দেহ নাই। মাতাকে কোন প্রকারে নিরস্ত রাখিয়া দেবেন্দ্রনাথ সময় কাটাইতে লাগিলেন। দেখিতে দেখিতে চারি পাঁচ বৎসর কাটিয়া গেল।

মাতার প্রায়োপবেশন-সংকল্প।

এ সংসারে প্রায় কোন মাতাই ইচ্ছা করেন না যে, তাঁহার পুত্র সংসারে থাকিয়া দারপরিগ্রহপূর্ব্বক সংসারধর্ম্ম পালন না করিয়া সন্ন্যাসীর মত জীবন যাপন করে। দেবেন্দ্রনাথের মাতা যখন দেখিলেন, তাঁহার আদরের কনিষ্ঠ পুত্র বিবাহ করিয়া সংসারধর্ম্ম পালন করিতে স্বীকৃত নহেন, তখন তিনি পুত্রকে বিবাহ করিবার জন্য নানারূপ স্নেহবাক্যে তাঁহার মন ভুলাইতে চেষ্টা করিয়া অতিশয় পীড়াপীড়ি আরম্ভ করিলেন, এবং যখন দেখিলেন, তাহাতে কোনও ফল হইবার সম্ভাবনা নাই, তখন স্ত্রীজনসুলভ ক্রন্দন আরম্ভ করিলেন। ইহাতেও পুত্রের মন ফিরিল না দেখিয়া উপায়ান্তর-বিহীনা মাতা প্রায়োপবেশন করিবেন স্থিরসংকল্প করিলেন।

বিবাহে সম্মতি ও ১২৭৭ সালে বিবাহ ; নিজ বয়স—২৭ বৎসর, পাত্রী—৯ বৎসর।

মাতৃভক্ত দেবেন্দ্রনাথ মাতার এতাদৃশী অবস্থা ও নিরন্তর অশ্রুধারা দর্শনে একান্ত ব্যথিত হইয়া তাঁহাকে সুখী করিবার জন্য সংসারে স্বাধীনভাবে বিচরণ করিবার প্রবল বাসনা ত্যাগ করিয়া অবশেষে বিবাহ করিতে স্বীকৃত হইলেন। দুঃখভারাক্রান্তা মাতার হৃদয় আনন্দে নৃত্য করিয়া উঠিল। হঠাৎ পুত্রের বিবাহের ইচ্ছা হইয়াছে দেখিয়া এবং পাছে পুনরায় পুত্রের মতের পরিবর্ত্তন ঘটে, এই আশঙ্কায় আর

কালবিলম্ব সঙ্গত নহে মনে করিয়া অচিরে কাশ্যপ-গোত্রীয় সদ্বংশজাতা এক সুশীলা কন্যার সহিত দেবেন্দ্রনাথের বিবাহ দিলেন। কন্যার নাম মেঘাম্বরী দেবী ; তাঁহার পিতার নাম ৺হরিশচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় ও মাতার নাম জগদম্বা দেবী। পূর্ব্বে ইঁহাদের নিবাস ফরিদপুর জেলায় ছিল। দেবেন্দ্রনাথের বয়স এই সময় সাতাইশ বৎসর উত্তীর্ণ হইয়াছিল। তিনি বলিতেন, তাঁহার বিবাহের সময় পত্নীর বয়স নয় বৎসর মাত্র ছিল।

পত্নী-পরিচয়।

দেবেন্দ্রনাথের পত্নী অতিশয় পতিব্রতা ও ধর্ম্মপরায়ণা ছিলেন। এই সাধ্বী-সতীর সম্বন্ধে ভগবান্ শ্রীরামকৃষ্ণ-পদাশ্রিত শ্রীযুত অক্ষয়-কুমার সেন মহাশয় (যিনি তাঁহাকে বহুবার দর্শন করিয়াছিলেন) তাঁহার রচিত প্রসিদ্ধ 'শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ পুঁথিতে' যাহা লিপিবদ্ধ করিয়া গিয়াছেন, আমরা পাঠকপাঠিকাগণের কৌতূহল চরিতার্থ করিবার নিমিত্ত তাহাই এখানে উদ্ধৃত করিয়া ক্ষান্ত হইলাম—

"প্রভুদেবে নিরখিয়ে, একে একে যত মেয়ে
প্রণাম করিলা রাঙ্গা পায়॥
দেবেন্দ্র-ঘরণী যিনি, পতিসেবা-পরায়ণী,
পবিত্রচরিতা পতিব্রতা।
পতিভক্তি চিতে পূর্ণ, ইহসুখ-আশাশূন্য,
মহাপুণ্য শুনিলে বারতা॥
ধ্যান পতি, জ্ঞান পতি, ইষ্টভাব পতি প্রতি,
দিবারাতি পতির সেবন।

পতি বিনা নাহি জানা, দেবদেবী আরাধনা,
কিংবা কোন ধরম-করম ॥
বস্ত্রাবৃতা গোটা গায়, প্রণমিলে রাঙ্গাপায়,
তখনি জানিলা অন্তর্য্যামী।
স্বরূপ মূরতি তাঁর, চিরদাসী আপনার,
লীলাপুরে দেবেন্দ্র-ঘরণী ॥
ভক্তিভরে দ্বিজকন্যে, করেছে প্রভুর জন্যে,
নানাবিধ দ্রব্য ভোজনের।
যাহে দিলা পরিচয়, এ কন্যা সামান্যা নয়,
এ সময় ঘরে মানুষের ॥
খাইতে খাইতে ভোজ্য, বিধিবিষ্ণুশিবপূজ্য,
ষড়ৈশ্বর্য্যবান্ গুণমণি।
দেবেন্দ্রে ডাকিয়া কন, এ যে আউলে ধরণ,
ভক্তিমতী তোমার ঘরণী ॥
আহা, কি সরলান্তরা, হৃদয় খোলার পারা,
ভোগ আশা নাহি হৃদিপুরে!
দিনেক সঙ্গেতে করি, লয়ে যেও কালীপুরী—
শ্রীমন্দির দক্ষিণসহরে ॥"

বিবাহ-বন্ধনে আবদ্ধ হইলেও যত দিন জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা জীবিত ছিলেন, তত দিন দেবেন্দ্রনাথকে সংসারের কোন ভাবনা ভাবিতে হইত না। তিনি নিশ্চিন্ত হইয়া যোগাভ্যাস করিতেন এবং ক্রমে ক্রমে চৌষট্টি প্রকার আসন আয়ত্ত করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ

সুরেন্দ্রনাথের পরলোকগমনে সংসারভারগ্রহণ।

(১২৮৫)

সন ১২৮৫, ৩রা বৈশাখ সুরেন্দ্রনাথের পরলোকে গমন।

ভ্রাতার নিকট একাধারে ভ্রাতৃ ও পিতৃ-স্নেহলাভে দেবেন্দ্রনাথ বড়ই সুখে দিন কাটাইতেছিলেন। সংসারের কোন চিন্তা মনে স্থান পাইত না। যখন যাহা ইচ্ছা, তাহাই করিতেন, তাহাতে জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার কোন নিষেধ ছিল না। পঁয়ত্রিশ বৎসর বয়সেও একরূপ দায়িত্বহীন বালকবৎ ছিলেন। কিন্তু সংসারে এ সুখের সময় দেবেন্দ্রনাথের আর বেশী দিন রহিল না। ১২৮৫ সালের ৩রা বৈশাখ প্রাতে একচল্লিশ বৎসর বয়সে এসিয়েটিক্ কলেরা রোগে আক্রান্ত হইয়া সুরেন্দ্রনাথ সহসা আত্মীয়-স্বজনকে শোকসাগরে নিমজ্জিত করিয়া ইহ-জগৎ হইতে প্রস্থান করিলেন। শত ক্রন্দনের কাতর আহ্বানে তাঁহার সাড়া মিলিল না। শোক-সন্তপ্তা মাতা ও পরিবারবর্গের সমস্ত ভার দেবেন্দ্রনাথের উপর বিনা মেঘে বজ্রাঘাতের ন্যায় অতর্কিতে পতিত হইল।

পঁয়ত্রিশ বৎসর বয়সে সংসারভার গ্রহণ।

তিনি ভ্রাতার আকস্মিক অকালমৃত্যুতে চতুর্দ্দিক্ অন্ধকারাচ্ছন্ন দেখিতে লাগিলেন এবং বিব্রত ও কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ় হইয়া পড়িলেন। তিনি সংসারকে না চাহিলেও সংসার তাঁহাকে ছাড়িল না। কর্ত্তব্যানুরোধে বাধ্য হইয়া সংসারী সাজিতে হইল। এই সময় তাঁহার

বয়স প্রায় পঁয়ত্রিশ বৎসর পূর্ণ হইবে। দেবেন্দ্রনাথ শোকসন্তপ্তা মাতাকে যথাসম্ভব সান্ত্বনা দিয়া সংসার চালাইবার উপায় অন্বেষণ করিতে লাগিলেন।

নিদারুণ দারিদ্র্য-ক্লেশ।

সংসারভার গ্রহণ করিয়াই দেবেন্দ্রনাথকে দারিদ্র্যের নিদারুণ ক্লেশ সহ্য করিতে হইয়াছিল। এমন কি, মধ্যে মধ্যে পরিবার-পরিজনসহ অনশনে কাটাইতে হইয়াছে। দারিদ্র্য-দুঃখ সহ্য করিতে না পারিয়া এই সময়ে একদিন তাঁহাকে এক অনাচরণীয় নিম্নশ্রেণীর গৃহে শ্রাদ্ধের দানগ্রহণ করিতে হইয়াছিল। দেবেন্দ্রনাথ প্রায়ই বলিতেন—"ঠাকুর আমাকে সমস্ত অবস্থার ভিতর দিয়া পাশ করাইয়া আনিয়াছেন।" বাস্তবিক, দারিদ্র্যাবস্থায় পড়িয়া, পদে পদে ঠেকিয়া—সংসারে নানা দুঃখ-দারিদ্র্যের যে কি জ্বালা, তাহা তিনি ভালরূপে প্রত্যক্ষ করিয়াছিলেন, সেই জন্য কোমলহৃদয় দেবেন্দ্রনাথ উত্তরকালে সমাগত দীন-দরিদ্র ও গৃহী ভক্তগণের অবস্থা বুঝিয়া এত সরসভাবে বিশেষ সহানুভূতি প্রকাশপূর্ব্বক অবস্থানুযায়ী ব্যবস্থা করিতে পারিয়াছিলেন।

জমিদারী সেরেস্তায় কর্ম্ম।

এইরূপে কিছুকাল কাটিবার পর জোড়াসাঁকোনিবাসী ঠাকুর মহাশয়দিগের এষ্টেটে দেবেন্দ্রনাথ একটী কর্ম্মে নিযুক্ত হইলেন। জমিদারী সেরেস্তায় প্রচলিত সনাতন পদ্ধতি অনুসারে বেতন অল্প হইলেও উপরি বা উৎকোচ দ্বারা সকলের পোষাইয়া যায়। কিন্তু তাঁহার স্বভাব বিপরীত ছিল, তিনি অর্থাভাবে অনাহারে থাকিতে প্রস্তুত, তথাপি কখনও উপরি পাওনা গ্রহণে সম্মত হইতেন না।

এক মুদির সহিত চুক্তি।

সত্যানুরাগী দরিদ্র দেবেন্দ্রনাথ উপায়ান্তর না দেখিয়া তখন এক মুদির সহিত চুক্তি করিয়া লইয়াছিলেন। মুদিকে সরলভাবে বলিলেন—"আমি প্রয়োজনীয় চাউল, ডাইল, তৈল, মশলাদি যাবতীয় দ্রব্য মাস ভরিয়া তোমার নিকট হইতে লইব এবং মাসকাবারে বেতন পাইলে তোমার সমস্ত প্রাপ্য শোধ করিয়া দিব। কিন্তু যদি আমি কোন মাসের মাসকাবারের পূর্ব্বে হঠাৎ মারা যাই, তাহা হইলে ঐ মাসের সমস্ত প্রাপ্য টাকা তোমার লোকসান হইবে। তুমি যদি এই সর্ত্তে আমাকে জিনিষ দিতে রাজী হও, তবে আমি তোমার নিকট হইতে সওদা লইতে পারি, নচেৎ নয়।" মুদি বহুদিন যাবৎ কলিকাতা সহরে দোকান করিয়া বাস করিতেছিল, কিন্তু এরূপ ভালবাসার আব্দারের কথা সে কাহারও নিকটে জীবনে শুনে নাই, তাই সে আনন্দে তাঁহার প্রস্তাবে সম্মত হইল।

মুক্তহস্তে দানের ফলে ঋণগ্রস্ত।

দেবেন্দ্রনাথ এখন হইতে ভিন্ন ভিন্ন জমিদারের সেরেস্তায় কাজ করিয়া অল্পদিনমধ্যে বিশেষ পটুতা লাভ করিয়াছিলেন। অন্যান্য কর্ম্মচারীদিগের ন্যায় যদি তিনি বেতন ব্যতীত উপরি পাওনা গ্রহণ করিতেন, তাহা হইলে স্বচ্ছল অবস্থায় দিন কাটিত এবং বাকী জীবন কাটাইবার মত সম্পত্তিও সঞ্চিত হইত। কিন্তু তাঁহার মাসিক আয় প্রায়ই সংসারযাত্রানির্ব্বাহের পক্ষে পর্য্যাপ্ত ছিল না। আয় অপেক্ষা ব্যয় বেশী হইলে সংসারে সচরাচর যাহা ঘটিয়া থাকে, এই সময় দেবেন্দ্রনাথেরও তাহাই হইতে লাগিল। দেবেন্দ্রনাথের কিছু কিছু ঋণ হইতে লাগিল। তথাপি কোমল

অন্তঃকরণ দেবেন্দ্রনাথ কাহারও দুঃখকষ্ট দেখিলে, নিজের অবস্থার কথা বিস্মৃত হইয়া সামান্য যাহা কিছু হাতে থাকিত, তাহাই দান করিয়া বসিতেন। তাঁহার মুক্তহস্তে দানের বহু দৃষ্টান্ত আমরা পরজীবনেও দেখিয়াছি।

দায়ে পড়িয়া প্রায়ই ঋণ করিতে হইলেও দেবেন্দ্রনাথ ঋণকে বড় ভয় করিতেন। এইরূপ অবস্থায় ঋণপরিশোধের উপায়-নির্দ্ধারণে অসমর্থ হইয়া একদিন দেবেন্দ্রনাথ স্বীয় অবস্থার কথা যথাযথ-ভাবে আপনার মনিবকে জানাইলেন। মনিব দেবেন্দ্রনাথকে ভালরূপে চিনিয়াছিলেন এবং মনে মনে শ্রদ্ধাও করিতেন। তিনি দেবেন্দ্রনাথকে ব্যয় কমাইতে পরামর্শ দিয়া তাঁহার সমুদয় ঋণ এককালে পরিশোধ করিয়া দিলেন।

শালকিয়ায় বাস—ম্যালেরিয়া জ্বর—আহিরীটোলায়, পুনরায় আসিয়া বাস।

দেবেন্দ্রনাথ দেখিলেন, কলিকাতায় থাকিলে ব্যয়-সংক্ষেপ সম্ভব হইবে না। এজন্য সহরের নিকটবর্ত্তী গঙ্গার পরপারে শালকিয়ায় একখানি অল্প ভাড়ায় বাড়ী সন্ধান করিয়া, সপরিবারে তথায় গিয়া বাস করিতে লাগিলেন। প্রত্যহ প্রত্যূষে আসিয়া কলিকাতায় কর্ম্ম করিতেন এবং দ্বিপ্রহরের পর বাসায় যাইয়া স্নানাহার সম্পন্ন করিতেন। শালকিয়ায় কিছুকাল বাস করিবার পর দেবেন্দ্রনাথ ম্যালেরিয়া জ্বরে আক্রান্ত হন। কখনও ভাল থাকেন, কখনও জ্বরে পড়েন; এইভাবে কিছুকাল কাটিবার পর একদিন এক বিচক্ষণ ডাক্তার তাঁহাকে বলিলেন,—"যদি বাঁচিতে চান, তবে গঙ্গাপার হইয়া যান।" অগত্যা দেবেন্দ্রনাথ কলিকাতা আহিরীটোলা, নিমু গোঁসাইয়ের লেনে আসিয়া পুনরায় বাসা করিলেন। দেবেন্দ্রনাথ অল্পে সন্তুষ্ট ছিলেন বলিয়া মনের

প্রফুল্লতা কখনই হারান নাই। সর্ব্বদা নীরবে সংসারীর কর্ত্তব্য যথাসাধ্য পালন করিয়া যাইতে লাগিলেন।

স্বামী বিবেকানন্দ, ব্রহ্মানন্দ, রামচন্দ্র এবং মহেন্দ্রনাথ প্রভৃতির সহিত পরিচয়।

শ্রীমৎ স্বামী বিবেকানন্দের পিতা ৺বিশ্বনাথ দত্ত এটর্ণি এবং পিতৃব্য ৺তারকনাথ দত্ত, হাইকোর্টের উকিল, মহাশয়দিগের কলিকাতাস্থ সিমলা বাড়ীতে ঠাকুর এষ্টেটের মকর্দ্দমা উপলক্ষে প্রায়ই দেবেন্দ্রনাথকে যাইতে হইত। ভক্তাগ্রগণ্য রামচন্দ্র দত্ত ও পূজ্যপাদ ব্রহ্মানন্দ স্বামী বা রাখাল মহারাজ পাঠ্যাবস্থায় তখন তথায় বাস করিতেন। তাঁহাদিগের ও স্বামীজির সহিত এই সময় হইতেই দেবেন্দ্রনাথের সখ্যভাব স্থাপিত হয়। স্বামীজি ও তাঁহার ভ্রাতৃগণ দেবেন্দ্রনাথের নিকট হইতে নস্য চাহিয়া লইয়া আমোদ করিতেন।

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ

ঈশ্বরলাভে ব্যাকুলতা।

যোগসাধনা—আরূঢ় অবস্থায় দর্শনাদি, সহজ অবস্থায় সুখে ও দুঃখে বিচলিত।

সংসারাবর্ত্তে পতিত হইয়াও দেবেন্দ্রনাথ জীবনের উদ্দেশ্য বিষয়ে উদাসীন ছিলেন না। যে যোগানুষ্ঠানকে ভগবৎ-লাভের উপায় বলিয়া গ্রহণ করিয়াছিলেন, সে যোগাভ্যাস করিতে একদিনও বিরত থাকেন নাই। একাদিক্রমে একাদশ বর্ষ যোগসাধনা করেন। আরূঢ় অবস্থায় অনেক দেবদেবীর সন্দর্শন লাভ করিতেন। কখনও অপরূপ জ্যোতি দর্শন হইত, কখনও বা অশ্রুতপূর্ব্ব ধ্বনি শ্রবণ-গোচর হইত। আবার কখন কখন মনে হইত যে—দেহ যেন এত লঘু হইয়া গিয়াছে যে, তিনি আকাশমার্গে বিচরণ করিতেছেন। একদিন দেখিলেন—ভ্রূমধ্যে একটী জ্যোতি প্রথমে বিন্দুর আকারে নির্গত হইয়া ক্রমশঃ বর্দ্ধিত হইতে হইতে সমস্ত গৃহমধ্যে যেন পূর্ণচন্দ্রোদয় হইয়াছে। ইত্যাদি নানাপ্রকার তিনি দেখিতে লাগিলেন।

যোগারূঢ় অবস্থায় এই সকল ব্যাপার ঘটিলেও সহজ অবস্থায় মন নামিয়া আসিয়া সুখ ও দুঃখদ্বারা পূর্ব্ববৎ বিচলিত হইত এবং বিষয়চিন্তায় আবদ্ধ হইয়া পড়িত। দেবেন্দ্রনাথ ভাবিলেন, যোগ করিয়াও যদি দুঃখের একান্ত নিবৃত্তি না হইল, মন যদি ভগবদ্ভাবে যুক্ত না রহিল, তবে এ যোগ করিয়া কি ফল? যে নিরবচ্ছিন্ন শান্তির আশায় যোগ করা, তাহা যদি না আইসে—ভগবানের দর্শনলাভ যদি না হয়—তবে যৌগিক ঐশ্বর্য্যাদি বিড়ম্বনা মাত্র!

ভগবদ্ অস্তিত্ব সম্বন্ধে সংশয়।

কিছুকাল মনে মনে এইরূপ তর্ক-বিতর্ক চলিতে লাগিল। পরে দেবেন্দ্রনাথের মনে ভগবদ্ অস্তিত্ব সম্বন্ধে এক দারুণ সংশয় আসিয়া উপস্থিত হইল। তিনি ভাবিতে লাগিলেন, 'লোকে ভগবান্‌কে দয়াময় অন্তর্য্যামী বলে, তিনি আমার অন্তরের বাসনা ত সকলই জানেন। এত দিন ধরিয়া তাঁহাকে ডাকিলাম, কৈ, দয়া করিয়া একবারও দর্শন দিলেন না, তৃষিত প্রাণে ত শান্তি আসিল না!' এইরূপ চিন্তায় তাঁহার মস্তিষ্ক আলোড়িত হইতে লাগিল এবং ক্রমশঃ তিনি অস্থির হইয়া পড়িলেন। এমত অবস্থায় কি বিধেয়, তাহা জানিবার জন্য সংসারে যাঁহারা বিজ্ঞ ও বিচক্ষণ বলিয়া খ্যাত, তাঁহাদের শরণ লইলেন। ৪৯৩০৭

সাংসারিক লোকের উপদেশ।

কেহ বলিলেন,—"তুমি কি বাতুল হইয়াছ? ভগবান্‌লাভ কি একটা মুখের কথা? বাস্তব জগতে যাহাতে সুখে থাকিতে পার—মান-সম্ভ্রম অর্জ্জন করিতে পার—তাহার চেষ্টা কর। নিরর্থক আকাশ-কুসুমের সন্ধানে ফিরিয়া ক্লেশ পাইও না।" কেহ বা বলিলেন, "ভগবান্ থাকিলেও থাকিতে পারেন, তাঁহাকে লাভ করা মানুষের সাধ্যাতীত"—ইত্যাদি ইত্যাদি। যিনি যেমন বুঝিয়াছেন, তিনি তেমনই বুঝাইলেন। কিন্তু তাহাতে দেবেন্দ্রনাথের প্রাণে শান্তি আসিল না বা মন প্রবোধ মানিল না।

দেবেন্দ্রনাথের মহাসমস্যা।

যে আশা এত দিন ধরিয়া হৃদয়ের নিভৃত কোণে পরম সমাদরে পোষণ করিয়া অসিতেছিলেন, তাহা কি একবারে পরিত্যাগ করিতে

পারা যায়? আর ভগবান্ যে নাই, এ কথাও ত কেহ জোর করিয়া বলিতে পারিতেছেন না! দেবেন্দ্রনাথ মহা সমস্যায় পড়িলেন। তিনি যোগাভ্যাস ছাড়িলেন বটে, কিন্তু ভগবানের আশা ছাড়িতে পারিলেন না। এই সময় সদা-সর্ব্বক্ষণ "ভগবান্, আছেন কি না?"—এই প্রশ্ন লইয়াই তাঁহার মনে তর্ক-বিতর্ক উঠিতেছিল। এইভাবে মন যতই ব্যাকুল হইয়া উঠিতে ছিল, বিষয়ী লোকের সমাগম ততই বিষবৎ বোধ হইতে লাগিল।

এই সময়ে দেবেন্দ্রনাথ কিছু দিনের জন্য পরিবারবর্গকে স্থানান্তরে রাখিয়া পাথুরিয়াঘাটার ঠাকুর মহাশয়দিগের বহির্বাটীর ত্রিতলস্থ এক নির্জ্জন কক্ষে বাস করিতে লাগিলেন। তখন তাঁহার বয়স প্রায় চল্লিশ বৎসর হইবে। আপন নির্জ্জন কক্ষে বসিয়া একমনে ভাবিতেন,—'ভগবান্ কি আছেন? না—নাই। থাকিলে কি করিয়া তাঁহাকে পাওয়া যাইবে'?

মানব-মনের ভাব-তরঙ্গ।

মানব-মনের পক্ষে জাগতিকবস্তুর ন্যায় ঈশ্বরবস্তুর ধারণা করা অসম্ভব। তথাপি জাগতিক বস্তু যে ভাবে ইন্দ্রিয়াদিসাহায্যে মানুষ গ্রহণ করিতে অভ্যস্ত, ঈশজ্ঞানলাভ না হওয়া পর্য্যন্ত সেই ভাবেই তাহাকে ঈশ্বরবস্তুর ধারণা করিতে চেষ্টা করা ভিন্ন তাহার গত্যন্তর নাই। ঈশ্বরলাভে ব্যাকুলতা ও ঈশজ্ঞানলাভ—এই দুইয়ের সন্ধিস্থলে নানা বিপরীত ভাব-তরঙ্গের ঘাত-প্রতিঘাতে মানুষকে দারুণ মনঃপীড়া সহ্য করিতে হয়;—কখনও অবিশ্বাস, কখনও আস্তিক্যভাব, কখনও জ্ঞানবিচারের শুষ্কতা, কখনও ভক্তির কোমলতা, কখনও অভিমানের উষ্ণতা, আবার কখনও বা কর্ম্মের কঠোরতা এবং সর্ব্বশেষে শরণাগতের কৃপাভিক্ষা—দীনভাব—মনে উদিত হইয়া থাকে।

এই সময়ে রচিত একটী গান।

যোগাভ্যাস হইতে বিরত দেবেন্দ্রনাথের "কৃপা আশা করি" ঈশ্বরে আত্মসমর্পণের একটী অতি সরল সুন্দর চিত্র তাহার রচিত বিখ্যাত "কে তোমারে জান্‌তে পারে"—গানটির মধ্যে আমরা পাইয়া থাকি। বহু বৎসর পরে পুরাতন কাগজপত্র দেখিবার সময় ইহা হঠাৎ বাহির হয়। বহুকালের পর কবিতাটী পাইয়া তিনি আনন্দে অনেকক্ষণ ধরিয়া উহা গাহিয়াছিলেন এবং বলিয়াছিলেন,—"এইটী রচনার অল্পদিন পরেই ঠাকুরের শ্রীচরণদর্শনলাভ আমার ভাগ্যে ঘটিয়াছিল।" আমরা সম্পূর্ণ গানটী নিম্নে উদ্ধৃত করিয়া দিলাম—

(রামপ্রসাদী সুর)

"কে তোমারে জান্‌তে পারে,
তুমি না জানালে পরে ?
বেদ-বেদান্ত পায় না অন্ত,
খুঁজে বেড়ায় অন্ধকারে ॥
যাগ, যজ্ঞ, তপ, যোগ,
সকলি হয় কর্ম্মভোগ,
কর্ম্ম তোমার মর্ম্ম কি পায় ?—
তুমি সর্ব্ব কর্ম্মপারে ॥
সৃষ্টি জোড়া তোমার মায়া,
কায়া নাই কেবলি ছায়া,
মাঠের মাঝে আকাশ ধরা,
ঘুরে সারা চারি ধারে ॥
তুমি প্রভু, ইচ্ছাময়,
যদি তোমার ইচ্ছা হয়,

অসাধ্য সুসাধ্য তার,
তুমি কৃপা কর যারে ॥
তব কৃপা আশা করি'
রয়েছি জীবন ধরি'
কৃপানাথ কৃপা করি'
এস বস হৃদ্‌মাঝারে ॥" —দেবগীতি

কেশব বাবুর নিকট গমন।

এই সময় ব্রাহ্ম-সমাজে ব্রহ্মানন্দ কেশবচন্দ্র সেনের খুব নাম। তাঁহার যশঃসৌরভে সমুদয় বঙ্গদেশ আমোদিত। দেবেন্দ্রনাথ শান্তির আশায় কেশব বাবুর সমাজে যাতায়াত আরম্ভ করিলেন। তাঁহার মাতুল হরিশচন্দ্র মুস্তফী মহাশয়ের সহিত মধ্যে মধ্যে কেশব বাবুর নিকটেও যাইতে লাগিলেন। কেশব বাবু সুবক্তা, তাঁহার বক্তৃতা খুব ভাল লাগিত। কিন্তু দেবেন্দ্রনাথ সেখানে প্রাণের জিনিষ পাইলেন না। তাঁহার সন্দেহের নিরাকরণ হইল না—শান্তি আসিল না। দিনের পর দিন যাইতে লাগিল, হৃদয়ের ব্যাকুলতা বাড়িতে লাগিল, প্রাণ অস্থির হইয়া উঠিল।

"সাধু অঘোরনাথের জীবন-চরিত" পাঠ।

এই সময় একদিন চিন্তাক্লিষ্ট মনে ইতস্ততঃ বেড়াইতে বেড়াইতে মাণিকতলা ষ্ট্রীটে তাঁহার মাতুল হরিশবাবুর বাড়ী যাইয়া উপস্থিত। মাতুল তখন বাটীতে ছিলেন না। দেবেন্দ্রনাথ বৈঠকখানায় বিশ্রাম করিতে লাগিলেন। তথায় একখানা পুস্তক পড়িয়া ছিল। পুস্তক-খানি "সাধু অঘোরনাথের জীবনচরিত।" পুস্তকের এক স্থান খুলিয়া পড়িতে লাগিলেন। সেই স্থানে লেখা ছিল, কি ভাবে সাধু অঘোরনাথ

পশ্চিম অঞ্চলে প্রচারকার্য্যে যাইয়া দস্যুহস্তে পতিত হন এবং ভগবানের শরণাপন্ন হইয়া রক্ষা পান।

আমরা ঐ জীবনচরিত হইতে অঘোরনাথেরই লিখিত বর্ণনার কিয়দংশ নিম্নে উদ্ধৃত করিলাম—

“ঠিক সন্ধ্যার সময় এখানে (ছাপ্‌রা হইতে নয় মাইল দূরে এক পান্থশালায়) উপস্থিত হইলাম। আমি একাই সেখানে রহিলাম। * * * (গভীর রাত্রে) জন ১০।১২ লোক ডাকাতি রকমের হাঁক্ দিতে দিতে তাড়ির দোকানের নিকট আসিল। সেই হাঁকে বাস্তবিক পেটের পীলে চম্‌কে যায়। আমার মন সম্পূর্ণ অসহায় হইয়া ভয়ে দুঃখে তাঁহাকে ধারণ করিতে লাগিলাম। খানিক একান্ত নির্ভরের সাহিত দয়াময়কে ডাকিতে লাগিলাম। কিছু পরে তাহাদের মধ্যে গোলমাল উঠিল। কেহ কেহ ক্রমাগত গালি দিতেছে, কেহ বা মাটীতে আস্ফালন করিতেছে ও লাঠির দ্বারা ভূমিতে আঘাত করিতেছে, আবার কেহ ঠাট্টা করিয়া বলিতেছে, “শালা ছোটা হ্যায়, হাম্ একেলা এক লাঠিসে শির তোড়্ দেঙ্গে।” খানিক পর এক জন বলিয়া উঠিল, “বস্, আবি লোটো।” আর এক জন বলিয়া উঠিল, “হাঁ, আউর ক্যা! আবি লোটো, আউর মা’ ডালো।” —এই কথা শুনিবামাত্র আমি অস্থির হইয়া গেলাম, জীবনের সমুদয় আশা-ভরসা পরিত্যাগ করিয়া তাঁহার ক্রোড়ে গিয়া লুক্কায়িত হইলাম। উঃ! আর বলিতে পারি না। * * * * একবার ভাবিলাম, আমি চীৎকার করি, আবার ভিতর হইতে কে বলিয়া উঠিল, দূর অবিশ্বাসী! * * *

“আমার মন তখন উন্মত্তপ্রায়, বড় সংজ্ঞা নাই। (ডাকাতদিগকে) কি বলিয়াছি, মনে নাই। যাহা আছে, তাহা এইরূপ ভাবের—

"দেখ, আমি সেরূপ বাবু নই, * * * * আমি চাক্‌রি করি না, কেবল ভগবানের নাম ক'রে ও ভজন ক'রে বেড়াই, তবে যাহা আছে, তাহা তোমরা লইয়া যাও।"—এই কথা বলিতে বলিতে আমি হুঁ হুঁ করিয়া কাঁদিতে লাগিলাম। "তু দয়াল, দীন হোঁ; তু দানী, হোঁ ভিখারী"; আর, "ঠাকুর ঐ সো নাম তোমারা,"—এই দুই হিন্দি ভজন গাইয়াছিলাম। এই ভজন গাহিতে গাহিতে কখন্ যে অজ্ঞান হইয়াছিলাম, তাহাও আমি জানি না। * * *

"* * * হায়, পরলোক হইতে ফিরিয়া আসিলাম। আমি আর আপনাতে ছিলাম না। আমি আর তাঁহার প্রেমের কথা বলিব না, কেন না, তাঁহার উপযুক্ত নই।" * * *

"খানিক পরে দেখি, কোন গোলমাল নাই। * * * এক জন বলিতেছে, "আরে ইয়ো ভকৎ হ্যায়!" * * *

"কি আশ্চর্য্য, আমার কিছুই অপহৃত হয় নাই। * * * সকলই সেই দয়াময়ের ইচ্ছা!"—"সাধু অঘোরনাথের জীবনচরিত" (৩য় সংস্করণ) ৩১-৩৩ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য।

ঈশ্বরাস্তিত্বে বিশ্বাস ও ব্যাকুলতা।

এই বৃত্তান্তটী পাঠ করিয়া দেবেন্দ্রনাথ উন্মত্তের ন্যায় চীৎকার করিয়া বলিয়া উঠিলেন,—"কে বলে ভগবান্ নাই? এই যে ভগবান্ আছেন দেখ্‌ছি, নইলে অঘোরনাথকে কে বাঁচাইল?" দেবেন্দ্রনাথ তখনই আপন গৃহে ফিরিয়া আসিলেন। তাঁহার দৃঢ় ধারণা হইল, প্রাণ ভরিয়া ডাকিতে পারিলে তিনি নিশ্চয়ই ধরা দিবেন। গৃহের দ্বার রুদ্ধ করিলেন, কাতরভাবে ভগবান্‌কে আপন অন্তরের বাসনা জানাইতে লাগিলেন। ব্যাকুলতার আবেগে মস্তকের কেশ

ছিন্ন করিতে লাগিলেন! দেয়ালে কত মাথা খুঁড়িতে লাগিলেন! কাঁদিলেন—চীৎকার করিয়া ডাকিলেন,—"কোথায় কে আছ, দেখা দেও।"

তিন দিন তিন রাত্রি অনাহার অনিদ্রা—গুরু চাই।

তিন দিন তিন রাত্রি এইভাবে অনাহারে অনিদ্রায় কাটিয়া গেল! চতুর্থ দিবস প্রত্যূষে বাহির হইলেন, ছাদের উপর ক্ষুণ্ণ-মনে পাদচারণ করিতে লাগিলেন। কিয়ৎক্ষণ পরে পূর্ব্বদিকে বালার্ক উদিত দেখিয়া আবার উচ্চৈঃস্বরে বলিয়া উঠিলেন,—"কে বলে ভগবান্ নাই?—ঐ যে ভগবানের নিদর্শন!" তখন হৃদয়ের নিভৃত স্থান হইতে ধ্বনি উঠিল—"**গুরু চাই!**" দেবেন্দ্রনাথ ভাবিলেন—'ঈশ্বর ত সর্ব্বত্রই আছেন, কিন্তু কে তাঁহাকে চিনাইয়া দিবে? গুরু বিনা গতি নাই, গুরু নিশ্চয়ই চাই—এখনই চাই—নইলে যে প্রাণ বাঁচে না!' আবার মনে হইল—'যে সে গুরু হইলে ত চলিবে না, খাঁটী গুরু চাই।'

গুরুর জন্য বহির্গমন।

গুরুর জন্য ভগবানের নিকট কতই প্রার্থনা করিলেন। কোথায় গুরু? পূর্ব্বে কাল্নার সিদ্ধ ভগবান্দাস বাবাজীর নাম শুনা ছিল। লোকে যাঁহাকে সিদ্ধ বলে, নিশ্চয়ই তাঁহার উচ্চ অবস্থা! তাঁহারই নিকট দীক্ষা লইবেন—এই ভাবিয়া তৎক্ষণাৎ পাথেয় লইয়া কাল্নায় যাইবার জন্য আহিরীটোলা ষ্টীমারঘাটে উপস্থিত হইলেন। তথায় যাইয়া শুনিলেন, অল্পক্ষণ হইল, ষ্টীমার চলিয়া গিয়াছে, সে দিন আর ষ্টীমার যাইবে না।

ক্ষুণ্ণমনে বাসার দিকে ফিরিয়া আসিতেছিলেন, কি ভাবিয়া পথিমধ্যে পাথুরিয়াঘাটা ষ্ট্রীটস্থ পরিচিত নাগেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের বাটীতে প্রবেশ করিলেন। গৃহস্বামী গৃহে ছিলেন না। মন অত্যন্ত অস্থির, কি করেন, কিছুই স্থির করিতে পারিলেন না। সম্মুখে টেবিলের উপর একখানি পুস্তক পাইয়া, তাহা অন্যমনস্কভাবে খুলিলেন। পুস্তকের নাম "ভক্তি-চৈতন্যচন্দ্রিকা"। ইহার ৬৩ পৃষ্ঠার নিম্নের কয়েক ছত্র পড়িলেন। তাহাতে লেখা ছিল, "পরমহংস রামকৃষ্ণ এই নিত্য এবং লীলা অর্থাৎ নির্গুণ এবং সগুণ অবস্থার সঙ্গে জল আর বরফের তুলনা দিতেন। জল অনন্ত নিত্য ব্রহ্ম, অবতার তাঁহার ঘনীভূত এক এক খণ্ড বরফ সদৃশ। মূল পদার্থ অখণ্ড জল ভিন্ন আর কিছুই নয়।"—ইহাতে **পরমহংস রামকৃষ্ণ** নাম পড়িয়া মনে মনে কেমন এক ভাবের উদয় হইতে লাগিল। তিনি ভাবিলেন—'পরমহংস ত খুব উচ্চ অবস্থা! ভগবদ্দর্শন না হইলে এমত অবস্থা লাভ হয় না। তিনি কি আমার সহায় হইবেন?'

শ্রীরামকৃষ্ণদর্শনার্থ নৌকাযাত্রা।

এইরূপ ভাবিতে ভাবিতে বাসায় ফিরিয়া আসিতেছেন, এমন সময় পথিমধ্যে এক পরিচিত ব্যক্তির সহিত সাক্ষাৎ হইল। তাঁহাকে 'পরমহংস রামকৃষ্ণ' কোথায় থাকেন ইত্যাদি জিজ্ঞাসা করিলেন। তিনি বলিলেন, "দক্ষিণেশ্বরে রাণী রাসমণির দেবালয়ে রামকৃষ্ণ পরমহংস থাকেন।" বাসায় আসিয়া কালবিলম্ব না করিয়াই শ্রীরামকৃষ্ণ-দর্শনার্থ বহির্গত হইলেন। বাহির হইবার সময় বামে মঙ্গলসূচক পূর্ণকুম্ভ দেখিয়া, এবার অভীষ্টসিদ্ধি হইবে বলিয়া মনে আশার সঞ্চার হইতে লাগিল ও অত্যন্ত আনন্দ অনুভব করিতে লাগিলেন। আহিরী-

টোলা নৌকাঘাটে উপনীত হইয়া দেখিতে পাইলেন, একখানি নৌকা প্রস্তুত, একটী মাত্র লোকের অপেক্ষা করিতেছে। তিনি উঠিবামাত্র নৌকা ছাড়িয়া দিল। গঙ্গাবক্ষে পাল তুলিয়া দিয়া তরণী তর্ তর্ বেগে উত্তরাভিমুখে ছুটিয়া চলিল।

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণপরমহংসদেব

সপ্তম পরিচ্ছেদ

শ্রীরামকৃষ্ণ-দর্শন।

(বাংলা ১২৯১—ইং ১৮৮৪)

দক্ষিণেশ্বর সন্নিকট—হৃদয় দ্রুত স্পন্দিত।

নৌকা ক্রমশঃ দক্ষিণেশ্বরাভিমুখে অগ্রসর হইতে লাগিল। "পরমহংস দেখিতে কেমন, তিনি জটাজূটধারী কি না, তিনি আমার সহিত কথা কহিবেন কি না?"—ইত্যাদি চিন্তা দেবেন্দ্রনাথের মনে উদয় হইতে লাগিল। তিনি পূর্ব্বে কখনও দক্ষিণেশ্বরে যান নাই; এই জন্য ঘুস্‌ড়ীর টঁ্যাকের নিকট আসিলে মাঝিকে জিজ্ঞাসা করিলেন,—"দক্ষিণেশ্বর আর কত দূর, হে মাঝি?" মাঝি বলিল—"ঐ যে বাবু—রাসমণির ঠাকুরবাড়ী ঐ দেখা যাচ্ছে।" এই উত্তরে দক্ষিণেশ্বর সন্নিকট জানিয়া দেবেন্দ্রনাথের হৃদয় দ্রুত স্পন্দিত হইতে লাগিল। এক একবার ভাবিতে লাগিলেন, 'এত তাড়াতাড়ি না আসিলেই ভাল হইত। কি জানি কি ঘটিবে?' আবার ভাবিলেন—'এখান হইতেই নামিয়া যাই'। নামি নামি করিয়া আর নামা হইল না।

প্রতীক্ষায় তীরে শ্রীরামকৃষ্ণ দণ্ডায়মান।

দেখিতে দেখিতে নৌকা দক্ষিণেশ্বর কালীবাড়ীর বিশাল ঘাটের নিকট উপস্থিত! ঘাটে অবতরণ করিবার পূর্ব্বে দেখিতে পাইলেন, লাল পাড় কাপড় পরিহিত এক জন পুরুষ যেন কাহার প্রতীক্ষায় গঙ্গা-

তীরে ফুলবাগানে দণ্ডায়মান! তাঁহার এক হাতে ব্যাণ্ডেজ্ বাঁধা অবস্থায় গলদেশে সংলগ্ন রহিয়াছে। নৌকা ঘাটে লাগিলে নামিয়া আর তাঁহাকে দেখিতে পাইলেন না। দেখিলেন, এক জন যুবক (নিরঞ্জন মহারাজ) গঙ্গাস্নান করিতেছেন, আর একজন প্রৌঢ় ব্যক্তি স্নানান্তে কাপড় বগলে করিয়া করযোড়ে স্তব পাঠ করিতেছেন। তাঁহাকে পরমহংসদেবের কথা জিজ্ঞাসা করাতে তিনি বলিলেন,—"যাও না, বাবা, ঐ যে গোল বারান্দাওয়ালা ঘর দেখিতেছ, উহার ভিতর তিনি থাকেন, গেলেই দেখা পা'বে।"

গোল বারান্দায় পরমহংস-মিলন।

দেবেন্দ্রনাথের হৃদয় স্পন্দিত হইতে লাগিল। ধীরপদবিক্ষেপে সিঁড়ি দিয়া উঠিলেন ও গোল বারান্দার দিকে চলিতে লাগিলেন। বারান্দায় পৌঁছিয়া কাহাকেও দেখিতে না পাইয়া উদ্বিগ্নচিত্তে সেই বারান্দায় বসিয়া রহিলেন। কিছুক্ষণ পরে ফট্ ফট্ শব্দে চটী জুতা পায় দিয়া এক জন লোক, কোঁচার কাপড়টী কাঁধে ফেলা, আসিয়া উপস্থিত হইলেন। দেবেন্দ্রনাথ তাঁহাকে দেখিয়াই স্থির করিলেন, ইঁনিই সেই পরমহংস। পূর্ব্বে ভাবিয়াছিলেন, জটাজটধারী, গেরুয়া পরা, চিম্‌টা হাতে সাধু দেখিবেন; কিন্তু দর্শনমাত্রে সে সব চিন্তা কোথায় চলিয়া গেল! বুঝিলেন—ইনিই তাঁর অভীষ্টদেব—শ্রীরামকৃষ্ণ!

পদধূলি গ্রহণ—মন্ত্রমুগ্ধবৎ উপবেশন।

দেবেন্দ্রনাথ ভূমিষ্ঠ হইয়া তাঁহার পদধূলি গ্রহণ করিলেন। তিনি বলিলেন, "ওদিক্ দিয়ে ঘরের ভিতর এস। জুতা ঐখান্‌কে রেখনি, চোরে লিয়ে যাবেক্। এই থান্‌কে রাখ।" তাঁহার উপদেশমত কার্য্য করিয়া দেবেন্দ্রনাথ—ঘরে প্রবেশ করিলেন ও পুনরায়

প্রণাম করিলেন। ঘরের মেজেতে মাতুরের উপর উপবেশন করিয়া মন্ত্রমুগ্ধবৎ সেই পুরুষটীকে দেখিতে লাগিলেন। দেহ-মন এক্ষণে সকলই স্থির শান্ত! পূর্ব্বকথা সমস্তই ভুলিয়া গিয়াছেন।

কিছুক্ষণ পরে পরমহংসদেব জিজ্ঞাসা করিলেন,—"কোথা হ'তে আসা হচ্ছে?" দেবেন্দ্রনাথ—"কলিকাতা হ'তে"—এই উত্তরের পর পরমহংসদেব হাতের উপর হাত রাখিয়া ত্রিভঙ্গিমঠাম বংশীধারী শ্রীকৃষ্ণমূর্ত্তির অনুকরণ করিয়া দেবেন্দ্রনাথকে বলিলেন,—"কি এম্‌নি এম্‌নি দেখ্‌তে?" দেবেন্দ্রনাথ উত্তরে বলিলেন,—"না, আপনাকে দেখিতে আসিয়াছি।" এই কথা শুনিয়া পরমহংসদেব ঈষৎ ক্রন্দন-স্বরে বলিলেন,—"আর আমায় কি দেখ্‌বে বল? প'ড়ে গিয়ে আমার হাত ভেঙ্গে গেছে। হাত দিয়ে দেখ না—এই জায়গাটী,—দেখ দেখি হাড় ভেঙ্গেছে কি না? বড় যন্ত্রণা! কি করি?"

পরমহংসদেবের ভগ্ন হস্ত স্পর্শ।

দেবেন্দ্রনাথ অগত্যা একটু টিপিয়া দেখিলেন ও জিজ্ঞাসা করিলেন,—"কি ক'রে ভেঙ্গেছে?" শ্রীরামকৃষ্ণদেব কাঁদ-কাঁদ হইয়া বলিলেন,—"ও একটা অবস্থা হয়, তাইতে প'ড়ে গিয়ে ভেঙ্গে গেছে। ওষুধ দিলে আবার বাড়ে। অধর সেন ওষুধ দিয়েছিল, তাতে আরও ফুলে গেল, তাই আর কিছু দিই নি। হ্যাঁ গা, সারবে ত?" দেবেন্দ্রনাথ ভাবিলেন, সাধু মানুষ—এঁদের এম্‌নিই সেরে যাবে। প্রকাশ্যে বলিলেন,—"আজ্ঞে, সেরে যাবে বৈ কি?" এই কথা শুনিয়া পরমহংসদেব আহ্লাদে আটখানা হইয়া সকলকে ডাকিয়া বলিতে লাগিলেন,—"ওগো, ইনি বল্‌ছেন—আমার হাত সেরে যাবে; ইনি কলিকাতা হ'তে এসেছেন!"

শ্রীরামকৃষ্ণের বালকভাব দেখিয়া মুগ্ধ দেবেন্দ্রনাথ।

দেবেন্দ্রনাথ এইরূপ বালকভাব পূর্ব্বে কখনও দেখেন নাই, সুতরাং মনে একবার সন্দেহ হইল—'এ ত ঢং নয়, কোথায় আমি সাধু দর্শন করিতে আসিয়াছি, না আমায় সাধু বানাইয়া দিলেন! ইনি যেন আমায় বাক্‌সিদ্ধ পেলেন! আমি বলেছি বলেই হাত আরাম হয়ে যাবে—এঁর বিশ্বাস! এত সরল বিশ্বাস কি মানুষে হ'তে পারে? না—হয় ত এ সমস্ত লোক দেখান ঢং'।—এইরূপ সন্দেহ করিয়া তিনি পরমহংসদেবের দিকে অনিমেষ নেত্রে চাহিয়া রহিলেন। কিন্তু কিছুক্ষণ তাঁহার বালকভাবের অভিনয় দেখিতে দেখিতে দেবেন্দ্রনাথ মুগ্ধ হইয়া গেলেন, আর ভাবিলেন,—ইহার ভিতর কৃত্রিমতার লেশমাত্র থাকিতে পারে না। বাহিরে স্ত্রীলোকের ন্যায়, অন্তরে ঠিক বালক! উভয় ভাবের অপূর্ব্ব সংমিশ্রণ দর্শনে দেবেন্দ্রনাথ আত্মহারা হইয়া শ্রীরামকৃষ্ণদেবকে কেবল দেখিতে লাগিলেন।

তখন বেলা প্রায় দশটা হইবে। পরমহংসদেব এক জন ভক্তকে (শ্রীযুত হরিশকে) জলখাবার আনিয়া দিতে বলিলেন। মুখের কথা শেষ হইতে না হইতেই এক হস্তে সন্দেশ ও অপর হস্তে এক গ্লাস জল লইয়া হরিশ দেবেন্দ্রনাথের নিকট আসিয়া দাঁড়াইলেন। হরিশের দৃষ্টি শ্রীশ্রীঠাকুরের দিকে, তাহার উপর মুখে কোন কথা না বলায় দেবেন্দ্রনাথ বুঝিতে পারিলেন না, কাহার উদ্দেশ্যে এ খাবার আনীত। তিনি চুপ করিয়া রহিলেন, হরিশও এদিকে সমভাবে দণ্ডায়মান, দেবেন্দ্রনাথ বাধ্য হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন,—"এ কি আমার জন্য"? হরিশ নিঃশব্দে হাত দুটী বাড়াইলেন। দেবেন্দ্রনাথ অগত্যা সন্দেশ গ্রহণ করিয়া জলযোগ করিলেন।

শ্রীরামকৃষ্ণ—প্রেম কাহাকে বলে ?

জলযোগের পর শ্রীশ্রীঠাকুর ভগবৎ-প্রেম সম্বন্ধে আলাপ আরম্ভ করিলেন। বলিলেন,—"দেখ, প্রেম কাকে বলে জান ? যখন ভগবানের নামে সমস্ত জগৎ ভুল হয়ে যাবে, আপনাকে ভুল হ'য়ে যাবে, ঝড় উঠ্‌লে যেমন গাছপালা সব চেনা যায় না—সব এক রকম দেখায়, তেমনি ভগবৎ-প্রেমের উদয় হ'লে সব ভেদবুদ্ধি একবারে চ'লে যায়" ইত্যাদি। দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের শ্রীমুখবিনিঃসৃত অশ্রুতপূর্ব্ব বাণী তন্ময় হইয়া শুনিতে লাগিলেন, সেই মধুময় বাণী শুনিতে শুনিতে দেবেন্দ্রনাথ দেশ-কাল সমস্তই ভুলিয়া গেলেন ; দেখিলেন—যেন আনন্দধাম-শ্রীবৃন্দাবনে প্রিয়জনের সহিত মহানন্দে বিচরণ করিতেছেন ।

বিষ্ণুঘরের প্রসাদ গ্রহণ।

অনেকক্ষণ কথাবার্ত্তার পর মধ্যাহ্ন সমাগত দেখিয়া শ্রীরামকৃষ্ণদেব বলিলেন,—"দেখ, এখানে অনেক ভাল ভাল ব্রাহ্মণে খায়, এইটী ঠাকুর-বাড়ী, ঠাকুরের প্রসাদ খাবার আপত্তি কিছু নাই, তুমি এখানে খাও, বেলা হয়েছে, আর যেও না।" এই বলিয়া শ্রীশ্রীঠাকুর তদীয় ভ্রাতুষ্পুত্র শ্রীযুত রামলালকে বলিলেন, "দেখ্, ইনি খুব ভাল লোক, আজ এখানে খাবেন, ইঁহাকে বিষ্ণুঘরের প্রসাদ দিস্।" শুনিয়া দেবেন্দ্রনাথ ভাবিলেন, 'আমি যে নিরামিষভোজী, ইঁনি তাহা কেমন করিয়া জানিলেন ? ইঁনি কি অন্তরের কথাও জানিতে পারেন ?' দেবেন্দ্রনাথ সে দিন আর স্নান করিলেন না।

শ্রীশ্রীঠাকুরের কৃপা—অঙ্গস্পর্শ ও অন্তর্য্যামিত্বের পরিচয়।

শ্রীশ্রীঠাকুরকে দেখিয়া ও তাঁহার কথা শুনিয়া দেবেন্দ্রনাথের এত আহ্লাদ হইয়াছিল যে, আহার করিতে যাইতে যাইতে ও আহারান্তে

আসিতে শ্রীযুত রামলালের সহিত কেবল তাঁহারই কথা কহিতে লাগিলেন। উত্তরকালে এই প্রথম দর্শন-বর্ণনা প্রসঙ্গে দেবেন্দ্রনাথ বলিতেন,—"ঠাকুর যাঁহাকে কৃপা করিতেন, যাহারা তাঁহার অন্তরঙ্গ ভক্ত, প্রথম দর্শনেই কোন না কোন প্রকারে তাঁহাদিগকে দিয়া নিজ পবিত্র অঙ্গ স্পর্শ করাইয়া লইতেন এবং তাঁহার অন্তর্য্যামিত্বের কিঞ্চিৎ পরিচয় দিয়া নিজেকে কতকটা ধরা দিতেন। আমি উপস্থিত হইবামাত্র অন্তরে আমার কৃষ্ণরূপে প্রীতি থাকায়, প্রসিদ্ধ কালীবাড়ীতে উপস্থিত হইলেও, প্রথমে কালীদর্শনের কথা উল্লেখ না করিয়া কৃষ্ণদর্শনের কথাই ত্রিভঙ্গিমঠাম দ্বারা জ্ঞাপন করেন এবং পরে তিনি আমার হাতখানি লইয়া তাঁহার ভাঙ্গা হাতের উপর দেন। তারপর তাঁহার কাছে ত কত লোক যায়, আমি অধর সেনকে চিনিতাম বলিয়া তিনি আমার কাছে তাঁহার নাম করেন। আরও আমি বাল্যাবধি মৎস্য-মাংস খাই না, এজন্য রামলাল দাদাকে আমায় বিষ্ণুঘরের প্রসাদ দিতে বলেন। প্রথম দিনেই দয়াময় ঠাকুর আমার নিকট অনেকটা ধরা দিয়াছিলেন। তিনি নিজে ধরা না দিলে কার সাধ্য তাঁহাকে ধরিতে পারে?"

বলা বাহুল্য, শ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংস-দর্শনের পর—তাঁহার সুমধুর কথা শুনিয়া ও অলৌকিক ভাব দেখিয়া বিমুগ্ধ দেবেন্দ্রনাথের অন্তরের সঞ্চিত সন্দেহ ও অশান্তি একেবারে অন্তর্হিত হইয়া গেল। স্বভাবজাত মধুর প্রেম ও ভাবের রুদ্ধ উৎসসকল বহুকালের পর উন্মুক্ত হইল—বিমল আনন্দে হৃদয় প্লাবিত হইল—পবিত্র স্পর্শে হৃৎপদ্ম বিকশিত হইতে লাগিল!

দেবেন্দ্রনাথের শরীর অসুস্থ।

আহারান্তে কিঞ্চিৎ বিশ্রামের পর দেবালয়াদি দর্শন করিয়া দেবেন্দ্রনাথ পুনরায় শ্রীশ্রীঠাকুরের নিকট আসিলেন এবং তাঁহার শ্রীমুখনিঃসৃত বেদবাণী শ্রবণ করিতে লাগিলেন। কিয়ৎক্ষণ কথাবার্ত্তার পর ঠাকুর রামকৃষ্ণ দেবেন্দ্রনাথের মুখপানে চাহিয়া বলিলেন,—"হ্যাঁ গা, তোমার মুখ অমন শুক্‌নো দেখাচ্ছে কেন? কোন অসুখ করে নাই তো?" দেবেন্দ্রনাথের এতক্ষণ হুঁস্ ছিল না। ঠাকুরের কথায় গায়ে হাত দিয়া দেখিলেন, গা বেশ গরম হইয়াছে। দেবেন্দ্রনাথ বলিলেন,"একটু যেন অসুখ বোধ করিতেছি।" ঠাকুর চিন্তিত হইয়া বলিলেন,—"তোমার কোন অসুখ আছে না কি?" দেবেন্দ্রনাথ বলিলেন,—"পূর্ব্বে আমার ম্যালেরিয়া জ্বর হইত, অনেক দিন হয় নাই, বোধ হয়, আবার জ্বর আসিয়াছে।" ঠাকুর উদ্বিগ্ন হইয়া "তাই ত, তাই ত," বলিয়া গৃহমধ্যে বিচরণ করিতে লাগিলেন, যেন, কি করিবেন কিছুই স্থির করিতে পারিতেছেন না।

শ্রীযুত বাবুরামের দেবেন্দ্রনাথকে লইয়া কলিকাতা আগমন।

ইতিমধ্যে শ্রীযুত বাবুরাম (স্বামী প্রেমানন্দ) নামে এক যুবা ভক্ত শ্রীশ্রীঠাকুরের নিকট উপস্থিত হইলেন। তিনি তাঁহাকে সস্নেহে কহিলেন, "তুই এসেছিস্?—বেশ হয়েছে। দেখ্, ইনি কল্‌কাতা থেকে এসেছেন, বড় ভাল লোক। এঁর জ্বর হয়েছে, বাড়ী যাবেন। তুই এঁকে একখানা নৌকা ক'রে এঁর বাড়ী পৌছে দে।" বাবুরাম সানন্দচিত্তে শ্রীশ্রীঠাকুরের আদেশ শিরোধার্য্য করিয়া তৎক্ষণাৎ গঙ্গাতীরে যাইয়া নৌকার চেষ্টায় দণ্ডায়মান হইলেন।

রামকৃষ্ণদেবও পশ্চিমের দ্বার খুলিয়া বারান্দায় দাঁড়াইয়া নৌকা দেখিতে লাগিলেন। দূরে একখানি বাঙ্গাল মাঝির টাপুরে নৌকা দেখিতে পাইয়া বাবুরামকে ঐ নৌকা ডাকিতে বলিলেন। বাবুরাম চীৎকার করিয়া ও উত্তরীয় নাড়িয়া মাঝিকে আসিতে ইঙ্গিত করিলেন। মাঝি নৌকা ফিরাইয়া ঘাটে আনিল। বাবুরাম দেবেন্দ্রনাথকে আনিতে ঘরের ভিতর আসিলেন। রামকৃষ্ণদেব মধুর হাস্যে বাবুরামের হস্ত ধরিয়া, পাছে তিনি ক্ষুণ্ন হন, এজন্য তাঁহাকে সস্নেহে বলিলেন,—"তুই আর এক দিন আসিস্; তোর সঙ্গে অনেক কথা কইব। আজ এঁকে বাড়ী পৌঁছিয়ে দে।" পরে দেবেন্দ্রনাথকে বলিলেন,—"তুমি বাড়ী যাইয়া এক জন ভাল ডাক্তার দেখাইও এবং সেরে গেলে ফের্ এখান্কে এস। কেমন, আসবে ত ?" দেবেন্দ্রনাথ বলিলেন,—"আজ্ঞে হাঁ।"

প্রবল জ্বরে একচল্লিশ দিন অজ্ঞান।

যুবক ভক্ত ও দেবেন্দ্রনাথ শ্রীশ্রীঠাকুরের পদধূলি লইয়া নৌকায় উঠিলেন। নৌকা কলিকাতাভিমুখে চলিতে লাগিল। পাঁজরায় বেদনা অনুভব করাতে দেবেন্দ্রনাথ মাঝে মাঝে গঙ্গা হইতে জল লইয়া তথায় দিতে লাগিলেন। সমস্ত পথ তিনি সঙ্গীর সহিত কেবল শ্রীশ্রীঠাকুরের কথা কহিতে কহিতে আসিয়াছিলেন। নৌকা বাগবাজারের ঘাটে পৌঁছিলে তিনি তাঁহাকে বলিলেন,—"এইবার আপনি যান, আপনাকে অনেক কষ্ট দিয়াছি, নিরর্থক আর আপনাকে কষ্ট দিব না। আমি এখন একলাই বাড়ী যেতে পার্‌ব।" বাবুরাম সঙ্গে আসিতে চাহিলেও তিনি তাঁহাকে নিরস্ত করিয়া মাতালের মত টলিতে টলিতে নিকটবর্ত্তী এক আত্মীয়ের গৃহে উপস্থিত হইলেন,

এবং বাসায় যাইবার জন্য পাল্কী আনিতে বলিয়া শুইয়া পড়িলেন। শুইবামাত্রই প্রবল জ্বরে অজ্ঞান হইয়া পড়িলেন।

একচল্লিশ দিন পর জ্বরত্যাগ হয়, তখন জ্ঞানসঞ্চার হইলে দেবেন্দ্রনাথ দেখিলেন, তিনি সেই আত্মীয়ের বাড়ীতেই রহিয়াছেন। জ্বরে অচৈতন্য অবস্থায় বলিতেন,—"ঠাকুরবাড়ীতে শৌচ, প্রস্রাব করা ভাল হচ্চে না।" মধ্যে মধ্যে পরমহংসদেবের নাম উল্লেখ করিয়া অনুচ্চৈঃস্বরে কত কি বলিতেন; এবং যখনই রোগ যন্ত্রণায় অস্থির হইয়া চক্ষু ঊর্দ্ধদিকে উন্মীলন করিতেন, তখনই যেন শিয়রে শ্রীরামকৃষ্ণদেবকে দেখিতে পাইতেন।

অষ্টম পরিচ্ছেদ

বলরাম-মন্দিরে পুনর্মিলন।

শ্রীশ্রীঠাকুরের নিকট যাইতে দেবেন্দ্রনাথের আতঙ্ক।

বহুকাল শয্যাগত থাকিয়া দেবেন্দ্রনাথ ক্রমশঃ আরোগ্য লাভ করিলেন। কিন্তু দক্ষিণেশ্বরের উপর টান কমিয়া গেল, এবং পরমহংসদেবের নামে তাঁহার কেমন আতঙ্ক উপস্থিত হইল। জ্বরের সময় করুণাময় ঠাকুরের যে করুণা উপলব্ধি করিয়াছিলেন ও তাঁহাকে অনবরত যে শিয়রে উপবিষ্ট দেখিতেন, তাহা এখন রোগের বিকার বা মস্তিষ্কের খেয়াল বলিয়া মনে হইল। দেবেন্দ্রনাথ মনে করিলেন, 'সাধু-দর্শন করিলে লোকের মঙ্গল হয়, কিন্তু এ কি! বাপ্, একেবারে প্রাণ নিয়ে টানাটানি! পরমহংস আমার মাথায় থাকুন, আমি আর ওমুখো হচ্ছি না।'

তাঁহার প্রতি আবার সংশয়।

দেবেন্দ্রনাথের মন এই ঘটনার পর কিছুদিন পর্য্যন্ত আবার নানারূপ সংশয়-দোলায় দুলিতে লাগিল। তাঁহার মনে হইত, 'তবে কি সাধুদর্শনের মাহাত্ম্য এত দিন যাহা শুনিয়া আসিয়াছি, তাহা সবই মিথ্যা! তবে সর্ব্বদেশের সর্ব্বশাস্ত্রে সাধুদর্শনের এত মহিমা প্রচার করে কেন?'—ইত্যাদি নানা সংশয় মনে উপস্থিত হইয়া তাঁহাকে যন্ত্রণা দিতে লাগিল।

মনের এই অবস্থা সম্বন্ধে দেবেন্দ্রনাথ পরে বলিয়াছিলেন,—"দেখ, সংসারে আসিয়া মানবের মন এমনই হইয়া যায় যে, সে সহসা কোন

ভাল ভাব গ্রহণ করিতে চায় না ; সকল বিষয়ে সে মন্দ ভাবটা আগে গ্রহণ করে। সাধুদর্শনের পর জ্বরে আমার প্রাণসংশয় হওয়াতে সাধুদর্শনের উপর বিতৃষ্ণা জন্মিল, যেন তাহাই আমার জ্বরের একমাত্র কারণ। এখন বুঝিতেছি, আমার মনে করা উচিত ছিল যে,—এই জ্বরেই আমার প্রাণবিয়োগ ঘটিত, কেবল পরমহংস-দেবকে দর্শন করার ফলে এ যাত্রায় বাঁচিয়া গেলাম। এইরূপে নিজের অবস্থা দেখাইয়া সকলকে প্রত্যেক বিষয় হইতে ভাল ভাবটী বাছিয়া গ্রহণ করিতে বিশেষভাবে তিনি উপদেশ দিতেন।

"তাঁকে স্মরণ ক'রে যাত্রা করেছিলাম,—তাই বেঁচে গেলাম"।

এই প্রসঙ্গে বিশ্বাসী ভক্তপ্রবর শ্রীযুত গিরিশচন্দ্রের একদিনকার ঘটনার কথাও তিনি প্রায়ই উল্লেখ করিতেন। ঘটনাটী এই—একদা গিরিশচন্দ্র কোথাও যাইবার সময় আপন আলয়ে হুঁচট্ খাইয়া পড়িয়া যান ; সম্মুখে এক ভগ্ন প্রাচীর ছিল, তাহার উপর ভর দিয়া রক্ষা পান। পশ্চাৎ হইতে এক জন বলিয়া উঠিল, "ভাগ্‌গিস্ দেয়াল ছিল, তাই বেঁচে গেলেন"।

গিরিশচন্দ্র গর্জ্জিয়া বলিলেন,—"দূর্ শালা, বল্, ঠাকুর ছিলেন—তাঁকে স্মরণ ক'রে যাত্রা করেছিলাম, তাই বেঁচে গেলাম! নচেৎ এই পুরানো ভাঙ্গা দেয়াল কি ক'রে এত বড় ভারী শরীরটা রক্ষা কর্‌ল ?"

রোগমুক্ত হইয়া দেবেন্দ্রনাথ গৃহে রহিলেন। পুনরায় দক্ষিণেশ্বরে যাইবেন না, এক প্রকার স্থির করিলেন। যদি কখনও দক্ষিণেশ্বরে যাইবার কথা মনে হইত, অমনি মনকে বুঝাইতেন,—'সেখানে গেলে বুঝি তোমাকে তিনি চতুর্ভুজ ভগবান্ দেখিয়ে দেবেন, না? এই ত গিয়েছিলে—কেমন ভগবান্ দেখে এলে? বাপ্! প্রাণ নিয়ে

টানাটানি। তার চেয়ে যা রয় সয়, তাই কর না কেন? ব্রাহ্মণের ছেলে নিঃসহায় ত নও? গায়ত্রী জপটাই বেশ ক'রে কর না কেন?'—ইহা ভাবিয়া একমনে গায়ত্রী জপ আরম্ভ করিলেন। জপের সংখ্যা দিনের পর দিন বাড়িতে লাগিল, এমন কি, শেষে জপ করিতে করিতে সমস্ত রাত্রি কাটিয়া যাইত।

বলরাম-মন্দিরে পরমহংস মহাশয় ভক্ত-সহ মিলিত।

এইরূপে দেবেন্দ্রনাথের দিন কাটিতে লাগিল। এক দিবস সন্ধ্যার প্রাক্‌কালে বিশেষ কোন কর্ম্ম না থাকায় দেবেন্দ্রনাথ তাঁহার পূর্ব্ব-পরিচিত নাগেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়ের সহিত সাক্ষাৎ করিতে আসেন। নাগেন্দ্র বাবু তখন বাড়ী না থাকায় তদীয় বৈঠকখানায় তাঁহার জন্য অপেক্ষা করিতে লাগিলেন এবং সম্মুখে একখানা কেশব বাবুর 'সুলভ সমাচার' পত্রিকা পাইয়া তাহা পড়িতে পড়িতে দেখিলেন, এক স্থানে লেখা রহিয়াছে,—"অদ্য বেলা ৫ঘটিকার সময় দক্ষিণেশ্বরের রামকৃষ্ণ পরমহংস মহাশয়* বাগবাজারে শ্রীযুক্ত বলরাম বসু মহাশয়ের বাটীতে ভক্তসহ মিলিত হইবেন।" 'পরমহংস' পড়িবামাত্র তাঁহার হৃদয়ে যেন কেমন এক অপূর্ব্ব প্রবল আকর্ষণ অনুভূত হইতে লাগিল এবং তাঁহাকে দেখিবার জন্য অন্তর ব্যাকুল হইয়া উঠিল। তিনি পূর্ব্বসংকল্প ভুলিয়া গেলেন—তাঁহার পদদ্বয় তাঁহাকে যেন বলপূর্ব্বক বাগবাজারের অভিমুখে লইয়া চলিল; ফিরিবার সামর্থ্য রহিল না। পরমহংসদেবের চিন্তা তাঁহার সমুদয় হৃদয়মনকে অধিকার করিয়া বসিল।

* দেহ থাকা অবস্থায় শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংসদেবকে 'পরমহংস মশায়', বলিয়া সকলে বলিত এবং 'পরমহংস রামকৃষ্ণ মহাশয়' লেখা হইত। 'শ্রীশ্রী' ও 'দেব' যোগ পরবর্ত্তী কালের।

কীর্ত্তনে অপূর্ব্ব নৃত্য-লীলা দর্শন।

দেবেন্দ্রনাথ দ্রুতপদবিক্ষেপে বলরামবাবুর বাটীতে উপনীত হইলেন। তখন সন্ধ্যা উত্তীর্ণপ্রায়। দেখিলেন, অত্যন্ত জনতা, সহসা ভিতরে প্রবেশ করিতে লজ্জা আসিয়া বাধা দেওয়ায়, দ্বারদেশে দণ্ডায়মান হইলেন এবং শ্রীরামকৃষ্ণদেবের ভক্তপরিবৃত অবস্থায় কীর্ত্তনে অপূর্ব্ব নৃত্যলীলা দর্শন করিতে লাগিলেন। ঠাকুর কীর্ত্তনানন্দে হেলিয়া দুলিয়া নাচিতেছেন; সঙ্গে সঙ্গে সমুদয় ভবনও যেন আনন্দে নাচিতেছে—তাঁহার মনে হইল। সর্ব্বত্রই কেবল আনন্দ বিরাজ করিতেছে!

জীবনে কত কীর্ত্তনীয়ার কত কীর্ত্তন ও নৃত্য দেখিয়াছেন, নিজে তাহাতে কত সময় আনন্দে বিভোর হইয়াছেন; কিন্তু অদ্যকার ঠাকুরের এ অদৃষ্টপূর্ব্ব নৃত্যলীলা দর্শনে তাঁহাকে যেন কে বলপূর্ব্বক কোন্ এক অজানিত দেশে লইয়া গেল—অজ্ঞাতসারে তাঁহার সমস্ত মনপ্রাণ হরণ করিয়া আনন্দ-সাগরে ডুবাইয়া দিল! নিজ বুদ্ধি দোষে, এমন আনন্দময় ঠাকুরের সঙ্গ হইতে এত দিন আপনাকে বিচ্ছিন্ন রাখিয়াছেন মনে করিয়া, দেবেন্দ্রনাথের বড় অনুতাপ হইতে লাগিল। ঠাকুরের কাছে যাইয়া তাঁহাকে মুখ দেখাইতে সঙ্কোচ বোধ হওয়ায়, নিভৃতে একপার্শ্বে ম্রিয়মাণভাবে দাঁড়াইয়া তাঁহাকে অনিমেষলোচনে নিরীক্ষণ করিতে লাগিলেন।

সমাধিস্থ ঠাকুরকে প্রণাম।

ঠাকুর নৃত্য করিতে করিতে সহসা সমাধিস্থ হইয়া স্থির দণ্ডায়মান হইলেন; চতুর্দ্দিক্ হইতে ভক্তগণ দলে দলে যাইয়া তাঁহার পদধূলি গ্রহণ করিতে লাগিলেন। তিনি নিশ্চল অবস্থায় দাঁড়াইয়া

আছেন। দেবেন্দ্রনাথ দেখিলেন—এই মহা সুযোগ, ঠাকুর কাহারও সহিত কথা কহিতেছেন না, আর এই ভিড়ের মধ্যে তিনি তাঁহাকে চিনিতে পারিবেন না। এই সুযোগেই পদধূলি লওয়া সঙ্গত মনে করিয়া, যেমন দেবেন্দ্রনাথ অগ্রসর হইয়া ঠাকুরের শ্রীপাদপদ্ম স্পর্শ করিলেন।

"আমি যে তোমার কথা প্রায়ই ভাবি"।

ঠাকুরও তন্মুহূর্ত্তেই, সস্নেহে দেবেন্দ্রনাথের পৃষ্ঠে হাত দিয়া বলিলেন,—"কি গো কেমন আছ? এত দিন ওখানকে যাওনি কেন? আমি যে তোমার কথা প্রায়ই ভাবি।"

ধরা পড়িয়া লজ্জাবনতবদনে দেবেন্দ্রনাথ উত্তর করিলেন,—"আজ্ঞে, ভাল আছি। বড় অসুখ করেছিল, তাই যাওয়া ঘ'টে উঠেনি।"

ঠাকুর পুনরায় সস্নেহে মধুর বাক্যে বলিলেন,—"এখন থেকে যেও, ওখানে যেও, কেমন, যাবে ত?"

শ্রীশ্রীঠাকুরকে ছাড়িয়া থাকা আর সম্ভব হইল না।

"আজ্ঞে, যাব বৈ কি।"—বলিয়া দেবেন্দ্রনাথ চুপ করিয়া রহিলেন। যে সন্দেহ তাঁহাকে এত কাল কষ্ট দিয়াছিল, তাহার আর চিহ্নমাত্র রহিল না। শ্রীশ্রীঠাকুরের সঙ্গলাভের জন্য প্রাণে প্রবল বাসনা জাগিয়া উঠিল। এখন হইতে তাঁহাকে ছাড়িয়া থাকা আর সম্ভব হইল না।

দক্ষিণেশ্বরে সর্ব্বদা যাতায়াত—পরমহংস সাধারণ সাধু পুরুষ নহেন।

ইহার পর হইতে দেবেন্দ্রনাথ নিয়মিতভাবে ঠাকুরের নিকট দক্ষিণেশ্বরে যাতায়াত করিতে লাগিলেন। এই সময় তিনি পরিবারবর্গ লইয়া আহিরটালীতে নিমু গোঁসাইর লেনে বাস করিতেছিলেন।

দেবেন্দ্রনাথ জমিদারী সেরেস্তায় কার্য্য করিতেন বলিয়া তাঁহার পক্ষে শনিবার-রবিবার সমান ছিল। যাঁহারা আফিসে কার্য্য করিতেন কিংবা স্কুল-কলেজে পড়িতেন, তাঁহাদের শনি বা রবিবার ভিন্ন দক্ষিণেশ্বরে যাইবার সুবিধা হইত না। দেবেন্দ্রনাথের সে সব ঝঞ্ঝাট ছিল না; সেরেস্তার কার্য্য শেষ হইলেই তাঁহার ছুটী হইত। সুতরাং, যখনই অবকাশ পাইতেন, তখনই দক্ষিণেশ্বরে যাইয়া ঠাকুরের শ্রীচরণপ্রান্তে উপনীত হইতে পারিতেন। কতিপয় দিবস যাতায়াতের পর দেবেন্দ্রনাথের দৃঢ় প্রত্যয় জন্মিল যে, পরমহংসদেব সাধারণ সাধু পুরুষ নহেন; তিনি কৃপা করিলে মুক্তি অবশ্যম্ভাবী। এজন্য দেবেন্দ্রনাথ তাঁহাকে মনে প্রাণে গুরুত্বে বরণ করিলেন। কিন্তু ঠাকুর তাঁহাকে মন্ত্র দিবার কোন লক্ষণই দেখাইলেন না।

মন্ত্র লইবার চেষ্টা—ফুল ও মালাসহ গমন।

এইরূপে কিছু দিন কাটিবার পর, এক দিন ঠাকুর তাঁহাকে দীক্ষা গ্রহণ করিয়াছেন কি না জিজ্ঞাসা করিলেন। তিনি উত্তর করিলেন, "না মশাই—মন্ত্র নেওয়া হয় নি। তবে, আমার বড় ইচ্ছা, আপনার কাছে মন্তর নি।"

ঠাকুর তাহাতে বলিয়াছিলেন,—"কি করবো বাপু, আমি ত কাহাকেও মন্তর দেই নাই।" এ কথায় দেবেন্দ্রনাথের মনে কষ্ট হইলেও তিনি হতাশ হইলেন না। কিছু দিন পরে তিনি এক শুভদিনে গঙ্গাস্নান এবং শুদ্ধ পট্টবস্ত্র পরিধান করিয়া, ফুল, ফুলের মালা ও তোড়া সহ দক্ষিণেশ্বরে ঠাকুরের নিকট উপস্থিত হইলেন। মনে মনে আশা, আজ ঠাকুর নিশ্চয় তাঁহাকে মন্ত্র দিবেন।

"ফুলে দেবতার ও বাবুদের অধিকার"।

ফুল ও মালা দেখিয়া প্রীতির সহিত ঠাকুর বলিলেন,—"বেশ ফুল, বেশ মালা ত! যাও, ঠাকুরদের দিয়ে এসো।"

এই কথা শুনিয়া দেবেন্দ্রনাথ ক্ষুব্ধচিত্তে বলিলেন,—"এ মালা আপনার জন্য আনিয়াছি।"

শ্রীশ্রীঠাকুর দেবেন্দ্রনাথের মুখের দিকে কিয়ৎক্ষণ চাহিয়া রহিলেন, পরে বলিলেন,—"ফুলে দেবতার ও বাবুদের অধিকার; তুমি আমায় কি ঠাওরাও?"

দেবেন্দ্রনাথ অভিমানের স্বরে বলিলেন,—"এই দুয়ের মধ্যে একটা মনে করেছি।"

তাঁহাকে সন্তুষ্ট করিবার জন্য ঠাকুর একটী ছোট তোড়া লইয়া বলিলেন,—"আচ্ছা, আমি একটী নিচ্ছি, বাকীগুলি মায়ের ঘরে দিয়ে এসো।"

অগত্যা দেবেন্দ্রনাথ তাহাই করিলেন। মনে মনে ভাবিলেন, বোধ হয়, আমার এখনও সময় হয় নাই। সময় এবং আবশ্যক হইলে ইনি নিশ্চয়ই আমাকে ডাকিয়া মন্ত্র দিবেন।'—এইরূপ চিন্তা করিয়া নিজের অস্থির মনকে সান্ত্বনা দিলেন এবং ঠাকুরের শ্রীচরণে মনে মনে নিজেকে সমর্পণ করিলেন।

উক্ত ঘটনাটী উল্লেখ করিয়া দেবেন্দ্রনাথ বলিতেন,—"ঠাকুর আমার ফুলের মালাগ্রহণে বাধা দিয়াছিলেন"। আমরাও দেখিয়াছি, কেহ তাঁহার গলায় ফুলের মালা দিলে, তাঁহার বাহ্যজ্ঞান ক্ষণেকের জন্য থাকিত না। পরে, তিনি ঠাকুরের নাম স্মরণ করিতে করিতে সহজাবস্থায় নামিয়া আসিতেন।

ঠাকুরকে সর্ব্বত্র দর্শন।

মন্ত্র লইবার প্রসঙ্গে দেবেন্দ্রনাথ পরে আমাদিগকে বলিতেন,—"আমি এই সময় ঠাকুরকে সর্ব্বত্র দর্শন করিতাম,—রাস্তায় চলিতেছি, দেখি ঠাকুর আমার দিকে তাকাইয়া আগে আগে চলিতেছেন। আমি দাঁড়াইলে, তিনি দাঁড়াইতেন; আমি বিশ্রাম করিতে বসিলে, তিনিও বসিতেন।—সর্ব্বদাই আমার সঙ্গে ফিরিতেন। এমন কি, আমি শৌচে গিয়াও তাঁহাকে সম্মুখে দেখিতাম; প্রথম প্রথম আমার বড় লজ্জা বোধ হইত। একদিন মা কালীকে প্রণাম করিয়া উঠিয়া দেখি, তিনি আমার সম্মুখে দাঁড়াইয়া আছেন। বোধ হয়,—তিনি যে আমার সর্ব্বস্ব, আমার রক্ষাকর্ত্তা—ইহা বুঝাইবার জন্য ঠাকুর আমার সঙ্গছাড়া হইতেন না।"—ইহাই কি জগদ্‌গুরুর প্রাণে মন্ত্রদান? সর্ব্বত্র ঠাকুরকে এই ভাবে দর্শনের ফলে তাঁহার উপর দেবেন্দ্রনাথের প্রাণের টান অচল ভাব ধারণ করিয়াছিল।

নবম পরিচ্ছেদ

শ্রীরামকৃষ্ণ-কৃপালাভ ও হরিনাম সাধন।

(১৮৮৪-৮৫)

ভাবরাজ্যের সম্বন্ধ।

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণদেব তাঁহার ভক্তগণের সহিত ভিন্ন ভিন্ন ভাবে লীলা করিতেন। অনন্তভাবময় ঠাকুর কেন যে ঐ ভাবে তাঁহাদের সহিত বিহার করিতেন, তাহা তিনিই জানিতেন। দেখা যাইত, ভাবরাজ্যে কেহ তাঁহার পুত্র, কেহ দাস, কেহ বা সখা ইত্যাদি। প্রথম মিলনদিন হইতে শেষকাল পর্য্যন্ত তাঁহার সহিত সেই ভাবেই সম্বন্ধ পাতাইয়া লীলা করিয়াছেন। প্রথম প্রথম ঠাকুরের সহিত নিজের যথার্থ ভাবটী কি, তাহা বুঝিতে না পারিয়া যদি কেহ ইহার ব্যতিক্রম করিয়া ফেলিতেন, তীক্ষ্ণ-দৃষ্টিসম্পন্ন ঠাকুর তৎক্ষণাৎ তাহা সংশোধন করিয়া দিতেন। এ সম্বন্ধে দেবেন্দ্রনাথের নিজ মুখের কথা (যাহা আমরাও শুনিয়াছি) ভক্তপ্রবর শ্রীযুক্ত প্রিয়নাথ সিংহ (গুরুদাস বর্ম্মণ) মহাশয় যাহা লিপিবদ্ধ করিয়া গিয়াছেন, এবং যাহা বহু পরে ১৩৩৩ সালের ফাল্গুন মাসের 'উদ্বোধন' পত্রিকায় প্রকাশিত হয়, আমরা তাহার কিয়দংশ নিম্নে উদ্ধৃত করিলাম।

মহাপুরুষের সেবা দ্বারা চিত্ত শুদ্ধির ইচ্ছা।

"* * * তাঁহার মনে হইল, মহাপুরুষের সেবা না করিতে পারিলে চিত্তশুদ্ধি হয় না ; যোগসাধনা করিলে কি হইবে ? চিত্তশুদ্ধি ব্যতীত ইষ্টলাভ হইবে না। তিনি যখনি দক্ষিণেশ্বরে গমন করেন, দেখেন যে, রামকৃষ্ণদেবের নিকট যে সমস্ত ব্রহ্মচারী বালক থাকেন, তাঁহারা তাঁহার

সেবায় রত। রামকৃষ্ণদেব যখনি শৌচে যান, তাঁহার ভক্তদের কেহ-না-কেহ অমনি গাড়ুটি লইয়া তাঁহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ গমন করেন। দেবেন্দ্রনাথেরও ঐ প্রকার শ্রীরামকৃষ্ণের সেবা করিবার বড়ই ইচ্ছা জন্মিল। একদিন তিনি চুপি চুপি গুরুভাইদের নিকট ঐ ইচ্ছা জানাইলেন; এবং অপেক্ষা করিতে লাগিলেন—কখন্ রামকৃষ্ণদেব শৌচে গমন করেন।

"তোমার সঙ্গে যে আমার ওভাব লয় গো"।

"রামকৃষ্ণদেব যেমন শৌচে যাইলেন, অমনি গাড়ুটি লইয়া তাঁহার পশ্চাৎ গমন করিলেন। পঞ্চবটীর কাছে যাইয়া রামকৃষ্ণদেব পিছন ফিরিয়া দেখিলেন, দেবেন্দ্রনাথ গাড়ু-গাম্ছা লইয়া আসিতেছেন। দেখিবা-মাত্র যেন কতই অপ্রতিভ হইয়া জিব কাটিয়া কহিলেন, "অ্যাঁ! তুমি কেন লিয়ে আস্‌ছ, তোমার সঙ্গে যে আমার ওভাব লয়, তোমার সঙ্গে যে আমার ওভাব লয় গো।" দেবেন্দ্র রামকৃষ্ণের একজন অন্তরঙ্গ ভক্ত। তাঁহার সঙ্গেও তাঁহার অন্যান্য ভক্তবৃন্দের মত জন্ম-জন্মান্তরীণ একটি বিশেষ সম্বন্ধ আছে। রামকৃষ্ণদেব দেবেন্দ্রকে দেখিয়াই তাহা জানিতে পারিয়াছিলেন, কিন্তু দেবেন্দ্র তাহা কিছুই জানেন না; সুতরাং রামকৃষ্ণদেবের কথার মর্ম্ম কিছুমাত্র বুঝিতে না পারিয়া তাঁহার হৃদয় ব্যথিত হইয়া উঠিল। তিনি ভাবিলেন, 'আমি এতই হীন যে, তোমার গাড়ু গাম্ছা বইবার অধিকারীও নই!' তাই রামকৃষ্ণদেব ঐ কথা বলিবামাত্র দেবেন্দ্রনাথ গাড়ুটি নামাইয়া অপরাধীর মত নিম্নদৃষ্টি হইয়া দাঁড়াইয়া রহিলেন। রামকৃষ্ণদেব আরও দূরে চলিয়া গেলেন।

পঞ্চবটী-মূলে ধ্যানমগ্ন।

"দেবেন্দ্রনাথের মনের ভাবসমূহ যেন মনের মধ্যে গুলাইয়া গেল; উনি কেন এমন কথা বলিলেন, কিছুই বুঝিতে পারিলেন না; পঞ্চবটী-মূলে

বসিয়া চিন্তামগ্ন হইলেন। চিন্তা ক্রমে ধ্যানে পরিণত হইয়া তাঁহাকে নিস্পন্দ করিল।" * * * —উদ্বোধন, ফাল্গুন, ১৩৩৩।

অস্তিত্বজ্ঞান-লোপ।

দেখিলেন, তাঁহার চক্ষুর সম্মুখ হইতে সমুদয় বৃক্ষলতা, বাটী, গঙ্গা প্রভৃতি একে একে অন্তর্হিত হইয়া এক অনির্ব্বচনীয় সুমহান্ অনন্তে মিশিয়া গেল। সঙ্গে সঙ্গে তাঁহার অস্তিত্ব-জ্ঞানও লোপ পাইল। তাহার পর কি হইল বা কি রহিল, তাহা প্রকাশ করিবার ক্ষমতা রহিল না। কতক্ষণ এই ভাবে কাটিয়াছিল, তাহা জানিতে পারেন নাই।

"সকাল-সন্ধ্যা হাততালি দিয়ে হরিনাম করলেই হবে"।

বাহ্যজ্ঞান ফিরিয়া আসিলে দেখিলেন, ঠাকুর প্রসন্নবদনে তাঁহার সম্মুখে দাঁড়াইয়া আছেন। পরে স্নিগ্ধ-মধুর বাক্যে বলিলেন,—"দেখ, তোমায় কিছু করতে হবেক্ নি, তুমি সকালবেলা আর সন্ধ্যে-বেলা হাততালি দিয়ে হরিনাম করো, তা হলেই হবেক্। হরিনাম চৈতন্যদেব প্রচার করেছিলেন, ইহা বড় সিদ্ধ নাম। আর এখানকে আনাগোনা করলে সব হয়ে যাবেক্।" ঠাকুরের প্রসন্ন বদন দেখিয়া ও আশ্বাসবাণী শুনিয়া দেবেন্দ্রনাথ বুঝিলেন, দয়াময় ঠাকুর তাঁর সকল ভার লইয়াছেন, আর তাঁর কোন ভয় বা ভাবনা নাই। দেবেন্দ্রনাথ বলিয়াছিলেন, ঠাকুরের কৃপায় সেই দিন তাঁহার প্রথম ব্রহ্ম-দর্শন হয়।

"* * * ইতঃপূর্ব্বে তিনি একদিন, দেবেন্দ্র দীক্ষা গ্রহণ করিয়াছেন কি-না জিজ্ঞাসা করিলে দেবেন্দ্র বলিয়াছিলেন, "না মোশাই, মন্তর নেওয়া হয় নি। তবে আমার বড়ই ইচ্ছা যে, আপনার কাছে মন্তর নি।" রামকৃষ্ণদেব তাহাতে অসম্মতি প্রকাশ করিয়াছিলেন। তাহাতে দেবেন্দ্র ভাবিয়াছিলেন যে, দীক্ষা দিতে পরমহংসদেব নারাজ, হয় তো

তিনি সে কৃপালাভে অনুপযুক্ত। এখন আবার গাড়ু লইয়া যাইবার কালে যাহা করিলেন, তাহাতে আপনাকে আরও হীন ভাবিতে লাগিলেন। আবার এখন যাহা কহিলেন, তাহাতে মনের কতকটা কষ্ট দূর হইয়া যেন একটু আশ্বস্ত হইলেন; কিন্তু ব্যাপারটা কি, "আমার সঙ্গে তোমার ওভাব লয়", এ কথার উদ্দেশ্যই বা কি, কিছুই খুঁজিয়া পাইলেন না। মনের মধ্যে আর কোন প্রকার তোলাপাড়া হইল না। "সকাল সন্ধ্যা হরি-নাম করিলেই হইবে"—এই কথায় তাঁহার ধৈর্য্য আসিল। সে দিন আর অধিক কোনও বিশেষ কথাবার্ত্তা হইল না, সন্ধ্যার প্রাক্কালেই রামকৃষ্ণদেবের নিকট বিদায় লইয়া আবাসে প্রত্যাগত হইলেন। তদবধি তিনি সকাল-সন্ধ্যা হাততালি দিয়া হরিনাম করেন আর রামকৃষ্ণদেবের সম্মুখীন হইয়া তাঁহার উপস্থিতিতে যে প্রকার শান্তি অনুভব করেন, তদ্রূপ আনন্দে তাঁহার দেহ-মন পরিপূর্ণ হইয়া যায়। দেবেন্দ্রনাথ রামকৃষ্ণদেবের আদর-যত্ন পাইয়া ঘন ঘন দক্ষিণেশ্বরে যাইতে আরম্ভ করিলেন। রামকৃষ্ণদেবের প্রতি তাঁহার ভালবাসা দিন দিন বাড়িতে লাগিল।

"আস্‌ছো-যাচ্‌ছো, তা কি বুঝলে?"

একদিন রামকৃষ্ণদেব তাঁহাকে বলিলেন, "হাঁগা, তুমি যে এখানকে আসছো-যাচ্‌ছো, তা কি বুঝলে? কি হোল?" দেবেন্দ্র একটু চিন্তা করিয়া কহিলেন, "তা মোশাই, এমন কিছু বিশেষ তো বুঝতে পারছি নি, তবে ধর্ম্মসম্বন্ধে কি ঈশ্বরসম্বন্ধে জানবার জন্যে আর অন্য কোথাও যেতে ইচ্ছে হয় না, আর মনটাও তেমন হাঁক্-পাক করে না।" রামকৃষ্ণদেব কহিলেন, "তুমি অনেক করেছ বটে, কিন্তু"—দুই হাতের অঙ্গুলিতে অঙ্গুলি বদ্ধ করিয়া দেবেন্দ্রকে

দেখাইয়া কহিলেন,—"কিন্তু খাপে খাপে লাগে নি। কি জান, যে ঘরের যে।" —উদ্বোধন, ফাল্গুন ১৩৩৩

হরিনাম জপ।

সরল-বিশ্বাসী দেবেন্দ্রনাথ গৃহে প্রত্যাবর্ত্তন করিয়া ঠাকুরের কথা-মত হরিনাম করিতে আরম্ভ করিলেন। এক নির্জ্জন গৃহে বসিয়া অনবরত জপ করিতে লাগিলেন। এই সময় ঠাকুর বাবুদিগের এষ্টেটের কর্ম্ম পরিত্যাগ করিয়াছিলেন। সুতরাং সময়ের কোন অভাব ছিল না। দিবা-রাত্র জপ করিতে লাগিলেন। তাঁহার ঘরে কাহারও প্রবেশের অধিকার ছিল না। আহারের সময় তাঁহার ঘরে আহার্য্য একবারমাত্র রাখিয়া আসা হইত।

ধ্যান-জপ অস্থিমজ্জাগত।

হরিনাম-জপ তাঁহার এমন অভ্যাস হইয়া গিয়াছিল যে, রাত্রিতে ঘুমাইয়া পড়িলেও মুখ হইতে 'হরি হরি' ধ্বনি বাহির হইত। ইহা দেখিয়া তাঁহার মাতুল হরিশ্চন্দ্র বলিয়াছিলেন, "তুমি কি রাত্রে ঘুমাও না? যখনই ঘুম ভাঙ্গে, তখনি শুনিতে পাই, তুমি 'হরি হরি' করিতেছ।" ধ্যান-জপ এই সময়ে তাঁহার অস্থিমজ্জাগত হইয়াছিল এবং অনেক আশ্চর্য্য দর্শনাদিও হইত।

ধ্যানাবস্থায় দর্শনাদি।

একদিন ধ্যানাবস্থায় দেখিলেন, কতকগুলি স্ত্রীলোক সাদা কাপড় পরিয়া তিলক কাটিয়া তাঁহার সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াইল এবং একে একে প্রণাম করিয়া চলিয়া গেল। এই অদ্ভুত-দর্শনের মর্ম্ম বুঝিতে না পারিয়া দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরকে এই বিষয় জানাইলেন।

ঠাকুর বলিলেন,—"উহারা অবিদ্যার সহচরী, তোমাকে প্রণাম করিয়া প্রস্থান করিয়াছে, এখন হইতে তোমার অবিদ্যা-ধ্বংস হইল।"

দেহ হইতে পৃথক্।

আর একদিন দেখেন, তাঁহার দেহ পতিত রহিয়াছে, তিনি দেহ হইতে পৃথক্ হইয়া, পা হইতে মস্তকের কেশ পর্য্যন্ত সমস্ত নিরীক্ষণ করিতেছেন। কিয়ৎক্ষণ এইরূপে দেখিতে দেখিতে তাঁহার মনে হইল—দেহত্যাগ ঘটিয়াছে। দেহত্যাগের কথা মনে উদয় হওয়াতে অত্যন্ত দুঃখ হইল এবং সঙ্গে সঙ্গে শরীর কাঁপিয়া উঠিল। তৎপরে তিনি পূর্ব্বাবস্থা প্রাপ্ত হইলেন।

নিজের এই অবস্থা বর্ণনা করিতে করিতে তিনি বলিতেন,—"তখনও আমার বাসনা ক্ষয় হয় নাই। তাই পুনঃ দেহে প্রবেশ করিতে হইয়াছিল।"

জপ করিতে করিতে উন্মাদের মত।

জপ করিতে করিতে পুলকাদি সাত্ত্বিক দেহ-বিকার তাঁহার প্রকাশ পাইত। কথিত আছে, এই সময়ে তিনি একরূপ উন্মাদের মত হইয়া গিয়াছিলেন। বিষয়ীর সংস্পর্শ আদৌ সহ্য করিতে পারিতেন না, আত্মীয়-স্বজনকে কালসর্পবৎ মনে হইত এবং সংসার তাঁহার নিকট অন্ধকূপ বলিয়া প্রতীয়মান হইত। একমাত্র শ্রীশ্রীঠাকুরের ভক্তগণের সঙ্গ তাঁহার প্রাণে শান্তি আনিয়া দিত। কোন গুরু-ভ্রাতা তাঁহাকে দেখিতে আসিলে তিনি আনন্দে অধীর হইয়া পড়িতেন। এবং তাঁহাদের সহিত কেবল ঠাকুরের কথা কহিতেন। পাছে তিনি সত্বর চলিয়া যান, এই ভয়ে দেবেন্দ্রনাথ তাঁহার কাপড় ধরিয়া থাকিতেন। চলিয়া গেলে অস্থির হইয়া ক্রন্দন করিতেন।

"মা, ওকে অত দিস্ না।"

ঠাকুর এক দিন দেবেন্দ্র সম্বন্ধে জগন্মাতাকে সম্বোধন করিয়া বলিয়াছিলেন,—"মা, ওকে এত দিস্ না। আহা, ও ছা'পোষা লোক, ওর মুখ চাহিয়া অনেকগুলি রহিয়াছে।" ইহার পর হইতে দেবেন্দ্রনাথ ক্রমশঃ প্রকৃতিস্থ হইতে লাগিলেন এবং অনেক দিনের পর ঠাকুরের নিকট গমন করিলেন। ঠাকুর অস্পষ্ট ভাষায় কি বলিতে বলিতে তাঁহার বক্ষঃস্থল স্পর্শ করিয়াছিলেন; তাহার পর হইতে দেবেন্দ্রনাথের মন বাহ্-জগতে ফিরিয়া আসিল এবং তিনি সংসারে কার্য্য করিতে সমর্থ হইলেন।

সংসার বাসনা প্রবল—জমীদারী সেরাস্তার কার্য্য গ্রহণ।

এই সময়ের কথা স্মরণ করিয়া দেবেন্দ্রনাথ বলিতেন,—"আহা, অনেক সাধ্য-সাধনা করিয়া লোকে যে অবস্থা পায় না, ঠাকুরের কৃপায় অতি অল্পসময়ের মধ্যে আমি সেই অবস্থা লাভ করিয়াছিলাম। কিন্তু সংসার-বাসনা এত প্রবল যে, সাধ্য-সাধনা করিয়া আমার সেই অবস্থা হইতে নামিয়া আসিতে হইল।"

প্রকৃতিস্থ দেবেন্দ্রনাথের মনে সংসার-কর্ত্তব্যের ভাবনা আবার উদয় হইল। তিনি কর্ম্মের সন্ধান করিতে লাগিলেন এবং অবিলম্বে যজ্ঞেশ্বর বাবুর জমিদারী সেরেস্তায় একটী কার্য্য পাইলেন।

দশম পরিচ্ছেদ

গুরু-ভ্রাতৃগণের সহিত মধুর মিলন।

(বাংলা ১২৯২—ইং ১৮৮৫)

দক্ষিণেশ্বরে যাতায়াত করিতে করিতে দেবেন্দ্রনাথের সহিত তাঁহার গুরু-ভ্রাতৃগণের ক্রমশঃ আলাপ হইতে লাগিল। ঠাকুরও তাঁহার ভক্তগণের মধ্যে পরস্পরের সহিত পরিচয় করাইয়া দিতেন। ১৮৮৪ খৃষ্টাব্দে দেবেন্দ্রনাথ শ্রীশ্রীঠাকুরকে প্রথম দর্শন করেন। তৎপূর্ব্বে স্বামী বিবেকানন্দ, স্বামী ব্রহ্মানন্দ, স্বামী প্রেমানন্দ প্রভৃতি কুমার ভক্তগণ এবং মহাত্মা রামচন্দ্র ও শ্রীযুত মহেন্দ্রনাথ গুপ্ত মহাশয় প্রভৃতি গৃহী ভক্তগণ ঠাকুরের নিকট আগমন করিয়াছিলেন।

পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে যে, স্বামীজি, রাখাল মহারাজ ও রামবাবু প্রভৃতির সহিত দেবেন্দ্রনাথের পূর্ব্ব-পরিচয় ছিল। ঠাকুরের নিকট আসিয়া তাঁহাদের পুনর্মিলন আরও মধুর হইল।

অভেদানন্দজির সহিত সাক্ষাৎ।

স্বামী অভেদানন্দজির বাটীর সন্নিকটে দেবেন্দ্রনাথ বাস করিতেন। স্বামী অভেদানন্দজির সঙ্গে প্রথম-মিলন-দিনে ঠাকুর বলিয়াছিলেন,—"তোমাদের পাড়ায় দেবেন্দ্র থাকে, তাঁর সঙ্গে আলাপ করো, সে বড় প্রেমিক ভক্ত লোক। দেবেন্ কেমন শ্রীকৃষ্ণের গান বেঁধেছে শুনো"।

স্বামী অভেদানন্দজির মুখে আমরা শুনিয়াছি, তিনি ঠাকুরের কথায় সেই দিন রাত্রে দেবেন্দ্রনাথের সহিত সাক্ষাৎ করেন এবং

দেবেন্দ্রনাথের স্বহস্তে অঙ্কিত একখানা কৃষ্ণ-মূর্ত্তি দর্শন করেন। তৎপরে তাঁহার রচিত শ্রীকৃষ্ণরূপ বর্ণনার—

"শ্যামল সুন্দর রূপ মনোহর, কে তুমি হৃদয়-মাঝে।"*

গানটী শ্রবণ করেন। শ্রীশ্রীঠাকুর ইহা নিজে গান করিতে করিতে ভাবস্থ হইয়াছিলেন। আপন ভ্রাতুষ্পুত্রী শ্রীশ্রীলক্ষ্মীনাকে তাহা শিখিতে বলিয়াছিলেন। আমরা সম্পূর্ণ গানটা তাঁহারই নিকট হইতে সংগ্রহ করিয়াছি।

ঠাকুরের নিকট যাইতে গিরিশচন্দ্রকে অনুরোধ।

দেবেন্দ্রনাথের ইচ্ছা, তাঁহার পরিচিত ব্যক্তি সকলেই ঠাকুরের কৃপা লাভ করেন। মহাত্মা রামচন্দ্রের সিমলা, মধু রায়ের গলির বাটীতে উৎসব-সময়ে গিরিশচন্দ্র ঠাকুরকে দর্শন করিতে আসেন। উৎসবান্তে প্রত্যাবর্ত্তনকালে দেবেন্দ্রনাথ গিরিশচন্দ্রের সঙ্গে গমন করেন এবং তাঁহাকে দক্ষিণেশ্বরে ঠাকুরের নিকট যাইবার জন্য বিশেষ করিয়া অনুরোধ করেন।

"ভাব হয় ত দেখি।"

একদিন দেবেন্দ্রনাথ অন্যান্য ভক্তগণসহ ঠাকুরের শ্রীমুখ-নিঃসৃত মধুর বাণী শ্রবণ করিতেছেন, এমন সময়ে ঠাকুর ভক্তগণের প্রতি সস্নেহে দৃষ্টিপাত করিয়া বলিলেন, "তোমাদের কাহারও কাহারও ভাব হয় ত আমি দেখি।" ঠাকুরের এই কথার তিন চারি দিন পরে দেবেন্দ্রনাথ, লাটু মহারাজ (স্বামী অদ্ভুতানন্দ) প্রভৃতি ভক্তগণের ঘন ঘন ভাব হইতে লাগিল; বিশেষতঃ শ্রীকৃষ্ণ-সম্বন্ধীয় কথা বা গান হইলে, কিংবা বৃন্দাবনলীলা শ্রবণ করিলে দেবেন্দ্রনাথ আত্মসংবরণ করিতে পারিতেন না।

---

* দেবগীতি ৭- পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য।

যুবকের সংসার-ত্যাগ।

ঠাকুর বাবুদিগের এষ্টেটে কর্ম্ম করিবার কালে তদ্বংশীয় একটী যুবক ভক্তের সহিত দেবেন্দ্রনাথের শ্রীরামকৃষ্ণপ্রসঙ্গে অনেক কথা-বার্ত্তা চলিত। একদিন উক্ত যুবকটীকে লইয়া দেবেন্দ্রনাথ শ্রীরামকৃষ্ণ-দেবের নিকট দক্ষিণেশ্বরে গমন করেন। সেখানে যাইয়া ভগবদ্‌বিষয়ক মধুর সঙ্গীত শ্রবণ করিতে করিতে দেবেন্দ্রনাথ ভাবস্থ হইয়া পড়েন। তাঁহার এই ভাবাবিষ্ট অবস্থা দেখিয়া যুবক বিস্ময়ান্বিত হইলেন এবং বাটী আসিয়া সকলকে 'মুন্সী মহাশয়ের' * এই ভাবাবেশের কথা বলিতে লাগিলেন। শ্রীরামকৃষ্ণদেবকে দর্শন করিয়া ও তাঁহার বৈরাগ্যপূর্ণ কথা শ্রবণ করিয়া এই যুবকের বৈরাগ্য উদয় হইল এবং একদিন সকলের অজ্ঞাতসারে সংসার ত্যাগ করিয়া চিরকালের মত নিরুদ্দেশ হইলেন।

অক্ষয় মাষ্টার।

এই সময়ে "শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ-পুঁথি"-প্রণেতা শ্রীযুক্ত অক্ষয়কুমার সেন মহাশয়, যে ঠাকুর বাবুদিগের বাড়ীতে দেবেন্দ্রনাথ কার্য্য করিতেন সেখানে গৃহশিক্ষক নিযুক্ত হন এবং ঐ বাড়ীর একটী গৃহে বাস করিতেন। দেবেন্দ্রনাথও তখন ঐ বাটীর অপর একটী গৃহে থাকিয়া রাত্রে সাধন-ভজন করিতেন। বাল্যকাল হইতে অক্ষয় মাষ্টার মহাশয়ের শ্রীকৃষ্ণে সখ্য-ভাব ছিল; নিজেকে কৃষ্ণের সহচর জ্ঞান করিতেন। কৃষ্ণদর্শন-লালসায় কুল-গুরুর নিকট কৃষ্ণমন্ত্রে দীক্ষিত হইয়া গঙ্গাতীরে বহু দিন জপ-তপ

---

* দেবেন্দ্রনাথকে তাঁহারা 'মুন্সী মহাশয়' বলিয়া ডাকিতেন।

করেন। যখন দেখিলেন, কৃষ্ণদর্শন ভাগ্যে ঘটিল না, তখন তিনি একদিন পূর্ব্বোক্ত ঠাকুরবংশীয় যুবক-ভক্তটার সহিত দেবেন্দ্রনাথকে পরমহংসদেব সম্বন্ধে নানারূপ আলোচনা করিতে শুনিয়া, মনে মনে ভাবিলেন, 'যদি দেবেনবাবু দয়া করিয়া আমাকে পরমহংস-দেবের নিকট লইয়া যান, তাহা হইলে বোধ হয়, আমার মনোবাসনা পূর্ণ হইতে পারে।' এইরূপ নাম করিয়া, অক্ষয় মাষ্টার তখন কিছু বলিলেন না; দেবেন্দ্রনাথকে সন্তুষ্ট করিবার জন্য তাঁহার অজ্ঞাতে তামাক সাজিয়া, টীকাটী ভাল করিয়া ধরাইয়া দিয়া, দেবেন্দ্রনাথের শয্যা হইতে উঠিবার পূর্ব্বে নিত্য যথাস্থানে রাখিয়া আসিতে লাগিলেন।

অক্ষয় মাষ্টার সহ ঠাকুরের নিকট গমন।

প্রত্যহ প্রত্যূষে অযাচিত সুগন্ধী-তামাক-সজ্জিত কলিকা দেখিয়া এবং ব্যাপারটীর রহস্যোদ্ঘাটন করিতে না পারিয়া দেবেন্দ্রনাথ একদিন ভোর হইবার পূর্ব্বে জাগিয়া থাকিয়া অক্ষয় মাষ্টারের কার্য্য দেখিতে পান। কারণ জিজ্ঞাসা করায়, অক্ষয় মাষ্টার তাঁহাকে পরমহংসদেবের নিকট লইয়া যাইবার জন্য কাতর প্রার্থনা জানান। দেবেন্দ্রনাথ স্বীকৃত হইয়া একদিন ঠাকুরের নিকট তাঁহাকে লইয়া গেলেন। প্রথম দর্শনে ঠাকুর অক্ষয় মাষ্টারকে কোন প্রশ্নই করিলেন না। ইহার পর তিনি কখনও একাকী, কখনও বা দেবেন্দ্রনাথের সহিত ঠাকুরের নিকট যাতায়াত আরম্ভ করিলেন। কিন্তু ঠাকুরকে নিজে মুখ ফুটিয়া কোন দিন কোন কথা বলিতে সাহস করিতেন না।

অক্ষয় মাষ্টারের কৃপা-লাভ।

এইরূপে কিছু দিন যাতায়াতের পরও যখন দেখিলেন, ঠাকুর তাঁহাকে কোন কথা বলেন না, তখন অক্ষয় মাষ্টার উদ্বিগ্ন হইয়া, ঠাকুর

যাহাতে তাঁহাকে কৃপা করেন, সেইরূপ অনুরোধ করিতে দেবেন্দ্রনাথকে ধরিয়া বসিলেন। দেবেন্দ্রনাথ অক্ষয় মাষ্টার মহাশয়ের কথা শ্রীশ্রীঠাকুরের নিকট নিবেদন করাতে ঠাকুর বলিলেন,—"আমি আর কি বলিব, তুমি যাহা হয়, বলিয়া দিও।" ঠাকুরের বাক্যে অক্ষয় মাষ্টার দেবেন্দ্রনাথকে কিছুতেই ছাড়েন না দেখিয়া, দেবেন্দ্রনাথ তাঁহাকে 'হরিনাম' করিতে বলেন। দেবেন্দ্রনাথের কথামত অক্ষয় মাষ্টার মহাশয় ঐকান্তিক আগ্রহের সহিত ব্যাকুলভাবে হরিনাম করিতে আরম্ভ করেন এবং পরে ঠাকুরের কৃপা-লাভে ধন্য হন।

অক্ষয় মাষ্টারের পুঁথি লেখা।

উত্তরকালে দেবেন্দ্রনাথের "আজ্ঞায়" অক্ষয় মাষ্টার "শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ-পুঁথি" লিখিতে আরম্ভ করেন এবং যখন যতটুকু লিখিতেন, প্রত্যহ দেবেন্দ্রনাথের নিকট আসিয়া তাঁহাকে শুনাইতেন এবং সংশোধন করিবার প্রয়োজন হইলে করিয়া লইতেন। "শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ-পুঁথিতে" অক্ষয় মাষ্টার মহাশয় দেবেন্দ্রনাথ সম্বন্ধে যাহা লিপিবদ্ধ করিয়া গিয়াছেন, আমরা নিম্নে তাহার কিয়দংশমাত্র এই, প্রসঙ্গে উদ্ধৃত করিলাম।

"প্রথমতঃ গুরুরূপে দেবেন্দ্র ব্রাহ্মণ।
যাঁহার কৃপায় হইল প্রভু-দরশন॥
লীলা-গীতি গ্রন্থারম্ভ তাঁহার আজ্ঞায়।
কিঙ্কর জন্মের মত বিকে তাঁর পায়॥"

*　　*　　*

"প্রভু-পদে অনুরক্ত, দেবেন্দ্র-ব্রাহ্মণ-ভক্ত,
অন্তরঙ্গ প্রভুর আমার।
সখী-ভাব বলবতী, শ্রীকৃষ্ণে বুঝেন পতি,
ভারতী শুনহ চমৎকার॥

*　　　　*　　　　*

স্বভাব সংরক্ষা করা,　　　প্রভুর প্রকৃতি-ধারা,
আগা-গোড়া প্রত্যক্ষ লীলায়।
তাই, দেবেন্দ্রসনে,　　　সঙ্কেত নয়ন-কোণে,
রসভাব কথায় কথায় ॥"

*　　　　*　　　　*

"রহস্য কি বুঝা যায়,　　　ব্রজগোপী নর কায়,
লয়ে শিরে ভাবের পশরা।
অবতীর্ণ প্রভু সনে,　　　লীলাঙ্গনে ধরাধামে,
কৃষ্ণ-প্রেমে চিত্ত মাতোয়ারা ॥
অধমে সদয় হয়ে,　　　চরণে আশ্রয় দিয়ে,
লইয়া গেলেন যেই জন।
যেইখানে গুণমণি,　　　অনন্ত অখিল-স্বামী,
এই সেই দেবেন্দ্র-ব্রাহ্মণ ॥
করুণা করিয়া যার,　　　হইবেন কর্ণধার,
ধ্রুব তার কৃষ্ণ-দরশন ॥"

*　　　　*　　　　*

অনেককে ঠাকুরের নিকট লইয়া যাইতেন।

পরের দুঃখ দেখিলে দেবেন্দ্রনাথের প্রাণ কাঁদিয়া উঠি... সংসারসন্তপ্ত ব্যক্তিগণের দুঃখ লাঘব করিবার নিমিত্ত তিনি ব্যস্ত হইতেন। নিজের পূর্ব্বাবস্থা স্মরণ করিয়া তিনি শ্রীশ্রীঠাকুরের দর্শন-পিপাসু পরিচিত অপরিচিত সকলকেই ঠাকুরের নিকট লইয়া যাইতে এবং প্রয়োজন হইলে কাহারও কাহারও নিমিত্ত ঠাকুরের

কৃপালাভের জন্য তাঁহাকে বিশেষভাবে অনুরোধ করিতেও কখন পশ্চাৎপদ হইতেন না।

মাতুল হরিশ মুস্তফীর কৃপালাভ।

তাঁহার মাতুল হরিশ্চন্দ্র মুস্তফী মহাশয় পূর্ব্বে ব্রহ্মানন্দ কেশবচন্দ্রের সমাজে বহুকাল গমনাগমন করিয়াও কোনরূপ শান্তিলাভ করিতে না পারায়, তিনি তাঁহাকে শ্রীশ্রীঠাকুরের নিকট লইয়া যান। ঠাকুরও তাঁহাকে কৃপা করেন।

বিহারী ব্রাহ্মণের কৃপালাভ।

এই সময়ে বীরভূম জেলাস্থিত "বাহিরী" গ্রাম-নিবাসী বিহারী নামক এক দরিদ্র ব্রাহ্মণযুবক কর্ম্মের সন্ধানে কলিকাতায় আসিয়া বড় বিপন্ন হন। ঘটনাক্রমে দেবেন্দ্রনাথের সহিত তাঁহার সাক্ষাৎ হয়। বিহারী-প্রমুখাৎ তাঁহার সমস্ত অবস্থা অবগত হইয়া দেবেন্দ্রনাথ সযত্নে নিজ পরিবারের লোক জ্ঞানে তাঁহাকে বাটীতে রাখিয়া একটী কর্ম্মের সন্ধান করিয়া দেন এবং কিছু কাল পরে তাঁহাকে দক্ষিণেশ্বরে শ্রীশ্রীঠাকুরের নিকট লইয়া যান। দেবেন্দ্রনাথ তাঁহাকে কৃপা করিতে অনুরোধ করিলে ঠাকুর তাঁহাকে কৃপা করেন। 'প্রভু'কে তাঁহার অনুরোধ রক্ষা করিতে দেখিয়া অক্ষয় মাষ্টার মহাশয় তাঁহার পুঁথিতে লিখিয়াছেন—

"স্বচক্ষে লীলার হাটে কৈনু দরশন।
প্রভু রাজী তথা যথা দেবেন্দ্র ব্রাহ্মণ॥"

একাদশ পরিচ্ছেদ

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণদেবের কামিনী-কাঞ্চন ত্যাগে দেবেন্দ্রনাথের সন্দেহ ও পরীক্ষা।

ঠাকুর সিদ্ধাই পছন্দ করিতেন না।

অষ্টসিদ্ধির উপর ঠাকুরের বড় ঘৃণা ছিল। সর্ব্বশক্তিমান্ হইয়া তিনি একেবারে ঐশ্বর্য্যের নাম-গন্ধও রাখেন নাই। অলৌকিক কার্য্য-কলাপ বা যোগৈশ্বর্য্য দেখাইয়া লোককে চমৎকৃত করা, তিনি মোটেই পছন্দ করিতেন না। তথাপি ভক্তগণের মঙ্গলের জন্য, তাঁহাদের আধ্যাত্মিক উন্নতির জন্য এবং তাঁহাদের সন্দেহ দূরীকরণার্থ মধ্যে মধ্যে তাঁহাকে শক্তির খেলাও দেখাইতে হইত।

ঠাকুরের কার্য্যকলাপ কি প্রকৃত ?

ভক্তগণ দেখিয়াছেন, ইচ্ছাময় ঠাকুর কেবল দর্শন-স্পর্শনে লোকের আধ্যাত্মিক উন্নতি করিয়া দিয়াছেন। তাঁহারা কত শতবার দেখিয়াছেন, ইচ্ছাময় ঠাকুর যাহা ইচ্ছা করেন, তাহাই হয়। তাঁহারা তাঁহার অলৌকিক ত্যাগ, বৈরাগ্য, অমানুষিক আচরণ সর্ব্বদা দেখিতেন বটে, কিন্তু দেখিয়াও মনের ধর্ম্ম যে সংশয়, তাহার হাত এড়াইতে পারিতেন না। সেই জন্য সময় সময় তাঁহাদের মনে প্রশ্ন উঠিত,—'ঠাকুরের সমস্ত কার্য্যকলাপ কি প্রকৃত ?'

ইহারই ফলে ভক্তগণ কখন ঠাকুরকে ভগবান্ জ্ঞান করিতেন, আবার কখনও বা সাধারণ মানব বলিয়া সন্দেহ করিতেন এবং তাঁহাকে পরীক্ষা করিয়া দেখিতেন। দেবেন্দ্রনাথের মনেও এরূপ

সন্দেহ মধ্যে মধ্যে আসিয়া উদয় হইত। তাঁহার কথিত ঠাকুরকে পরীক্ষা করার দুইটী ঘটনা এখানে আমারা উল্লেখ করিতেছি।

অনেকবার দেবেন্দ্রনাথ দেখিয়াছেন, ঠাকুর টাকা স্পর্শ করিতে পারেন নাই। আরও তাঁহার শোনা ছিল, ধাতুদ্রব্য-স্পর্শে তাঁহার অঙ্গপ্রত্যঙ্গ বিকৃত ভাবাপন্ন হইত এবং দেহের যন্ত্রণা হইত। তথাপি এ বিষয়ে ঠাকুরকে পরীক্ষা করিয়া দেখিতে দেবেন্দ্রনাথের আবার ইচ্ছা হইল, এবং সুযোগও মিলিল।

দেবেন্দ্রনাথ তোষকের তলায় দু'আনি রাখিয়া দেন।

একদিন তিনি দক্ষিণেশ্বরে ঠাকুরের ঘরে উপস্থিত হইয়া দেখিলেন, ঘরে কেহই নাই; অমনি তিনি চুপে চুপে একটী রূপার দু'আনি, ঠাকুরের বসিবার ছোট খাটের তোষকের কোণ তুলিয়া, তাহার তলায় রাখিয়া দিলেন। ঠাকুর ৺কালীমন্দিরে গিয়াছিলেন, একটু পরেই তথা হইতে ঘরে আসিয়া ছোট খাটটীর উপর বসিতে গেলেন, পারিলেন না। বারত্রয় এরূপ চেষ্টা করিয়াও যখন কিছুতেই শয্যা স্পর্শ করিতে পারিলেন না, তখন নীচে মাদুরে উপবিষ্ট দেবেন্দ্রনাথের দিকে চাহিয়া বলিলেন,—"হ্যাঁগা, এমন হচ্ছে কেন? আমি বিছানা ছুঁতে পার্‌ছি না কেন?"

"কি আমায় বিড়ে দেখছ?"

ঠাকুরের ভাব দেখিয়া দেবেন্দ্রনাথ লজ্জায় ম্রিয়মাণ হইয়া শয্যাতল হইতে দু'আনিটী বাহির করিয়া লইলেন। ঠাকুর হাসিতে হাসিতে শয্যায় উপবেশন করিয়া দেবেন্দ্রনাথকে বলিলেন,—"কি, আমায় বিড়ে দেখ্‌ছ নাকি? তা বেশ, বেশ।" দেবেন্দ্রনাথ অধোবদনে চুপ করিয়া রহিলেন। ঠাকুর ভক্তগণের সন্দেহ অপনোদনের জন্য অম্লানবদনে সকল প্রকার পরীক্ষা দিতে সর্ব্বদাই প্রস্তুত ছিলেন।

একজন স্ত্রীলোকের প্রতি আন্তরিক টান।

"একদিন দক্ষিণেশ্বরে যাইয়া নানা কথাবার্ত্তার পর রামকৃষ্ণদেব হঠাৎ একটু বিমর্ষ ভাবাপন্ন হইয়া দেবেন্দ্রনাথকে বলিলেন, "অমুকের জন্যে মনটা কেমন করছে। তাকে অনেক দিন দেখি নি।" রামকৃষ্ণদেব যাঁহার নাম করিলেন, তিনি একজন স্ত্রীলোক। রামকৃষ্ণের একজন স্ত্রীলোকের প্রতি এত আন্তরিক টান দেখিয়া তাঁহার মনে নানা প্রকার সন্দেহের উদয় হইল।

রামকৃষ্ণদেব দেবেন্দ্রনাথকে রসগোল্লা খাওয়াইলেন।

এই ঘটনার দুই চারিদিন পরে মজুমদার মহাশয় দক্ষিণেশ্বরে একলা বসিয়া রামকৃষ্ণদেবের সহিত কথাবার্ত্তা কহিতেছেন, এমন সময় একটু ক্ষুধা বোধ হওয়ায় রামকৃষ্ণদেব রামলালকে কিছু খাবার আনিতে বলিলেন। রামলাল একজন ভক্ত প্রেরিত কতকগুলি রসগোল্লা আনিলেন। রামকৃষ্ণদেব তাহা হইতে আপনি একটি খাইয়া, একটি রসগোল্লা মজুমদার মহাশয়ের হাতে দিয়া খাইতে অনুরোধ করিলেন। সেটি খাওয়া হইলে আর একটি, তার পর আর একটি; এইরূপে অনেকগুলি রসগোল্লা খাওয়াইলেন। তার পর বলিলেন, "এ কে দিয়েছে জান?—অমুক দিয়েছে, সে (নিজ বক্ষে অঙ্গুলি নির্দ্দেশ করিয়া) এখানকে বড় ভালবাসে।"

মজুমদার মহাশয়ের সন্দেহ আরও বাড়িয়া গেল। খাইতে খাইতে এই কথা শুনিয়া আর যেন তাঁহার হাত মুখে উঠিল না। রামকৃষ্ণদেব আবার কহিলেন, "সে বেশ লোক; খাও না—খাও, আরও গোটা কতক খাও"—এই বলিয়া আরও কয়েকটি রসগোল্লা খাওয়াইলেন।

দেবেন্দ্রনাথের সন্দেহ ও প্রাণের টান।

দেবেন্দ্রনাথের মনে সন্দেহ হইল বটে, কিন্তু রামকৃষ্ণের প্রতি প্রাণের টান কমিল না, বরং যেমন মাঝিরা কাদায় লগিটা পুঁতিবার জন্য নাড়া দেয় এবং নাড়া দিতে দিতে তাহা এমন দৃঢ় হইয়া বসিয়া যায় যে আর নাড়া যায় না, তেমনি তাঁহার মনের টান সন্দেহরূপ নাড়ায় আরও দৃঢ় হইয়া উঠিল। এইরূপে যত্ন পূর্ব্বক রামকৃষ্ণদেব তাঁহাকে অনেকগুলি রসগোল্লা খাওয়াইয়া, ইতস্ততঃ পায়চারী করিতে লাগিলেন। আবার একটু পরে দেবেন্দ্রের নিকট আসিয়া চুপি চুপি বলিলেন, "হাঁগা, তুমি আমাকে একটি টাকা দিবে? গাড়ী না হলে যেতেও পারি না, আবার গাড়ী করে গেলে তার ছেলে গাড়ী ভাড়া দিতে মনে বড় কষ্ট করে। তাই তোমার কাছকে চাইছি। দিবে?"

দেবেন্দ্রের সন্দেহ আরও বদ্ধমূল হইতে লাগিল, কিন্তু কহিলেন, "তা দেব, তার আর কি।"

রামকৃষ্ণদেব একটু হাসিয়া বলিলেন, "না তা লয়, বল যে আবার লিবে? আবার লিবে তো?"

দেবেন্দ্র হাসিয়া উত্তর করিলেন, "তা বেশ মোশাই দেবেন, নেব।" দেবেন্দ্রনাথের সঙ্গে টাকা ছিল, তিনি তখনই তাহা বাহির করিলেন; রামকৃষ্ণদেব রামলালকে টাকাটি লইতে বলিলেন ও কলিকাতায় যাইবার জন্য গাড়ী আনাইতে আজ্ঞা দিলেন।

ব্যাপারটা কি জানিতে হইবে।

শ্রীরামকৃষ্ণদেব অদ্যই সেই লোককে দেখিতে যাইবেন। দেবেন্দ্রনাথকে বলিলেন, "তুমিও যাবে?"

দেবেন্দ্রনাথের সুবিধা হইল, ব্যাপারটা কি জানিতে হইবে, তাই বলিলেন, "আজ্ঞে হাঁ, যাব।" সেদিন মহেন্দ্রনাথও রামকৃষ্ণদেবের নিকট আসিয়াছেন। তাঁহাকে, দেবেন্দ্রনাথকে ও লাটুকে সঙ্গে লইয়া রামকৃষ্ণদেব কলিকাতায় চলিলেন। পথে যাইতে যাইতে করযোড়ে প্রত্যেক দেবালয়ের প্রতি প্রণাম করিতেছেন; বারাণ্ডায় বেশ্যাগণকে দেখিয়া, "মা আনন্দময়ী" বলিয়া প্রণাম করিতেছেন; মসজিদ্ দেখিয়া প্রণাম করিতেছেন; আবার মদের দোকান দেখিয়া, "মা আনন্দময়ী এখানেও কত লোককে আনন্দ দিচ্ছেন"—বলিয়া প্রণাম করিতেছেন। কখনো গুন্ গুন্ করিয়া গান করিতেছেন, আবার কখনও বা স্পন্দহীন স্থির হইয়া থাকিতেছেন।

ইতিমধ্যে দেবেন্দ্রনাথের মনে মহাসমস্যার উদয় হইতেছে—এমন পবিত্র ব্যাপারের মধ্যে এমন কুপ্রবৃত্তি কি সম্ভবে; কেমন করিয়া তাহা হইতে পারে? তিনি কামিনী-কাঞ্চন-ত্যাগী সাধু; আবার মনে হইতে লাগিল, মধুর ভাবের সাধকও তো অনেক আছে, কিন্তু তাহাও তো এপ্রকার ত্যাগী সাধকের পক্ষে সম্ভব নয়। যাহা হউক, দেখাই যাইবে একটু পরে।

'কারুর ভাব নষ্ট করিনি'।

এমন সময় রামকৃষ্ণদেব দেবেন্দ্রের হাঁটুতে ধীরে ধীরে চাপড় মারিয়া তাঁহার দৃষ্টি আকর্ষণপূর্ব্বক কহিলেন, "(আমি) কারুর ভাব নষ্ট করি নি, কারুর ভাব নষ্ট করি নি।" দেবেন্দ্রনাথ এই কথার কোনও মর্ম্ম বুঝিতে পারিলেন না। কিছু জিজ্ঞাসাও করিলেন না।

ক্রমে গাড়ী যাইয়া নির্দ্দিষ্ট স্থানে পঁহুছিল। সকলে নামিয়া বাটীর দ্বিতলে বৈঠকখানায় যাইয়া বসিলেন, রামকৃষ্ণদেব সটান অন্দর মহলে

প্রবেশ করিলেন। বাড়ীর কর্ত্তা—পূর্ব্বোক্ত মহিলার আয়ত কলেবর পুত্র সেইখানে শুইয়া নিদ্রা যাইতেছিলেন, আর তাঁহার নাশাশব্দে যেন মেঘগর্জ্জন হইতেছিল। নিদ্রিত ব্যক্তির কণ্ঠে লম্বমান চেনহার, নিকটেই থাকে থাকে সাজান কতকগুলি রৌপ্য মুদ্রা।

দেবেন্দ্রনাথের সন্দেহ দ্রুত বাড়িতেছে—মাষ্টার মহাশয়ের গান খাপে খাপে লাগিল।

মাষ্টার মহাশয় দেবেন্দ্রনাথের সহিত কত কথাবার্ত্তা কহিবার প্রয়াস করিলেন, কিন্তু দেবেন্দ্রনাথের মনে যে সন্দেহ-বৃক্ষ দ্রুতবেগে ফুলে ফলে বাড়িতেছিল, তজ্জন্য তিনি এতই অন্যমনস্ক যে, মাষ্টার মহাশয় তাঁহার সহিত কথোপকথনের প্রয়াস ত্যাগ করিয়া গুন্ গুন্ স্বরে আপনা আপনি গান ধরিলেন—

গান

ভাব বুঝতে নারলুম রে,
আমার গোরার সঙ্গী হয়েও
(ভাব বুঝতে নারলুম রে)
গোরা বন দেখে বৃন্দাবন ভাবে
(ভাব বুঝতে নারলুম রে)
গোরা কার ভাবেতে মাতোয়ারা
(ভাব বুঝতে নারলুম রে)
ইত্যাদি।

গানটি দেবেন্দ্রনাথের প্রাণে খাপে খাপে লাগিতে লাগিল। তিনি যেমন রামকৃষ্ণদেবকে দেখিয়া শুনিয়াও বুঝিতে পারিতেছেন না, মাষ্টার মহাশয় যেন তাঁহারই মনের চিত্র আঁকিয়া গান করিতেছেন। আর সেই জন্যই গানটি তাঁহার মনের সহিত খাপে খাপে মিলিয়া প্রাণে গাঁথিয়া

যাইতে লাগিল। মাষ্টার মহাশয়ের মধুর কণ্ঠের গান দেবেন্দ্রনাথের যথার্থই মধুর লাগিতে লাগিল।

কিছুক্ষণ পরে গৃহস্বামীর নিদ্রাভঙ্গ হইলে তিনটি আগন্তুকের প্রতি তাঁহার দৃষ্টি পড়িল; অমনি তিনি টাকাগুলি আছে কি না দেখিলেন ও সযত্নে সেগুলি গুণিয়া হস্তগত করিলেন। তৎপরে আগন্তুকদের প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া লাটু এবং মাষ্টার মহাশয়কে চিনিলেন, কারণ ইঁহারা রামকৃষ্ণদেবের সঙ্গে তথায় অনেকবার আসিয়াছিলেন। তারপর গৃহস্বামী মাষ্টার মহাশয়কে প্রশ্ন করিলেন, "পরমহংসদেব এসেছেন না কি?"

মাষ্টার মহাশয় উত্তর দিলেন, "আজ্ঞে হাঁ।"

গৃহস্বামী আবার জিজ্ঞাসা করিলেন, "তিনি কোথায়?"

মাষ্টার মহাশয় বলিলেন, "তিনি বাড়ীর ভিতরে গেছেন।"

তারপর গৃহস্বামী শয্যা হইতে প্রকাণ্ড স্থূল কলেবর একটু পরিশ্রম সহকারে তুলিয়া গজেন্দ্রগমনে,—পার্শ্ববর্ত্তী কক্ষে জনকয়েক লোক বৈষয়িক কার্য্যোপলক্ষে উপস্থিত ছিলেন,—টাকাগুলি লইয়া তথায় গমন পূর্ব্বক বিষয়কার্য্যে ব্যাপৃত হইলেন।

শ্রীরামকৃষ্ণদেব বাহিরে আসিয়া সেই গানটীর বাকী চরণ গাহিতে লাগিলেন।

ইতিমধ্যে রামকৃষ্ণদেব বাহিরে আসিয়া মাষ্টার মহাশয় যে গানটির পূর্ব্ব কয়েক চরণ গাহিয়াছিলেন, সেই গানটির বাকী কয়েক চরণ গুন্ গুন্ স্বরে গাহিতে গাহিতে কক্ষমধ্যে বিচরণ করিতে লাগিলেন। শান্ত শিষ্ট বালকের মত তিনি একবার এ-জিনিষটা, একবার ও-জিনিষটার প্রতি অতি সাবধানে উঁকি মারিয়া দেখিতেছেন; একবার এ-দেয়ালের নিকট আসিয়া তাহাতে আস্তে আস্তে টোকা

মারিয়া তাহার শব্দ শুনিতেছেন, আবার ও-দেয়ালের কাছে যাইয়া তাহার উপর হাতটি রাখিয়া কোমল সুবঙ্কিম ভঙ্গিতে মুহূর্ত্তেক দাঁড়াইতেছেন।

দেবেন্দ্রনাথের দৃষ্টি তাঁহারই উপর। দেবেন্দ্র তাঁহার প্রতি তাকাইয়া তাকাইয়া যাহা দেখিলেন, তাহাতে তাঁহার মন উন্মত্ত হইয়া উঠিল। আকাশে চলমান মেঘমালার প্রতি একটু উর্ব্বরা কল্পনা সহযোগে তাকাইয়া থাকিলে যেমন পরিবর্ত্তনশীল কতই বিভিন্ন প্রকারের মূর্ত্তি দর্শন হয়, তদ্রূপ তিনি রামকৃষ্ণদেবের শরীরের প্রতি তাকাইয়া যাহা অবলোকন করিলেন, ভাবিলেন তাহা চীৎকার করিয়া সর্ব্বসাধারণকে বলিবেন, কিন্তু তৎক্ষণাৎ রামকৃষ্ণদেব আপন মনে একটি গান গাহিতে আরম্ভ করিলেন—

"ওরে কুশিলব, করিস্ কি গৌরব,
বাঁধা না দিলে পারিস্ কি বাঁধিতে ?"

দেবেন্দ্রনাথের মন শান্ত—ভগবান্ আত্মগোপন্ করিলে কে তাঁহাকে চিনিতে পারে ?

কেবল মাত্র এই চরণটি দুই তিনবার গাহিলেন। দেবেন্দ্রনাথের উন্মত্ত সংকল্প শান্ত হইয়া মনোমধ্যেই বিলীন হইয়া গেল। তাঁহাদের কয় জনের মধ্যে ঠারেঠোরে আকার-ইঙ্গিতে যেন কতই কথা হইয়া গেল। মাষ্টার কর্ত্তৃক গীত গান মনে যে প্রশ্নের উদয় করিয়াছিল, তাহার উত্তরে যেন তিনি সকলের মনে মনে বলিয়া দিলেন,—'শ্রীভগবান্ অবতীর্ণ হইয়াও যদি স্বয়ং কাহারও নিকট আত্মগোপন করেন, তবে তাহার সাধ্য কি যে, সে তাঁহাকে চিনিতে পারে।'

'এই ত গোপাল ভাব' !

অল্পক্ষণ পরে অন্দর হইতে একজন পরিচারক আসিয়া রামকৃষ্ণদেবকে আবার অন্দরে ডাকিয়া লইয়া গেল। ইহার একটু পরেই পরিচারক আবার আসিয়া দেবেন্দ্র, মহেন্দ্র ও লাটুকে লইয়া গেল। অন্দরে যাইয়া দেবেন্দ্র দেখিলেন—রামকৃষ্ণদেব একখানি আসনোপরি আলুথালু অবস্থায় বসিয়াছেন, যেন পঞ্চ বর্ষীয় বালক, তাঁহার ভাব ও রকম সকম দেখিয়া দেবেন্দ্রনাথের মনে একটা মহাধিক্কার উঠিল। ভাবিলেন, "একি ! যেন একেবারে পাঁচ বছরের ছেলেটি ! এই ত গোপাল ভাব, এমন মানুষের উপর কি কোন সন্দেহ হয় ! হাঁ মন, তুমি কি চিন্তা কর্‌ছিলে ?"

দেবেন্দ্রনাথ গলিয়া গেলেন। প্রকৃত পক্ষে দেবেন্দ্রনাথ এতদিন আপনার ভাব, জন্মগত ভাব, যাহা জন্ম-জন্মান্তরে অর্জ্জিত, তাহা ধরিতে, বুঝিতে, আপনাকে আপনি চিনিতে পারেন নাই। আজ তাঁহার সেই অন্তর্নিহিত ভাব সুপরিস্ফুট হইবার উপক্রম হইল ; তাঁহার মধুর ভাব, রামকৃষ্ণদেবের গোপাল ভাব দেখিয়া ফুটিবার জন্য যেন সুবাতাস প্রাপ্ত হইল। এই জন্যই রামকৃষ্ণদেব গাড়ীতে আসিতে আসিতে বলিয়াছিলেন, "আমি কারুর ভাব নষ্ট করিনি—কারুর ভাব নষ্ট করিনি।" আর এই জন্যই তিনি যত প্রকার সাধন-ভজন করিয়াছিলেন, তাহা রামকৃষ্ণদেবের মতে 'ঠিক্ থাপে থাপে লাগেনি।'

রামকৃষ্ণ বালকের মত আসনোপরি বসিয়া—বৃদ্ধা গৃহিণী বাৎসল্যভাবে বিভোর !

রামকৃষ্ণদেব বালকের মত মৃদু হাস্যযুক্ত বদনে একখানি আসনোপরি বসিয়া আছেন, তাঁহার সম্মুখে একখানি থালে নানাবিধ

উত্তম আহার্য্য দ্রব্য। বৃদ্ধা গৃহিণী তাঁহার নিকট বসিয়া বলিতেছেন, "দেখ বাবা, অনেক কাল হলো চৈতন্যচরিতামৃতে পড়েছিলুম, 'চৈতন্য-দেবের মা চৈতন্যদেবকে খাওয়াইয়া দিতেন' আমার মনে হোত, আহা! আমার এমন দিন যদি হতো, আমি যদি চৈতন্যদেবের মা হতুম তো এমনি করে তাকে খাইয়ে দিতুম। তা বাবা, তুমি যে সেই এসে উদয় হয়েছ, আর আমার কপালে যে বিধেতা এতটা সৌভাগ্য লিখেছেন, বাবা তাকি জানতুম। বাবা, তুমি যে আমার এমন করে সকল সাধ মেটাবে তা কি স্বপ্নেও ভেবেছিলুম!"

অজস্র দরবিগলিত নয়নধারায় ভূতল সিক্ত করিতে করিতে বৃদ্ধা এই প্রকার বাৎসল্যভাবে বিভোরা হইয়া, কোন দিকে দৃক্‌পাত না করিয়া, থালা হইতে মিষ্টান্ন লইয়া তাঁহার মুখে তুলিয়া খাওয়াইয়া দিতেছেন, আর আপনার মনোভাবের কত কথাই বলিতেছেন। তাঁহাদের নিকটেই আর তিন খানি আসন ও জলযোগের আয়োজন করা ছিল। ইঁহারা যাইয়া তদুপরি উপবেশন পূর্ব্বক জলযোগ করিতে বসিলেন, কিন্তু দেবেন্দ্রনাথ মনের নীচ প্রকৃতিকে ধিক্কার দিতে দিতে পুণ্যদর্শন রামকৃষ্ণ ও যশোমতির ভাবাপন্না গৃহিণীর প্রতি তাকাইয়া দুষ্ট মনের প্রায়শ্চিত্ত করিতে করিতে কিছক্ষণের জন্য জলযোগের কথা ভুলিয়া রহিলেন।*

* ৭২ পৃষ্ঠা হইতে এই পর্য্যন্ত ঘটনা প্রিয়নাথ সিংহ মহাশয় লিখিয়াছেন। ১৩৩৩ সালের ফাল্গুন ও চৈত্র 'উদ্বোধন' দ্রষ্টব্য।

দ্বাদশ পরিচ্ছেদ

শ্রীরামকৃষ্ণ-প্রেমাভিনয় দর্শন ।

(১৮৮৫—৮৬)

আদালতের কর্ম্মে নিযুক্ত ।

দেবেন্দ্রনাথ এইবারে যে কর্ম্মে নিযুক্ত হইয়াছিলেন, তাহাতে তাঁহাকে মধ্যে মধ্যে আদালতে যাইয়া মকর্দ্দমার তদ্বিরাদি করিতে হইত। ঠাকুর বিষয়ীর সংস্পর্শ ভালবাসিতেন না; পরিবারবর্গের গ্রাসাচ্ছাদনহেতু দেবেন্দ্রনাথকে আদালতের কর্ম্মে নিযুক্ত হইতে হইয়াছে বলিয়া তাঁহার বিশেষ ক্লেশ-বোধ হইলেও ঠাকুরের কৃপায় তাঁহার কোন বিষয়ে আসক্তি বা মোহ ছিল না।

হাওড়া ষ্টেশনে গান-রচনা ।

একবার মকর্দ্দমা উপলক্ষে হুগলী যাইবার জন্য হাওড়া ষ্টেশনে আসিয়া দেখিলেন, ট্রেন ছাড়িতে বিলম্ব আছে। সময় কাটাইবার জন্য দেবেন্দ্রনাথ নিজের অবস্থা গীতিচ্ছলে বর্ণনা করিতে বসিলেন এবং—

"কেমন মজার সং সেজেছি, একবার দেখে যা মা শ্যামা।
কটিতে পেণ্টুলেন আঁটা, গায়ে আলপাকার জামা ॥"*

ইত্যাদি গানটী রচনা করেন। বিষয়ী সাজিতে তাঁহার যে কি দুঃখ হইয়াছিল, তাহা এই গানটী হইতে বেশ বুঝা যায়।

---

* দেবগীতি, ৫৪ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য।

মকর্দ্দমার দলিলসহ ঠাকুরের নিকট গমন।

একদিন হুগলীর আদালত হইতে নৌকাযোগে ফিরিবার পথে নৌকা দক্ষিণেশ্বরের নিকটবর্ত্তী হইলে, শ্রীশ্রীঠাকুরকে দর্শন করিবার জন্য দেবেন্দ্রনাথের প্রাণ অত্যন্ত ব্যাকুল হইয়া উঠে—তাঁহার কথায় বলিতে গেলে, "বুকের ভিতর যেন গামছা-মোড়া দিচ্ছিল।" সঙ্গে মকর্দ্দমার দলিল-পত্র ছিল। দেবেন্দ্রনাথ ঐ সমুদয় লইয়াই দক্ষিণেশ্বরে ঠাকুরের স্থানে উপস্থিত হন। কিন্তু ঘরে প্রবেশ না করিয়া পশ্চিমের গোল বারান্দা হইতে ঠাকুরকে দেখিতে থাকেন।

ইতঃপূর্ব্বে একদিন একটী যুবক মকর্দ্দমার কাগজপত্রসহ ঠাকুরের নিকট আসিলে ঠাকুর তাঁহাকে বাহিরে বসিতে বলিয়াছিলেন। এই ঘটনা দেবেন্দ্রনাথের জানা থাকায় তিনি ঠাকুরের ঘরে প্রবেশ করিতে সঙ্কোচ বোধ করিতেছিলেন। ভক্তগতপ্রাণ ঠাকুর তাঁহাকে বাহিরে দাঁড়াইয়া থাকিতে দেখিয়া বলিলেন,—"কি গো, ওখানে কেন? ঘরে এসো।"

দেবেন্দ্রনাথ বলিলেন,—"আমার কাছে যে আদালতের কাগজপত্র রয়েছে।"

তদুত্তরে ঠাকুর বলিলেন,—"তা হোক্, তোমাদের ওতে কোন দোষ হবেনি, তুমি ভিতরে এসো।" প্রেমময় ঠাকুর ভক্তের প্রাণের টানটুকু দেখিলেন, দলিল-পত্রের কথা কোথায় ডুবিয়া গেল!

অশুচি অবস্থায় দেবেন্দ্রনাথের ঠাকুরের নিকট গমন।

ক্রমশঃ ঠাকুরের উপর দেবেন্দ্রনাথের অকৃত্রিম ভালবাসা জন্মিতে লাগিল। ঠাকুরের নিকট যাইবার কথা শুনিলে তিনি আনন্দে অধীর হইতেন। একদিন বৈকালবেলা শ্রীযুত গিরিশ ও ভাই ভূপতি হঠাৎ

আসিয়া তাঁহাকে দক্ষিণেশ্বরে ঠাকুরকে দর্শন করিতে যাইবার জন্য এত ব্যস্ত করিয়া তুলিলেন যে, তিনি অশুদ্ধ বস্ত্র ত্যাগ করিবার অবকাশও পান নাই। যে অবস্থায় ছিলেন, সেই অবস্থায়ই গমন করেন। পথিমধ্যে নিজ অশুচির কথা স্মরণ হওয়ায় দেবেন্দ্রনাথ ভাবিলেন,—'ঠাকুরকে আজ স্পর্শ করিব না, দূর হইতেই তাঁহাকে দর্শন করিব।'

দক্ষিণেশ্বরে উপস্থিত হইয়া দেবেন্দ্রনাথ সঙ্কল্পানুযায়ী কর্ম করিলেন। ঠাকুর তাঁহাদের সহিত কথা কহিতে কহিতে দেবেন্দ্রনাথকে বলিলেন,—"ওগো, অত দূরে কেন? এ দিকে এস না?" দেবেন্দ্রনাথ নিকটে যাইলে ঠাকুর তাঁহাকে আপন কোলের কাছে টানিয়া আনিলেন। নিজ অশুচি অবস্থা ভুলিয়া গিয়া দেবেন্দ্রনাথ মহানন্দে ঠাকুরের মধুর বাণী শুনিতে লাগিলেন।

এই ঘটনা বর্ণন করিতে যাইয়া—'ভগবান্ ভক্তের অন্তরের পবিত্রতা দেখেন—অন্তর যাঁহার পবিত্র, বাহ্য অশুচি তাঁহার কি করিবে?' —নিজ অবস্থা স্মরণে বিস্ময়াভিভূত দেবেন্দ্রনাথকে শ্রীশ্রীঠাকুরের দয়া সম্বন্ধে এইরূপ বলিতে আমরা শুনিয়াছি।

ঠাকুর অন্তরের ভাবটুকু দেখেন।

ভাবগ্রাহী দয়াল ঠাকুরের কথা বলিতে বলিতে দেবেন্দ্রনাথ অনেক সময়ে আত্মহারা হইয়া যাইতেন, আর বলিতেন,—"ঠাকুর আমার অন্তরের ভাবটুকু দেখেন, মুখের নিন্দাস্তুতিতে তাঁর লক্ষ্য নাই।" এই প্রসঙ্গে তিনি অনেক দৃষ্টান্তই বর্ণনা করিতেন। তাঁহার বর্ণি আরও একটী ঘটনার কথা আমরা এ স্থলে সংক্ষেপে উল্লে করিতেছি।

ষ্টার থিয়েটারে ঠাকুর ও গিরিশ।

একদিন রাত্রে শ্রীশ্রীঠাকুরের ষ্টার থিয়েটারে "চৈতন্যলীলা" অভিনয়-দর্শনান্তে নাট্যাচার্য্য গিরিশচন্দ্র আপন ষ্টেজের পার্শ্বে সজ্জাগৃহে তাঁহাকে লইয়া যাইয়া অভিনেতা ও অভিনেত্রী সকলকে শ্রীরামকৃষ্ণদেবের কৃপা প্রার্থনা করিতে বলেন। ঠাকুর গিরিশের অনুরোধমত সকলকে আশীর্ব্বাদ করেন। গিরিশও তখন স্বয়ং মদ-মত্ততা বশতঃ বলেন,—"তুমি আমার ছেলে হবে। বল,—হবে কি না?"—এই ভাবে নানারূপে বড়ই আব্দার করিতে থাকেন।

ঠাকুর মৃদু মৃদু হাসিতে হাসিতে উত্তর করেন,—"আমার বাপ শুদ্ধ পবিত্র লোক ছিলেন, আর তুই হলি মাতাল-ফাতাল লোক, আমি তোর ছেলে হব কেন রে?"—এই ভাবে দুই জনের মধ্যে অনেক বাদানুবাদ চলিতে লাগিল।

গিরিশ ঠাকুরকে গালি দেন।

দেবেন্দ্রনাথ বলিতেন, "গিরিশ বাবু ত অত বুদ্ধিমান্, কবি এবং নিপুণ একৃটারও বটেন; কিন্তু আমার ঠাকুরের কাছে কিছু নন। তোত্‌লা ঠাকুরের সঙ্গে কথায় বা ভাব-ভঙ্গিতে গিরিশ বাবু এঁটে উঠতে পারিলেন না। শেষে গিরিশ বাবু নেশার ঝোঁকে গালি দিতে আরম্ভ করিলেন। লাটু আমার পাশে দাঁড়াইয়া ছিল, গালি শুনিয়া সে আমাকে বলিল—'দেবেন বাবু, এত গালি আর শুন্‌তে পারি না, দেব নাকি দু' ঘা লাঠি মেরে?' আমি বলিলাম, 'না—উনি যখন কিছু বল্‌ছেন না, হেসে কথা কচ্ছেন, তখন চুপ থাকাই ভাল।" পরে অনেক রাত্রে লাটুকে সঙ্গে করিয়া ঠাকুর দক্ষিণেশ্বরে চলিয়া গেলেন।

পরদিন দক্ষিণেশ্বরে দেবেন্দ্রনাথ ও রামচন্দ্র।

পরদিন দুই প্রহরে দেবেন্দ্রনাথ অতিশয় দুঃখিতভাবে দক্ষিণেশ্বরে শ্রীশ্রীঠাকুরকে দেখিতে যান এবং গিরিশ বাবুর ব্যবহারের নিন্দা করিতে থাকেন। ঠাকুর শুনিয়া বলেন,—"আর গিরিশের কাছে যাব নি—ও মাতাল-ফাতাল লোক, আমাদের ও সব লোকের সঙ্গ করা ভাল নয়।"—এইরূপ কথাবার্ত্তা শেষ হইতে না হইতে, ভক্ত-প্রবর রামচন্দ্র আসিয়া তথায় উপস্থিত। তিনি এই বৃত্তান্ত শুনিয়া বলিলেন,—"বেশ তো করেছে!"

ঠাকুর সকলের দিকে ফিরিয়া বলিলেন,—"শোন, শোন, রাম কি বলে শোন, আমার পিতৃ-মাতৃ উচ্চারণ ক'রে কাল কত কি বলেছে,—আর বলে নাকি, 'বেশ করেছে'!"

গিরিশ ফুল-চন্দন কোথায় পাবে?

রাম স্থির-গম্ভীরভাবে বলিতে লাগিলেন,—"তা গিরিশ ফুল-চন্দন কোথায় পাবে? তাকে যা দিয়েছেন, সে তাই আপনাকে দিয়েছে।"

রামের কথা শুনিয়া ঠাকুরের বদনমণ্ডল আনন্দে প্রফুল্ল কমলবৎ হইয়া উঠিল। তিনি বলিলেন—"তা হলেই কি তার বাড়ী আর যাওয়া চলে?"

সকলেই বলিলেন,—"না"।

রাম পূর্ব্ববৎ ভাবের সহিত বলিতে লাগিলেন,—"কালীয় নাগ শ্রীকৃষ্ণকে কি বলেছিল?—'তুমি প্রভু, আমাকে বিষ দিয়েছ, আমি সুধা উদ্গিরণ করিতে কোথায় পাব? আপনি থিয়েটারের গিরিশ ঘোষকে যা দিয়েছেন, সে আপনাকে তা দিয়েই পূজা করেছে!"

"তবে চল, গিরিশকে দেখে আসি।

ঠাকুর আহ্লাদে হাস্য করিতে করিতে বলিতে লাগিলেন,—"তাই না কি—তাই না কি! তবে চল, তোমার সঙ্গের গাড়ীতেই যাই, গিরিশকে দেখে আসি।"

এই বলিয়া ঠাকুর রামের সঙ্গে চলিলেন। দেবেন্দ্রনাথকে একবারও ডাকিলেন না। অগত্যা ক্ষুণ্ণমনে দেবেন্দ্রনাথ নৌকা-যোগে গিরিশের বাড়ী আসিয়া দেখেন, গিরিশ ছল-ছল-নেত্রে দক্ষিণেশ্বরের দিকে চাহিয়া কি প্রতীক্ষা করিতেছিলেন। পরে বলিলেন,—"দেবেন্ বাবু, আপনাদের কাছে ওঁকে কা'ল অতটা বলা আমার ভাল হয় নি। তাঁহাকে ত আমি মানুষ দেখি না। তিনি যে নিন্দাস্তুতির পারে! আমি আপনাদের নিকট অপরাধী—তাঁহার নিকট নহি।"

অভিমানভরে গিরিশ থাকিয়া থাকিয়া এইরূপ অনেক কিছু বলিতেছিলেন। দেবেন্দ্রনাথ তাহা হইতে বুঝিতে পারিলেন যে, গিরিশ সে দিন উপবাসী রহিয়াছেন; ঠাকুর তাঁহাকে দর্শন না দিলে তিনি জলগ্রহণ করিবেন না প্রতিজ্ঞা করিয়াছেন। দেবেন্দ্রনাথ গিরিশের অকৃত্রিম ভালবাসা ও প্রগাঢ় বিশ্বাস দেখিয়া বিস্ময়ান্বিত হইতেছিলেন এবং গিরিশকে ঠাকুরের নিকট নিন্দা করায় নিজের অজ্ঞানতাকে ধিক্কার দিতেছিলেন। তখন দেবেন্দ্রনাথ ধীরে ধীরে বলিলেন,—"পরমহংস মশায় রামবাবুর গাড়ীতে আপনাকে দেখিতে আসিতেছেন।"

এই কথা শুনিয়া গিরিশ অশ্রু-বিসর্জ্জন করিতে করিতে উচ্চৈস্বরে বলিলেন,—"তিনি যদি ভগবান্ হন, তবে তাঁকে আসতেই হইবে, আমাদেরই কি কেবল তাঁর জন্য ভাবনা—তাঁর কি আমাদের জন্য ভাবনা নাই? আমি যে সারা দিন এই না খেয়ে

আছি, তা কি তিনি টের পান না?" এইরূপ কথাবার্তা চলিতেছে, এমন সময় (আন্দাজ বেলা ৪টা) ঠাকুরের গাড়ী আসিয়া গিরিশের দরজায় উপস্থিত হইল। ঠাকুর উপরে গিরিশের নিকট যাইয়াই মধুর সম্ভাষণে গিরিশকে তুষ্ট করিতে লাগিলেন! এই দৃশ্য—এই প্রেমের অভিনয় বর্ণনাতীত! যাঁহারা উপস্থিত ছিলেন, তাঁহারাও সম্যক্ প্রকাশ করিতে পারেন নাই।

'তাঁহার তুলনা একমাত্র তিনিই'।

দেবেন্দ্রনাথ গিরিশের নিকট শ্রীশ্রীঠাকুরকে অন্তর্য্যামী ভগবান্ বলিয়া বিশ্বাস করিতে শিখিলেন। তিনি পুনঃ পুনঃ বলিতেন,—"ঠাকুরের আচরণ আমরা কি বুঝি? মানুষের মন-গড়া মাপকাঠী দিয়ে তাঁহাকে মাপিতে যাইয়া আমরা ভুল করি। তাঁহার বাহিরটা মানুষেরই মত ছিল বটে, কিন্তু তাঁহার আচরণ, তাঁহার অদ্ভুত ত্যাগ, তপস্যা, তাঁহার শুদ্ধা ভক্তি, জ্ঞান এবং প্রেমের লোক-শিক্ষা মানুষে কখনও দেখা যায় না। তিনি চিরদিনই আদর্শ—তাঁহার তুলনা একমাত্র তিনিই।"

ত্রয়োদশ পরিচ্ছেদ

শ্রীরামকৃষ্ণের জননীর ভাব ও দয়া দর্শন।

"পূর্ণকে আঁব খাওয়াইতে পারলুম না।"

একদিন দ্বিপ্রহরে দেবেন্দ্রনাথ দক্ষিণেশ্বরে ঠাকুরের ঘরে প্রবেশ করিয়া দেখেন, ঘরের মধ্যে তিনি একা রহিয়াছেন। ঠাকুর এক একটী আম হাতে করিয়া দেখিতেছেন আর কাঁদিতেছেন। দেবেন্দ্রনাথ ব্যাপার কি জিজ্ঞাসা করায় ঠাকুর বলিলেন,—"এবারে পূর্ণকে আঁব খাওয়াইতে পারিলাম না, সে ছেলেমানুষ, বাড়ীর ভয়ে এখানে আসিতে পারে না; কি ক'রে তাকে আঁব খাওয়াই? তার জন্য তোলা আঁব তোলাই রইল! সেও আর এলো না, আঁবও তাকে খাওয়াতে পার্‌লুম না।"

ভক্তের প্রতি ঠাকুরের জননীর ন্যায় ভালবাসা দেখিয়া মুগ্ধ দেবেন্দ্রনাথ তাঁহাকে সান্ত্বনা দিয়া বলিলেন,—"আঁবগুলি আমায় দিন্, আমি পূর্ণকে আমার বাড়ীতে আনাইয়া আঁব খাওয়াইব। তার বাড়ী আমার বাড়ীর নিকটে।"

"তা যদি পার, তা হ'লে তোমার লক্ষ ব্রাহ্মণভোজনের ফল হবে।"—এই বলিয়া ঠাকুর আমগুলি দেবেন্দ্রনাথের হস্তে দিলেন। দেবেন্দ্রনাথ বলিয়াছিলেন,—"আমার অদৃষ্টে লক্ষ ব্রাহ্মণ-ভোজনের ফল ছিল, আমি পূর্ণকে আঁব খাওয়াইয়াছিলাম।"

শ্রীরামকৃষ্ণের জন্য গরম মিহিদানা।

"একদিন শ্রীযুক্ত দেবেন্দ্রনাথ মজুমদার দক্ষিণেশ্বরে যাইবার সঙ্কল্পে তাঁহার আহিরীটোলার আবাস হইতে বাহির হইলেন; মনে করিলেন

ঐ পাড়ার দিগম্বর ময়রার দোকানের খাবার বড় ভাল, সেই দোকানে গিয়া যাহা টাট্‌কা গরম, তাহাই শ্রীরামকৃষ্ণদেবের জন্য লইয়া যাইবেন। দোকানে যাইয়া দেখিলেন, ময়রারা মিহিদানার মিঠাই বাঁধিতেছে। দেবেন্দ্র তাহাদিগকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "কি হে, মেঠাই টাট্‌কা না কি?"

ময়রারা উত্তর করিল, "মোশাই হাতে ক'রে দেখুন না, এখনও কত গরম, আমাদের হাতে সয়, আপনাদের হাতে সইবে না।"

দেবেন্দ্রনাথ এক সের মিঠাই কিনিয়া ঘাটে আসিয়া দেখিলেন, একখানি যাত্রিপূর্ণ নৌকা প্রস্তুত, একজন মাত্র বাকি। তিনি যাইয়া তাহার মধ্যে বসিলেন, মিঠাইয়ের ঠোঙ্গাটি ক্রোড়ে রাখিলেন, নৌকা ছাড়িয়া দিল। দেবেন্দ্রনাথের সম্মুখে একজন চাঁপদাড়ীযুক্ত মুসলমান উপবিষ্ট। লোকটি প্রৌঢ়, বড়ই গোপ্পে, নৌকায় উঠিয়া অবধি দেবেন্দ্র দেখিলেন, ক্রমাগত কথা কহিতেছে—মুখের কামাই নাই। দেবেন্দ্র আরও দেখিলেন যে, তাহার কথার সঙ্গে থুৎকারবিন্দু ঝাঁকে ঝাঁকে বাহির হইয়া তাঁহার শরীর কলুষিত করিতেছে। দেবেন্দ্র উদ্বিগ্ন হইয়া পড়িলেন। তাঁহার মনে হইল, মিঠাইয়ের ঠোঙ্গাটিতেও হয় তো ঐ মুসলমানের থুথু পড়িয়াছে।

শ্রীশ্রীঠাকুর রামচন্দ্রের জিলিপি উচ্ছিষ্ট জানিয়া ফেলিয়া দেন।

একবার রামচন্দ্র জিলিপি লইয়া যাইবার সময় ঝুড়ি হইতে একখানি জিলিপি একটি দরিদ্র বালককে দিয়াছিলেন বলিয়া সমস্ত জিলিপি উচ্ছিষ্ট হইয়াছিল। 'দেবতার উদ্দিষ্ট বস্তুর আগ-ভাগ তুলিয়া কাহাকেও দিলে সে সমস্ত বস্তু উচ্ছিষ্ট হয়,'—এই কথা বলিয়া রামকৃষ্ণদেব একখানি জিলিপি হাতে লইয়াই ভাবস্থ হইলেন ও তাহা উচ্ছিষ্ট জানিয়া গুঁড়াইয়া ফেলিয়া দিয়া গঙ্গাজলে হাত ধুইয়া

ফেলিয়াছিলেন। আরও কত লোকের অনাচারযুক্ত খাবার স্পর্শ করিতে পারেন নাই। দেবেন্দ্রনাথের প্রাণ উড়িয়া গেল। গরুর গাড়ীতে গুড়ের নাগ্‌রী সাজানর মত নৌকায় যাত্রীরা গায়ে-গায়ে ঠেকাঠেকি হইয়া বসিয়াছে; এমন স্থান নাই যে, ঠোঙ্গাটি কোথাও রাখিয়া দেন। চক্ষুলজ্জার খাতিরে বক্তা মুসলমানকে কথা কহিতে নিষেধ করিতেও পারিলেন না, সে সারা পথ বকর্‌-বকর্‌ করিয়া চলিল।

দাক্ষিণেশ্বরে পঁহুছিয়া দেবেন্দ্র ভাবিলেন, ঠোঙ্গাশুদ্ধ মিঠাই গঙ্গায় ফেলিয়া দিয়া হাত ধুইয়া যান। মিঠাই এখনও গরম, কেমন মায়া হইল, ফেলিতে পারিলেন না; গঙ্গাজল নিজ শরীরে ও ঠোঙ্গায় সিঞ্চন করিয়া শ্রীরামকৃষ্ণের প্রকোষ্ঠে প্রবেশ করিলেন। রামকৃষ্ণদেব তখন ঘরে ছিলেন না। দেবেন্দ্র ঠোঙ্গাটি দূরের তাকের এক কোণে রাখিলেন; ভাবিলেন, ইহা আর তাঁহাকে দিবেন না, দিলে হয় তো রামের জিলিপির অবস্থা হইবে।

ঠাকুরের ফটোখানি বড় ভাল লেগেছে।

দেবেন্দ্র ঘরে বসিয়া বিশ্রাম করিতে করিতে দেখিলেন, ঘরের দেওয়ালে রামকৃষ্ণদেবের একখানি ফটো টাঙ্গান রহিয়াছে। ইতিপূর্ব্বে ইহা ছিল না। দেবেন্দ্র উঠিয়া ফটোখানির নিকট আসিয়া মনোনিবেশপূর্ব্বক তাহা দেখিতেছেন। এমন সময় রামকৃষ্ণদেব ফট্‌ ফট্‌ করিয়া চটী-পায়ে ঘরের মধ্যে প্রবেশপূর্ব্বক দেবেন্দ্রকে তাঁহার ফটোর প্রতি তাকাইয়া থাকিতে দেখিয়া বলিলেন, "কি হে, এত তাকিয়ে তাকিয়ে কি দেখছো?"

দেবেন্দ্র তাঁহার পদধূলি লইয়া কহিলেন, "আজ্ঞে, আপনার এই ফটোখানি বড় ভাল লেগেছে, তাই দেখছি।" দেবেন্দ্রনাথের ইচ্ছা, ঐ ফটোখানি আত্মসাৎ করেন, কিন্তু এ কথা বলিতে একটু সঙ্কোচ বোধ হইতেছে।

অন্তর্য্যামী রামকৃষ্ণদেব তাহা বুঝিয়া বারংবার জিজ্ঞাসা করিলেন, "কি বল না, মনের ভাবটা কি, কথাটা কি?"

অবশেষে দেবেন্দ্র কহিলেন, তিনি ঐ ফটোখানি লইবেন। রামকৃষ্ণদেব বলিলেন, "তা কি হয়, ওরা (ছেলেরা) কত যত্ন ক'রে একখানি রেখেছে। ওখানি ত লওয়া হবেক নি। তা ছবির ভাবনা কি, অবিনাশ যে সে দিন ফটো তুলে লিয়েছে, তার কাছ্‌কে পাবেক। তুমি তাকে বোলো, সে দেবে কিন্তু দাম লিবেক।"

দেবেন্দ্র কহিলেন, "দামের জন্য কিছু আসিয়া যায় না, তবে তিনি এই রকম একখানি ভাল ফটো লইবেন।"

রামকৃষ্ণদেব কহিলেন, "দেখ, তুমি ভবনাথকে বোলো দেখি, সে অবিনাশের কাছে তাগাদা দিয়ে আনিয়ে দিবেক। অবিনাশ একটু লেশাটা ভাংটা করে কি-না, তাকে একটু তাগাদা করতে হয়। তা তুমি পারবে না, ভবনাথের বাড়ীর কাছে তার বাড়ী, ভবনাথ পারবে।" দেবেন্দ্র ভবনাথকে বলিয়া রাখিলেন।

"ওরে, একটু ক্ষিদে পাচ্ছে।

এই প্রকার কথাবার্ত্তার পর ঘরে অপরাপর ভক্তগণ আসিয়া উপস্থিত হইলেন। তাঁহাদের সহিত নানা কথাবার্ত্তার পর রামকৃষ্ণদেব কহিলেন, 'ওরে, একটু ক্ষিদে পাচ্ছে।' এই কথা শুনিয়া ভক্ত বালকদের মধ্যে কেহ উঠিয়া তাঁহার জন্য কিছু আনিতে গেলেন।

রামকৃষ্ণদেব তাঁহার ছোট তক্তপোষ হইতে উঠিয়া, ঘরের এদিক ওদিক ঘুরিয়া যেন কোন বস্তুর অন্বেষণ করিতে লাগিলেন। দেবেন্দ্রের মন চঞ্চল হইয়া উঠিয়াছে, মনে কতই কষ্ট হইতেছে, এমন মিহিদানার মিঠাই আনিয়াছেন, আর রামকৃষ্ণদেব গরম মিহিদানার মিঠাই ভালবাসেন, কিন্তু তাহা বোধ হয় মুসলমানের মুখামৃত-সংযুক্ত, কেমন করিয়া তাহা দিবেন?

"এই যে এখানে মিঠাই—বাঃ, কে আনলে!"

দেবেন্দ্র মনের কথা মনে রাখিয়া চুপ করিয়া বসিয়া আছেন। রামকৃষ্ণদেব দূরের তাকটির কাছে আসিয়া হেঁট হইয়া নীচের তাক হইতে সেই মিঠাইয়ের ঠোঙ্গা বাহির করিলেন। দেবেন্দ্রনাথের বুক গুর্-গুর্ করিয়া উঠিল। রামকৃষ্ণদেব কহিলেন, "এই যে এখেনে মেঠাই রয়েছে। বাঃ, কে আনলে, এখনো গরম।" এই বলিয়াই তাহা খাইতে লাগিলেন। দেবেন্দ্রের প্রাণ মাতিয়া উঠিল। ভাবিলেন, "হে করুণাময়, তোমার নাম ক'রে আনলুম, তোমায় দিতে ভরসা হোল না। দীননাথ তাই আমার প্রাণের ক্ষোভ নিবারণের জন্যই খাচ্ছেন।" অলক্ষ্যে দেবেন্দ্রের চক্ষে জল পড়িল। জল মুছিয়া তিনি বাহিরের বারান্দায় আসিলেন। রামকৃষ্ণদেব ঠোঙ্গা হইতে দুই একটি মিঠাই খাইয়া ভক্তদের বিতরণ করিতে বলিলেন। দেবেন্দ্র ইতিমধ্যে বাহিরে আসিয়া দয়াময় ঠাকুরের অপার দয়ার কথা জনৈক ভক্তের নিকট কহিলেন, অমনি মহানন্দে ভক্তগণ সেই প্রসাদ ধারণ করিতে করিতে সেই অপার অতুল ভালবাসার কথা পরস্পরকে বলিতে লাগিলেন।"*

---

* মিহিদানার এই ঘটনাটি প্রিয়নাথ সিংহ লিখিত, উদ্বোধন, মাঘ ১৩৩৩।

চতুর্দ্দশ পরিচ্ছেদ

দেবেন্দ্রনাথের আলয়ে শ্রীরামকৃষ্ণদেবের উৎসব।

গিরিশের সহিত উৎসবের পরামর্শ।

অনেক সঙ্গতিসম্পন্ন ভক্ত শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণদেব ও তাঁহার সাঙ্গোপাঙ্গদিগকে লইয়া মাঝে মাঝে আপন আলয়ে উৎসব করিতেন। দেবেন্দ্রনাথেরও ঐরূপ একটী উৎসব আপন ক্ষুদ্র আলয়ে করিবার ইচ্ছা হইল। শ্রীযুত গিরিশকে যাইয়া মনোবাসনা জানাইলেন। গিরিশ তাঁহাকে উৎসাহিত করিলেন এবং তাঁহার অবস্থা বিবেচনা করিয়া ব্যয়ভার বহন করিবার অভিপ্রায় জানাইলেন। দেবেন্দ্রনাথের মনের ভাব—নিজেই সাধ্যমত ব্যয় করিবেন। প্রকাশ্যে কিছু না বলিয়া দ্বিগুণ উৎসাহের সহিত আপন সঙ্কল্প কার্য্যে পরিণত করিবার সুযোগ সন্ধান করিতে লাগিলেন।

"মজুমদার মহাশয় দুই একদিন পরে দক্ষিণেশ্বরে গিয়াছেন। রামকৃষ্ণদেবকে প্রাণের কথাটি বলিবার জন্য মনে করিতেছেন, আবার লজ্জা আসিয়া যেন তাঁহার মুখ চাপিয়া ধরিতেছে। এইরূপ ইতস্ততঃ করিতে করিতে তিনি গুরুভাইদের কাছে মনোভাব চাপিয়া, গুরুভাইদের সহিত নানা কথায় যোগদান করিয়া একটু অন্যমনস্ক হইয়াছেন, এমন সময় রামকৃষ্ণদেব সহাস্য-বদনে মজুমদারের প্রতি চাহিয়া তাঁহাকে কহিতে লাগিলেন, "ওগো, দেখো, আজ ক'দিন থেকে মনে হচ্ছে, তোমা[illegible] বাড়ী যাব।"

এই কথা বলিবার জন্যই আজ এসেছি।

দেবেন্দ্র অমনি লজ্জা-সঙ্কোচ সব ভুলিয়া গিয়া উত্তর করিলেন, "ঐ কথা বলিবার জন্যই আজ এসেছি। তা এই সামনের রবিবারেই চলুন।"

রামকৃষ্ণদেব কহিলেন, "গাড়ীভাড়া যে অনেক লাগে, তোমার আয় তেমন নয়।"

দেবেন্দ্র হাসিয়া কহিলেন, "তা হোক্ মোশাই, ঋণং কৃত্বা ঘৃতং পিবেৎ।" অমনি হো হো শব্দে হাসির মহা ঘটা পড়িয়া গেল। সে হাসির রোল আর থামে না, রামকৃষ্ণদেবও যত হাসেন, দেবেন্দ্রও তত হাসেন, অন্যান্য বালক-ভক্তগণও তত হাসেন।

দেবেন্দ্রনাথ অবশেষে হাসিতে হাসিতেই বলিলেন, "মোশাই, আমি ধার-ধোর কোরে, যেমন কোরে পারি, সমস্ত যোগাড় কোরব এখন, আপনি অনুগ্রহ কোরে একবার পায়ের ধূলো দিলেই হবে।"

রামকৃষ্ণদেব একটু হাসি সংবরণ করিয়া কহিলেন, "তবে তুমি এক কাজ করো, সবাইকে বোলো না।" এইরূপ কথাবার্ত্তার পর দেবেন্দ্র আসিয়া রামচন্দ্রকে খবর দিলেন। ভক্তদলপতি রামচন্দ্র উৎসবের সংবাদে নাচিয়া উঠিলেন এবং কীর্ত্তনের যোগাড় করিবার ভার লইলেন ও গোষ্ঠকে বলিয়া আসিলেন—নরোত্তম কীর্ত্তন গাইবে, গোষ্ঠ খোল বাজাইবে।

নরোত্তম ও গোষ্ঠ উভয়কেই রামকৃষ্ণদেব বড়ই ভালবাসেন। তাই যিনিই রামকৃষ্ণদেবকে লইয়া উৎসব করেন, তিনিই এ দুই জনের সাহায্যে কীর্ত্তন করান। দেবেন্দ্রনাথ স্বাধীনচেতা ব্যক্তি, গুরুসেবার জন্য বন্ধুর সাহায্য লইবেন না স্থির করিয়া, সাধ্যমত সকলের আহারের আয়োজন করিলেন—লুচি, ইত্যাদি ; আর একজন বরফওয়ালাকে কিছু বায়না

দিয়া, বহু কুল্পি প্রস্তুত করিয়া আনিতে কহিয়া দিলেন, কারণ, তখন গ্রীষ্মকাল—চৈত্র মাস।

নির্দ্দিষ্ট দিনে রামকৃষ্ণদেব প্রথম বলরামের বাটী আসিলেন।

নির্দ্দিষ্ট দিন রামকৃষ্ণদেব একখানি গাড়ী করিয়া প্রথম বসুপাড়ায় বলরামের বাটী আসিলেন। বলরাম গাড়ীভাড়া দিয়া গাড়োয়ানকে বিদায় করিলেন। এখানে ভক্তের মেলা বসিয়াছে। রামকৃষ্ণদেব আসিবেন শুনিয়া পল্টু, ছোট নরেন, মাষ্টার, বাবুরাম, পদ্মবিনোদ প্রভৃতি অনেকেই আসিয়াছেন। রামকৃষ্ণদেব তাঁহাদের সহিত একত্রে বসিয়া বিশ্রাম ও কথাবার্ত্তা কহিতে লাগিলেন; অনুপস্থিত ভক্তদের সম্বন্ধে কত কথা জিজ্ঞাসা করিলেন। কোলের খোকাটি বহির্ব্বাটীতে যাইয়া অনেকক্ষণ খেলায় নিযুক্ত থাকিলে, অন্দরে মাতা যেমন ব্যস্ত হইয়া সকলকে দিয়া মুহুর্মুহুঃ ছেলেটির খবর লইয়া থাকেন, সেই প্রকার ব্যগ্রভাবে যে যে ভক্ত তথায় আসিতে পারেন নাই, তাঁহাদের সংবাদ লইলেন। পরে অপর একখানি গাড়ী আনাইয়া বেলা চারিটা আন্দাজ, মজুমদার মহাশয়ের বাটী যাত্রা করিলেন।

এদিকে আজ রামকৃষ্ণদেবের শুভাগমন হইবে বলিয়া মজুমদার মহাশয় তাঁহার ও ভক্তবৃন্দের যত্নের জন্য কত কি আয়োজন করিতেছেন। রামকৃষ্ণদেব আসিবেন শুনিয়া মজুমদার মহাশয়ের জনৈক প্রতিবেশী বৈকালে আসিয়া তাঁহাকে কহিলেন, "মোশাই, পরমহংসদেব যখন আসবেন, আমি তখন এসে তাঁকে কি দর্শন করতে পারি ?"

দেবেন্দ্র কহিলেন, "আমার তাতে কিছুই আপত্তি নেই।"

প্রতিবেশী আবার জিজ্ঞাসা করিলেন, "তিনি কখন্ আসবেন ?"

"এই আসেন আর কি, বেলা চারটে সাড়ে চারটের সময় আসবেন।"

দেবেন্দ্রনাথ আপন বৈঠকখানার ঘরটি অতি সঙ্কীর্ণ বলিয়া তক্ত-পোষখানি প্রাঙ্গণে বাহির করিয়া ঘরে ঢালা-বিছানা করিয়াছেন। তাঁহাদের আসিবার একটু বিলম্ব দেখিয়া প্রতিবেশী সেই তক্তপোষটির উপর একটু শয়ন করিলেন। তাঁহার একটু অহিফেন খাওয়ার অভ্যাস ছিল, শয়নমাত্রেই গভীর নিদ্রায় অভিভূত হইলেন।*

ঠাকুর দেবেন্দ্রের বাড়ী উপস্থিত।

"কিয়ৎক্ষণ পরে দেবেন্দ্রের বাড়ীতে পহুঁছিয়া (শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ) বলিতেছেন,—দেবেন্দ্র, আমার জন্য খাবার কিছু কো'রো না; অমনি সামান্য,—শরীর তত ভাল নয়।

দেবেন্দ্রের বাড়ীতে ভক্তসঙ্গে।

ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ দেবেন্দ্রের বাড়ীর বৈঠকখানায় ভক্তের মজলিস করিয়া বসিয়া আছেন। বৈঠকখানার ঘরটী একতলায়। সন্ধ্যা হইয়া গিয়াছে। ঘরে আলো জ্বলিতেছে। ছোট নরেন, রাম, মাষ্টার, দেবেন্দ্র, অক্ষয়, উপেন্দ্র ইত্যাদি অনেক ভক্তেরা কাছে বসিয়া আছেন।

---

* ৯২ পৃষ্ঠার মধ্য হইতে এই পর্য্যন্ত বর্ণনা প্রিয়নাথ সিংহ লিখিত, উদ্বোধন, বৈশাখ ১৩৩৪। পরবর্ত্তী চাক্ষুষ বর্ণনা শ্রীম-কথিত শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ-কথামৃত (৩য় ভাগ) হইতে গ্রন্থকারের অনুমতিক্রমে গৃহীত হইয়াছে।

ঠাকুর কীর্ত্তনানন্দে ও সমাধি-মন্দিরে।

এইবার খোল-করতালি লইয়া সংকীর্ত্তন হইতেছে। কীর্ত্তনীয়া গাহিতেছেন।—

কি দেখিলাম রে, কেশব ভারতীর কুটীরে,
অপরূপ জ্যোতি, শ্রীগৌরাঙ্গ-মূরতি,
দুনয়নে প্রেম বহে শতধারে॥
গৌর, মত্ত মাতঙ্গের প্রায়, প্রেমাবেশে নাচে গায়,
কভু ধূলাতে লুটায়, নয়নজলে ভাসে রে।
কাঁদে আর বলে হরি, স্বর্গ মর্ত্ত্য ভেদ করি, সিংহরবে রে;
আবার দন্তে তৃণ লয়ে, কৃতাঞ্জলি হয়ে, দাস্য-মুক্তি যাচেন দ্বারে দ্বারে।
কিবা মুড়ায়ে, চাঁচর কেশ, ধরেছেন যোগীর বেশ,
দেখে ভক্তি প্রেমাবেশ, প্রাণ কেঁদে উঠে রে।
জীবের দুখে কাতর হয়ে, এলেন সর্ব্বস্ব ত্যজিয়ে, প্রেম বিলাতে রে;
প্রেমদাসের বাঞ্ছা মনে, শ্রীচৈতন্য চরণে, দাস হয়ে বেড়াই দ্বারে দ্বারে॥

ঠাকুর গান শুনিতে শুনিতে ভাবাবিষ্ট হইয়াছেন। কীর্ত্তনীয়া শ্রীকৃষ্ণ-বিরহবিধুরা ব্রজগোপীর অবস্থা বর্ণনা করিতেছেন। ব্রজগোপী মাধবী-কুঞ্জে মাধবের অন্বেষণ করিতেছেন—

রে মাধবী! আমার মাধব দে!
(দে দে দে, মাধব দে!)
আমার মাধব, আমায় দে, দিয়ে বিনা মূলে কিনে নে॥
মীনের জীবন, জীবন যেমন, আমার জীবন মাধব তেমন।
(তুই লুকাইয়ে রেখেছিস্, ও মাধবী!)
(অবলা সরলা পেয়ে!) (আমি বাঁচি না, বাঁচি না!)
(মাধবী, ও মাধবী, মাধব বিনে) (মাধব অদর্শনে)

ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ মাঝে আঁকর দিতেছেন,—

(সে মথুরা কত দূর !) (যেখানে আমার প্রাণবল্লভ !)

ঠাকুর সমাধিস্থ। স্পন্দহীন দেহ। অনেকক্ষণ স্থির রহিয়াছেন।

ভাবাবিষ্ট ঠাকুর মা'র সঙ্গে কথা কহিতেছেন।

ঠাকুর কিঞ্চিৎ প্রকৃতিস্থ হইয়াছেন ; কিন্তু এখনও ভাবাবিষ্ট। এই অবস্থায় ভক্তদের সম্বন্ধে কথা বলিতেছেন। মাঝে মাঝে মা'র সঙ্গে কথা কচ্ছেন।

শ্রীরামকৃষ্ণ (ভাবস্থ)। মা ! তাকে টেনে নিও ; আমি আর ভাব্‌তে পারি না !

(মাষ্টারের প্রতি)। তোমার সম্বন্ধী—তাঁর দিকে একটু মন আছে।

(গিরিশের প্রতি)। তুমি গালাগাল খারাপ কথা অনেক বল ; তা হউক, ও সব বেরিয়ে যাওয়াই ভাল। বদরক্ত রোগ কারু কারুর আছে। যত বেরিয়ে যায়, ততই ভাল।

"উপাধি-নাশের সময়েই শব্দ হয়। কাঠ পোড়বার সময় চড়্‌-চড়্‌ শব্দ করে। সব পুড়ে গেলে আর শব্দ থাকে না।

"তুমি দিন দিন শুদ্ধ হবে। তোমার দিন দিন খুব উন্নতি হবে। লোকে দেখে অবাক্ হবে।

"আমি বেশী আস্‌তে পারবো না ;—তা হউক ;—তোমার এম্নিই হবে।"

ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণের ভাব আবার ঘনীভূত হইতেছে। আবার মা'র সঙ্গে কথা কহিতেছেন। "মা ! যে ভাল আছে, তাকে ভাল

কত্তে যাওয়া কি বাহাদুরী? মা! মরাকে মেরে কি হবে? যে খাড়া হয়ে রয়েছে, তাকে মারলে তবে ত তোমার মহিমা!”

ঠাকুর কিঞ্চিৎ স্থির হইয়া হঠাৎ একটু উচ্চৈঃস্বরে বলিতেছেন,—

“আমি দক্ষিণেশ্বর থেকে এসেছি। **যাচ্ছি গো মা**।

যেন একটি ছোট ছেলে দূর হইতে মা'র ডাক শুনিয়া উত্তর দিতেছে! ঠাকুর আবার নিস্পন্দ-দেহ হইয়া সমাধিস্থ বসিয়া আছেন! ভক্তেরা অনিমেষলোচনে নিঃশব্দে দেখিতেছেন।

ঠাকুর ভাবে আবার বলছেন, 'আমি লুচি আর খাব নাই।' পাড়া হইতে দুই একটী গোস্বামী দেখিতে আসিয়াছিলেন—তাঁহারা উঠিয়া গেলেন!

ঠাকুর রামকৃষ্ণ ভক্তসঙ্গে।

ঠাকুর ভক্তসঙ্গে আনন্দে কথাবার্ত্তা কহিতেছেন। চৈত্র মাস,—বড় গরম। দেবেন্দ্র কুল্পি-বরফ তৈয়ার করিয়াছেন। ঠাকুরকে ও ভক্তদের খাওয়াইতেছেন। ভক্তরাও কুল্পি খাইয়া আনন্দ করিতেছেন। মণি আস্তে আস্তে বলছেন 'Encore! Encore!' (অর্থাৎ আরও কুল্পি দাও), ও সকলে হাসিতেছেন। কুল্পি দেখিয়া ঠাকুরের ঠিক বালকের ন্যায় আনন্দ হইয়াছে।

শ্রীরামকৃষ্ণ (ভক্তদের প্রতি)। বেশ কীর্ত্তন হ'লো। গোপীদের অবস্থা বেশ বল্লে;—“রে মাধবী, আমার মাধব দে!”

“গোপীদের প্রেমোন্মাদের অবস্থা। কি আশ্চর্য্য! কৃষ্ণের জন্য পাগল!”

একজন ভক্ত আর একজনকে দেখাইয়া বলিতেছেন,—এঁর সখী-ভাব—গোপীভাব।

রাম। এঁর ভিতর দুই-ই আছে। মধুরভাব আবার জ্ঞানের কঠোর ভাবও আছে।

শ্রীরামকৃষ্ণ। কি গা?

*   *   *   *   *

ঠাকুর এইবার সুরেন্দ্রের কথা কহিতেছেন।

রাম। আমি খবর দিছলাম, কই এলো না।

শ্রীরামকৃষ্ণ। কর্ম্ম থেকে এসে আর পারে না।

এক জন ভক্ত। রামবাবু আপনার কথা লিখছেন।

শ্রীরামকৃষ্ণ (সহাস্যে)। কি লিখছে?

ভক্ত। "পরমহংসের ভক্তি"—এই ব'লে একটা বিষয় লিখছেন।

শ্রীরামকৃষ্ণ (সহাস্যে)। তবে আর কি, রামের খুব নাম হবে।

গিরিশ (সহাস্যে)। সে আপনার চেলা ব'লে।

শ্রীরামকৃষ্ণ। আমার চেলা-টেলা নাই। আমি রামের দাসানুদাস!

পাড়ার লোকেরা কেহ কেহ আসিয়াছিলেন; কিন্তু তাঁহাদের দেখিয়া ঠাকুরের আনন্দ হয় নাই। ঠাকুর একবার বলিলেন, এ কি পাড়া! এখানে দেখছি, কেউ নাই!

দেবেন্দ্র এইবার ঠাকুরকে বাড়ীর ভিতর লইয়া যাইতেছেন। সেখানে ঠাকুরকে জল খাওয়াইবার আয়োজন হইয়াছে। ঠাকুর ভিতরে গেলেন।"

"তাঁহার জন্য দেবেন্দ্রনাথের পত্নী আসন পাতিয়া আহার্য্য দ্রব্যাদি সাজাইয়া রাখিয়াছিলেন। রামকৃষ্ণদেব যাইয়া তাহার উপর বসিলেন। দেবেন্দ্রনাথের মাতা, ভ্রাতৃজায়া, স্ত্রী এবং প্রতিবেশিনীরা আসিয়া তাঁহার পদধূলি লইলেন। সকলে প্রণাম করিলে পর দেবেন্দ্র-নাথের পত্নী আসিয়া গললগ্নীকৃতবাসে প্রণাম করিয়া পদধূলি গ্রহণ

করিবামাত্র, রামকৃষ্ণদেব বুঝিতে পারিলেন যে, ইনিই দেবেন্দ্রের স্ত্রী। তিনি তাঁহার প্রতি অঙ্গুলী নির্দ্দেশ করিয়া দেবেন্দ্রনাথকে কহিলেন, "দেখ, একেবারে আউলে। বেশ বেশ। এরা সব পাড়াগেঁয়ে মেয়ে কি না, বড় সরল। এদের একদিন দক্ষিণেশ্বরে নিয়ে যেও। যাবে?"

দেবেন্দ্র কহিলেন, "আজ্ঞে হাঁ, আপনি যখন অনুমতি করেছেন, তখন যাব বই কি।"

রামকৃষ্ণদেব আবার বলিলেন, "হাঁ, একদিন ওখানকে নিয়ে যেও।"*

"ঠাকুর সহাস্যবদনে বাড়ীর ভিতর হইতে ফিরিয়া আসিলেন ও আবার বৈঠকখানায় উপবিষ্ট হইলেন। ভক্তেরা কাছে বসিয়া আছেন। উপেন্দ্র † ও অক্ষয় ‡ ঠাকুরের দুই পার্শ্বে বসিয়া পদসেবা করিতেছেন। ঠাকুর দেবেন্দ্রের বাড়ীর মেয়েদের কথা বলিতেছেন,—

"বেশ মেয়েরা! পাড়াগেঁয়ে মেয়ে কি না। খুব ভক্তি!

ঠাকুর আত্মারাম! নিজের আনন্দে গান গাইতেছেন! কি ভাবে গান গাইতেছেন? নিজের অবস্থা স্মরণ করিয়া তাঁহার কি ভাবোল্লাস হইল? তাই কি গান কয়টি গাইতেছেন?

গান।

(১) সহজ না হলে, সহজকে যায় না চেনা।

গান।

(২) দরবেশ দাঁড়া রে! সাধের করওয়া কিস্তীধারী।

---

* পূর্ব্ব পৃষ্ঠার শেষ ৫ লাইন হইতে এই পর্য্যন্ত ১২ লাইন প্রিয়নাথ সিংহ লিখিত।

† শ্রীউপেন্দ্রনাথ (মুখোপাধ্যায়) ঠাকুরের ভক্ত ও 'বসুমতী'র স্বত্বাধিকারী।

‡ শ্রীঅক্ষয়কুমার (সেন) ঠাকুরের ভক্ত ও কবি। ইনিই "শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ-পুঁথি" লিখিয়া চিরস্মরণীয় হইয়াছেন। বাঁকুড়া জেলার অন্তঃপাতী ময়নাপুর গ্রাম ইঁহার জন্মভূমি।

গান।

(৩) এসেছেন এক ভাবের ফকির।
(ও সে) হিঁদুর ঠাকুর, মুসলমানের পীর॥

গিরিশ প্রণাম করিয়া বিদায় গ্রহণ করিলেন। ঠাকুরও গিরিশকে নমস্কার করিলেন।

দেবেন্দ্রাদি ভক্তেরা ঠাকুরকে গাড়ীতে তুলিয়া দিলেন।

দেবেন্দ্র বৈঠকখানার দক্ষিণে উঠানে আসিয়া দেখেন যে, তক্ত-পোষের উপর তাঁহার পাড়ার একটী লোক এখনও নিদ্রিত রহিয়াছেন। তিনি বলিলেন, 'উঠ, উঠ'। লোকটী চক্ষু মুছতে মুছতে উঠে বলছেন, 'পরমহংসদেব কি এসেছেন ?' সকলে হো হো করিয়া হাসিতে লাগিলেন। * * *

ঠাকুর আনন্দে গাড়ীতে যাইতেছেন।*

* শ্রীম—কথিত শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণকথামৃত, ৩য় ভাগ—দ্রষ্টব্য।

পঞ্চদশ পরিচ্ছেদ

দেবেন্দ্রনাথের সপরিবারে ঠাকুরের নিকট দক্ষিণেশ্বর গমন।

"এই ঘটনার অল্পদিন পরে একদিন মজুমদার মহাশয়, বাড়ীর স্ত্রীলোকদের লইয়া দক্ষিণেশ্বরে গমন করিলেন। যাইবার সময় তাঁহার মাতাঠাকুরাণী তাঁহাকে বলিলেন, "বাবা, সেখানে বিষ্ণু-মন্দির আছে পাঁচ পো বাতাসা কিনে নিয়ে চল, তোমার অসুখের সময় মানসিক ক'রে রেখেছিলুম, হরির লুট দিতে হবে।" দেবেন্দ্র, রামকৃষ্ণদেবের জন্য যাহা ক্রয় করিলেন, তাহার সহিত বাতাসাও লইলেন। সমস্ত জিনিষ পুঁটুলি বাঁধিয়া গাড়ীতে উঠিলেন।

দক্ষিণেশ্বরে উপস্থিত হইয়া দেবেন্দ্রনাথ ঘরের মধ্যে প্রবেশ করিলেন। রামকৃষ্ণদেব ছোট তক্তপোষে বসিয়া ছিলেন, উঠিয়া কহিলেন "এঁদের এনেছ, বেশ করেছ"—এই বলিয়া মজুমদার মহাশয়ের মাতার হাত ধরিয়া আপনার তক্তপোষের উপর বসাইলেন। ইতিমধ্যে দেবেন্দ্রনাথ পুঁটুলিগুলি উত্তর দিকের তাকের উপর রাখিয়া তৎপরে রামকৃষ্ণদেবের পদধূলি গ্রহণ করিলেন।

দেবেন্দ্রের মাতা প্রণাম করেন নাই।

তাঁহার পত্নীও পদধূলি গ্রহণ করিয়া নীচে মেজের উপর বসিলেন। মজুমদার মহাশয়ের মাতা এতক্ষণ প্রণাম করেন নাই, কারণ, আজ তাঁহাকে দেখিবামাত্র বড়ই ছেলেমানুষ বলিয়া

মনে হইয়াছিল। সে দিন নিজের বাটীতে তেমন নজর করিয়া দেখিবার পূর্ব্বেই সাধু-জ্ঞানে অগ্রে প্রণাম করিয়াছিলেন। আজ স্পষ্ট দেখিলেন, ইনি নেহাৎ ছেলেমানুষ, যেন তাঁহার ছেলের মত, এত কম বয়স, কাজেই ভাবিলেন, প্রণাম করিলে পাছে তাঁহার অকল্যাণ করা হয়, তাই এতক্ষণ প্রণাম করেন নাই। কিন্তু সকলে যখন তাঁহাকে প্রণাম করিয়া ফেলিলেন, তখন আবার তাঁহার মনে হইল, 'বয়সে ছোট হলে কি হবে? সাধু যে, আমার প্রণাম করা উচিত!'

এইরূপ ভাবিতেছেন, অমনি রামকৃষ্ণদেব মস্তক অবনত করিয়া তাঁহার পদধূলি গ্রহণ করিলেন। দেবেন্দ্রের মাতা, সাধু তাঁহাকে প্রণাম করিতেছেন দেখিয়া, পা দুটি সরাইয়া লইয়া স্বয়ং তাঁহাকে প্রণাম করিয়া পদধূলি গ্রহণ করিলেন। তাহার পর রামকৃষ্ণদেব দেবেন্দ্রকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন, "দেখ, এঁরা বড় নির্ম্মল, বড় ভাল। তা এত রদ্দুরের সময় এসেছ, ঐখানকে (মাতাঠাকুরাণীর নিকট) নিয়ে যাও। সেখানে গিয়ে এঁরা একটু জিরুন।" মাতাঠাকুরাণীর নিকট পুরুষমানুষ নাই, সেখানে একটু স্বাধীনভাবে বসিয়া আরাম করিতে পারিবেন, তাই তাঁহাদের নহবৎখানায় মাতাঠাকুরাণীর নিকট পাঠাইয়া দিলেন।

মাতার হরিরলুটের বাতাসা গ্রহণ।

এ দিকে তাঁহারা চলিয়া গেলে কিছুক্ষণ পরে রামকৃষ্ণদেব বেহারী নামক জনৈক ভক্তকে বলিলেন, "দেখ, বাতাসা খেতে বড় ইচ্ছে হচ্ছে।" এই কথা শুনিয়া বেহারী বাতাসা ক্রয় করিয়া আনিতে গেলেন। দেবেন্দ্রনাথ বাতাসা আনিয়াছেন, কিন্তু তাঁহার মাতা হরির লুট দিবেন, পরমহংসদেবকে তাহা দিবার

তাঁহার সংকল্প নাই। মাতার সম্মতি ব্যতিরেকে সেই বাতাসা দেবেন্দ্রনাথ রামকৃষ্ণদেবকে দিতে পারেন না। মজুমদার মহাশয় ইত্যাকার চিন্তা করিতেছেন, এমন সময় রামকৃষ্ণদেব আসন পরিত্যাগ করিয়া ঘরের মধ্যে এদিক ওদিক বেড়াইয়া তাকগুলি খুঁজিতে লাগিলেন। অবশেষে দেবেন্দ্রনাথ উত্তরদিকের তাকের উপর যে পুঁটুলিগুলি রাখিয়াছিলেন, সেইগুলিতে হাত দিয়া অনুভব করিয়া সেগুলি লইয়া আপনার বসিবার স্থানে আসিয়া উপবিষ্ট হইলেন, এবং পুঁটুলি খুলিয়া দেখিলেন, তাহার মধ্যে অনেক বাতাসা রহিয়াছে। অমনি কহিলেন, "ওরে, এ ছোঁড়া কি বোকা! এই এখানে এত বাতাসা আছে, আর সে কি-না এই রোদ্দুরে বাজার থেকে গেল বাতাসা কিনে আন্‌তে? ওরে, দেখ্, দেখ্, সে কতদূর গেল। তাকে ফিরে আস্‌তে বল্, বল্—বাতাসা পাওয়া গেছে।" এই বলিতে বলিতে বাতাসা লইয়া খাইতে লাগিলেন।

মজুমদার মহাশয়ের মাতা ইতিমধ্যে মাতাঠাকুরাণীর সঙ্গে আলাপের পর বাতাসাগুলি লইয়া হরির লুট দিবার জন্য রামকৃষ্ণদেবের ঘরে প্রবেশ করিয়া দেখেন, রামকৃষ্ণদেব তাঁহার বাতাসাগুলি খাইতেছেন। শ্রীশ্রীমাতাঠাকুরাণীর সহিত কথোপকথন করিয়া কি এক অপূর্ব্ব ভাবে অনুপ্রাণিত হইয়া আসিয়াছেন যে, রামকৃষ্ণদেবকে হরির লুটের বাতাসা খাইতে দেখিয়া তাঁহার প্রাণ-মন বিগলিত হইয়া গেল। দেবেন্দ্রনাথ, মাতার মুখের ভাব দেখিয়া কহিলেন, "আমি দিই নি মা, উনি আপনি খুঁজে পেতে নিয়ে খাচ্ছেন।"

দেবেন্দ্রের মাতা বলিলেন, "তা ঠিকই হয়েছে। হরি স্বয়ং হরির লুট গ্রহণ করেছেন। বড় সৌভাগ্যের কথা—উনি আপনার জিনিস আপনি নিয়ে খাচ্ছেন।"

রামকৃষ্ণদেব দুই চারিখানি বাতাসা মাত্র খাইয়া বাকীগুলি সরাইয়া দিলেন। দেবেন্দ্রনাথের মাতা অমনি আসিয়া গললগ্নীকৃতবাসে রামকৃষ্ণদেবের পদধূলি লইলেন; এবং তৎপরে বাতাসাগুলি লইয়া উপস্থিত সকলকে প্রসাদ বণ্টনানন্তর কতকগুলি আপনার অঞ্চলে বাঁধিয়া রাখিলেন। সন্ধ্যার পূর্ব্বে সকলে অল্প-স্বল্প প্রসাদ পাইয়া বিদায় লইলেন।

বাটী আসিয়া ঠাকুর সম্বন্ধে কথা—'আহা, কিরূপই দেখে এলুম'!

বাটী আসিয়া দেবেন্দ্রনাথের পত্নী দেওয়ালে টাঙ্গান রামকৃষ্ণদেবের ফটোগ্রাফখানির প্রতি অঙ্গুলি-প্রয়োগ করিয়া আপনার স্বামীকে কহিতে লাগিলেন, "হাঁগা, তুমি এ কি ডাকাতে ছবি এনে রেখেছ? এ কি ছাই ছবি হয়েছে। আহা, কি রূপই দেখে এলুম। ম'রে গেলেও ও-রূপ আর ভুল্‌তে পার্‌বো না।" মজুমদার মহাশয়ের মাতাঠাকুরাণীও ইতিমধ্যে আসিয়া সেই গৃহে প্রবেশ করিলে, দেবেন্দ্র-পত্নী একটু ঘোম্‌টা টানিয়া অল্পদূরে সরিয়া গেলেন।

দেবেন্দ্রের মাতা ঘরে প্রবেশকালে পুত্রবধূর কথা শুনিয়াছিলেন, তিনিও তাঁহার কথার অনুমোদন করিয়া কহিতে লাগিলেন, "হাঁ বাবা, বৌমা ঠিক কথা বলেছে। সে কি রূপ! যে দেখে এলুম বাবা, তা আর তোমায় কি বলব! এ ছবিতে কি তার এতটুকু নেই! এ দূর ক'রে গঙ্গার জলে টেনে ফেলে দাও। বাছার রূপ দেখে প্রাণ জুড়িয়ে গেছে। তাঁর স্ত্রীরও বা কি রূপ, কি ছেদ্দা, ভক্তি, আর কি কথাবার্ত্তা, তোমায় বাবা, তার কি জানাব! এমন স্ত্রীলোক তো কখন দেখিনি। যেন সাক্ষাৎ মা ভগবতী, কৈলাস থেকে এসেছেন। আমি ত বাবা, তাঁকে বৌমা ব'লে ফেলেছি।"

দেবেন্দ্রনাথের পরিবারবর্গ তদবধি আর ইহজীবনে রামকৃষ্ণদেবের কথা কহিয়া ফুরাইতে পারিলেন না ; সে দিন সমস্ত রাত্রি ঐ প্রসঙ্গই চলিল।

দেবেন্দ্রনাথের অভিনব স্বপ্নকথা।

দেবেন্দ্রনাথ মনে করেন, রামকৃষ্ণদেব তাঁহারই মত একজন মানুষ, তবে খুব উন্নত। ধর্ম্মপথে উন্নতি করিতে করিতে আশা করেন, তিনিও শীঘ্রই তাঁহার মত হইতে পারিবেন। কিন্তু দিন দিন যতই মনে করেন, তাঁহার নিকটবর্ত্তী হইতেছেন, ততই দেখেন যে, একটু বাকী আছে। একদিন এক অভিনব স্বপ্ন দেখিয়া মনে বড় লজ্জার উদয় হইল। স্বপ্নে দেখিলেন, যেন তিনি স্ত্রীলোক এবং রামকৃষ্ণদেবের পত্নী। কাজেই এমন অদ্ভুত স্বপ্ন দেখিলে লজ্জা হইবারই কথা।

এই ঘটনার পর একদিন রামকৃষ্ণদেবের নিকট যাইয়া প্রণাম করিয়া বসিলেন, কিন্তু তাঁহার প্রতি মুখ তুলিয়া চাহিতে পারিতেছেন না, এতই লজ্জায় অভিভূত। রামকৃষ্ণদেব দেবেন্দ্রনাথের ভাব দেখিয়া একটু মুচ্‌কিয়া হাসিতে হাসিতে জিজ্ঞাসা করিলেন, "কি গো, আজ যে কি রকম দেখছি, মুখ তুলে চাও না কেন ? কি হয়েছে ? ব্যাপারটা কি ?"

রামকৃষ্ণদেব যত জিজ্ঞাসা করিতেছেন, দেবেন্দ্রনাথ ততই লজ্জায় ঘাড় হেঁট করিতেছেন। অথচ এ প্রকার অসম্ভব স্বপ্নের মানে কি, তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিবার জন্যই আসিয়াছেন, কেবল লজ্জায় মুখে কথা সরিতেছে না। অবশেষে বারম্বার জিজ্ঞাসিত হইয়া ঘাড় হেঁট করিয়াই দুই এক কথায় স্বপ্নের বৃত্তান্ত বলিলেন। রামকৃষ্ণদেব ঐ কথা শুনিবামাত্র গম্ভীরভাবে বলিতে লাগিলেন, "বটে বটে, বড় ভাগ্যের কথা ; এ রকম স্বপ্ন দেখা বড় ভাগ্যের কথা।" এই বলিয়া একটু চুপ করিয়া

থাকিয়া আবার কহিতে লাগিলেন, "কি জান, তোমার গোপীভাব কি-না, তাই ও রকমটা স্বপ্নে দেখেছ। বড় সৌভাগ্যের কথা। ও রকম স্বপ্ন হ'লে, কামটামগুলো ক্রমে মন থেকে চ'লে যায়।"

দেবেন্দ্রনাথ এতদিনে নিজের ভাব বুঝিলেন। পূর্ব্বে এত সাধন-ভজন করিয়াও যে কিছুই হয় নাই, এবং সেই জন্যই যে রামকৃষ্ণদেব বলিয়াছিলেন, "দেখ, তুমি অনেক করেছ, কিন্তু থাপে থাপে লাগেনি।" দেবেন্দ্রনাথ এ কথারও মানে এখন বুঝিতে পারিলেন। সে দিন দেবেন্দ্র গাড়ু বহিয়া লইয়া যাওয়াতে রামকৃষ্ণদেব দন্তে জিহ্বা কাটিয়া বলিয়াছিলেন, "ওগো, তোমার সঙ্গে আমার ও ভাব নয়"—ইহারও আভাষ বোধ হয় পাওয়া গেল।*

* এই ঘটনাটী প্রিয়নাথ সিংহ লিখিত, উদ্বোধন—জ্যৈষ্ঠ, ১৩৩৪।

ষোড়শ পরিচ্ছেদ

সন্ন্যাস গ্রহণের বাসনা।

অন্তর্দৃষ্টিসম্পন্ন ঠাকুর তাঁহার ভক্তদিগের স্বভাব সম্বন্ধে অনেক কথ বলিতেন। কাহাকে বলিতেন "ও অখণ্ডের ঘর", কাহাকে "উঃ সাকারের ঘর" এবং কাহাকেও বা "বৃন্দাবনের লোক" ইত্যা ইত্যাদি। একদিন দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের ঘরে প্রবেশ করিয়া শুনিতে পাইলেন ঠাকুর তাঁহার সম্বন্ধে কতগুলি স্ত্রীলোক ভক্তকে কি বলিতেছেন। দেবেন্দ্রনাথকে সহসা উপস্থিত দেখিয়া ঠাকুর বলিলেন,— "তুমি একজন বড় কম নও, দেখলুম—আজ সকালে দেখলুম……

ঠাকুরকে কথা শেষ করিতে না দিয়া দেবেন্দ্রনাথ বলিলেন, "যা দেখেছেন আপনিই দেখেছেন, ওকথা কাহাকেও বলিবার দরকার নাই।" পাছে নিজের সুখ্যাতি শুনিলে অহঙ্কার বৃদ্ধি হয়, এই ভয়ে দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের বাক্য সমাপ্ত হইতে দেন নাই। নাম যশের আকাঙ্ক্ষা তাঁহার কখনও ছিল না; বাস্তবিক তাঁহার মত নিরহঙ্কার মাটীর মানুষ খুব কমই দেখিতে পাওয়া যায়।

সন্ন্যাসের জন্য ঠাকুরের চরণে পতিত।

শ্রীশ্রীপরমহংসদেবের কৃপায় এবং তাঁহার দিব্য সঙ্গলাভে দেবেন্দ্রনাথের আবাল্যসঞ্চিত বৈরাগ্যের ভাব পুনরায় প্রবল হইয়া উঠিল। তিনি বুঝিলেন সংসার অনিত্য এখানে বিমল শান্তি ও আনন্দ লাভ করা এক প্রকার অসম্ভব। মায়া-মোহে বদ্ধ

হইয়া সংসার করিতে দেবেন্দ্রনাথের ইচ্ছা হইল না। সন্ন্যাস গ্রহণের অনুমতি পাইবার জন্য ঠাকুরের চরণে পতিত হইয়া দেবেন্দ্রনাথ তাঁহাকে স্বীয় অন্তরের বাসনা নিবেদন করিলেন।

উত্তরে ঠাকুর গান ধরিলেন।

ঠাকুর জানিতেন দেবেন্দ্রনাথ তাঁহার জননীর স্নেহের সন্তান। বিনা মেঘে বজ্রাঘাতের ন্যায় জ্যেষ্ঠ পুত্রকে অকালে হারাইয়া তিনি কনিষ্ঠকে অবলম্বন করিয়া সংসারে রহিয়াছেন। দেবেন্দ্রনাথ যদি সন্ন্যাসী হইয়া গৃহত্যাগ করেন, তাহা হইলে তাঁহার জননীর ক্ষোভের সীমা থাকিবে না। তদুপরি দেবেন্দ্রনাথ বিবাহিত, তাঁহার সাধ্বী স্ত্রীরও একটা উপায় চাহি। ঠাকুর দেবেন্দ্রনাথকে সন্ন্যাস-গ্রহণের অনুমতি না দিয়া গান ধরিলেন,—"কেন নদে ছেড়ে সোনার গৌর······অকুলে ডুবাবি।"

'তোমায় সংসার ত্যাগ করতে হবে না।'

ঠাকুর দেবেন্দ্রনাথকে মাটী হইতে উঠাইয়া সান্ত্বনা দিতে দিতে বলিলেন,—"তোমায় সংসার ত্যাগ কর্‌তে হবে না। আমি বল্‌ছি ঘরে থাক।"

অক্ষয় মাষ্টার মহাশয় তাঁহার পুঁথিতে 'দেবেন্দ্র- ব্রাহ্মণে'র ঠাকুরের নিকট সন্ন্যাস কামনার বিষয়টী অতি সুন্দরভাবে চিত্রিত করিয়া গিয়াছেন, পাঠকগণের জ্ঞাতার্থে আমরা তাহা নিম্নে উদ্ধৃত করিলাম—

"মহাভাগ্যবান্‌ এই দেবেন্দ্র-ব্রাহ্মণ।
প্রভুর কৃপায় কত দিব্য-দরশন॥
ভাবানন্দে মগ্ন মন রহে নিরন্তর।
সংসারে থাকিতে লাগে গায়ে মহা জ্বর॥

পরিহরি গৃহবাস সন্ন্যাস কামনা।
তাহায় শ্রীরায় দেন বারংবার হানা॥
দিনেকে দারুণ ক্ষেদ মর্ম্ম দুঃখ যুত।
দণ্ডবৎ লম্বমান্ শ্রীপদে পতিত॥
করদ্বয়ে পদদ্বয় করিয়া ধারণ।
আর্ত্তনাদে উচ্চৈঃস্বরে কাঁন্দেন ব্রাহ্মণ॥
ভক্তের অন্তর বুঝি প্রভু ভগবান্।
আপনার ভাবে তবে ধরিলেন গান॥
ভাবে রসে গীতখানি সুন্দর কেমন।
যেমন অবস্থা গত তাহার মতন॥

গীত

কেন নদে ছেড়ে সোনার গৌর দণ্ডধারী হরি।
ও তোর ঘরে বধূ বিষ্ণুপ্রিয়া তার দশা কি করিবি।
একে বিশ্বরূপের শোকে,
শক্তিশেল রয়েছে বুকে,
তুইও কি অভাগী মাকে অকুলে ডুবাবি॥

উঠাইয়া শ্রীদেবেন্দ্রে বিশ্ব-গুরু কন,
শ্রীবাসাদি গৌরাঙ্গের যত ভক্তগণ॥
কোন অংশে নহে কম সন্ন্যাসীর চেয়ে।
বলিতেছি রহ ঘরে কি কাজ ছাড়িয়ে॥
মহামন্ত্র-রূপ বাক্যে সান্ত্বনা প্রভুর।
শুনিয়া সুস্থির চিত্ত দেবেন্দ্র ঠাকুর॥" *

* শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ পুঁথি

পরে একদিন ঠাকুর দেবেন্দ্রনাথের জিহ্বাতে অঙ্গুলী দ্বারা কি লিখিয়া দিয়াছেন। এ সম্বন্ধে দেবেন্দ্রনাথ আমাদের বলিতেন, ঠাকুর তাঁহার জিহ্বাতে কি লিখিয়া দিয়াছেন, তাহারই ফলে তিনি বিন্দুমাত্র ক্লেশ অনুভব না করিয়া অনবরত দীর্ঘকাল ধরিয়া ভগবৎ প্রসঙ্গে আলাপ করিতে পারিতেন।

গৃহী হইয়াও ভগবৎ আনন্দলাভ।

শ্রীশ্রীঠাকুর কোন্ কার্য্য কি অভিপ্রায়ে করেন, তাহা তিনিই জানেন, আমাদের বোধ হয় সংসার-সন্তপ্ত মানবগণের কল্যাণার্থ দেবেন্দ্রনাথের জন্য তিনি এইরূপ বিধান করিয়াছিলেন। সংসারে অনাসক্তভাবে থাকিয়া কিরূপে ভগবানে মতি স্থির রাখিতে হয়, তাহা দেবেন্দ্রনাথকে যাঁহারা দেখিয়াছেন ও তাঁহার সহিত ঘনিষ্টভাবে মিশিয়াছেন, তাঁহারা কতকটা বুঝিতে পারিয়াছেন। গৃহী হইয়াও যে, ভগবানের কৃপালাভ করিয়া নিরবচ্ছিন্ন ভগবৎ আনন্দলাভ করা যায়, তাহার অন্যতম দৃষ্টান্ত দেবেন্দ্রনাথ।

শ্রীশ্রীঠাকুরের কৃপালাভে দেবেন্দ্রনাথের হৃদয়ের সমস্ত দুঃখ, সংশয় ও অশান্তি বিদূরিত হইয়াছিল। আপনাকে লীলাসহচর জ্ঞানে মহানন্দে ভগবৎ-প্রেম-সুধা আস্বাদন করিতে লাগিলেন। দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের এই সময়কার নানা অপূর্ব্ব ঘটনা বর্ণনা করিতে করিতে কত সময় আহ্লাদে মাতিয়া উঠিতেন। কখন বা বলিতেন, "ঠাকুর সব কথাই কি মুখে প্রকাশ করিতেন? ঠারে ঠোরে ইঙ্গিতে কত তত্ত্বকথা বলিতেন। কখনও বা ঊর্দ্ধদিকে কখনও বা বক্ষদেশে অঙ্গুলি নির্দ্দেশ করিয়া পূর্ব্ব পূর্ব্ব লীলা জ্ঞাপন ও স্মরণ করাইয়া দিতেন।

এই সুন্দর লীলাকথা বলিতে বলিতে পরে আমরা দেখিয়াছি, দেবেন্দ্রনাথ গভীর নিস্তব্ধতা মধ্যে ডুবিয়া যাইতেন। এই ভাবে বহুক্ষণ চলিয়া যাইত। কেহ তাঁহার নিকটে যাইতে বা কোন কথা জিজ্ঞাসা করিতে সাহস পাইত না। পরে যখন সহজভাবে আসিতেন ও কথা কহিতে থাকিতেন, তখন মনে হইত যেন এতক্ষণ কাহারও সঙ্গে বাক্যালাপে নিযুক্ত ছিলেন। ভাবাবস্থার সহিত এরূপ অবস্থার কিঞ্চিৎ বৈষম্য দৃষ্ট হইত। ভাবের আকর ঠাকুরের নিকট হইতে কত ভাবই দেবেন্দ্রনাথ লাভ করিয়াছিলেন!

অনেক সময় আত্মহারা হইয়া দেবেন্দ্রনাথ বলিতেন, "আমার যা কিছু, সবই ঠাকুর—সবই ঠাকুর। তা ছাড়া কিছুই দেখি না"!—প্রেমিকের দৃষ্টিতে জগৎ তখন প্রেমময়—ঠাকুরময়!

সপ্তদশ পরিচ্ছেদ

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণদেব কল্পতরু—অন্ত্যলীলা।

এই অনিত্য নশ্বর জগতের ধর্ম্ম—কিছুই চিরদিন এক অবস্থায় থাকিবার নহে। চিরদিন সমানে যায় না—প্রেমময়ের এই আনন্দের লীলা—এই মর্ত্তলীলা অধিক দিন এক ভাবে গেল না; তাই শ্রীরামকৃষ্ণদেব আপন দেহলীলা সম্বরণ করিবার আয়োজন করিতে লাগিলেন। দেবেন্দ্রনাথের বাড়ীতে আহারের সময় ঠাকুর ইহার আভাষ জানাইয়াছিলেন। আহার করিতে যাইয়া বলিয়াছিলেন—"আর লুচি খাব নাই"। দেবেন্দ্রনাথের বাড়ীতে কুল্পী বরফ খাওয়ার পর হইতেই শ্রীশ্রীঠাকুর গলদেশে একটু বেদনা অনুভব করিতে থাকেন এবং তদবধি আর লুচি খাইতে পারেন নাই।

শ্রীশ্রীঠাকুর রোগে আক্রান্ত—দেবেন্দ্রনাথের সেবা।

মাহেশের রথলীলা দর্শনান্তে ফিরিবার মুখে ঠাকুরের গলদেশের বেদনা অত্যন্ত বৃদ্ধি পায় এবং পরদিন হইতে রক্তস্রাব আরম্ভ হয় ও ঠাকুর ক্রমশঃ শয্যাগত হইয়া পড়েন। দেবেন্দ্রনাথ এই সময়ে ঠাকুরকে ঘন ঘন দেখিতে যাইতে লাগিলেন এবং ক্ষুণ্নমনে ভক্তগণের সহিত প্রতীকারের পরামর্শাদি করিতেন; অধিকন্তু, দরিদ্র হইলেও গুরুসেবার জন্য সকলের সঙ্গে সাধ্যমত ব্যয়ভার বহন করিয়াছিলেন।

"ব্যয়ভার যত হয় সকলে যোগান।
নরেন, সুরেন্দ্র মিত্র, বসু বলরাম॥

হরিশ মুস্তফী, নবগোপাল, কেদার।
চাঁই ভক্ত রামদত্ত, মহেন্দ্র মাষ্টার ॥
কালীপদ, দেবেন্দ্র-ব্রাহ্মণ ভক্তগণ।
এবে যাঁরা সন্ন্যাসীরা বালক তখন ॥"*

রোগাক্রান্ত হইয়া শ্রীশ্রীঠাকুর ডাক্তার মহেন্দ্রলাল সরকারের চিকিৎসাধীনে ছিলেন। তাঁহারই পরামর্শানুসারে সকলের সুবিধার জন্য ঠাকুরকে কাশীপুরের এক বাগান-বাড়ীতে আনিয়া রাখা হয়। ঠাকুর দ্বিতলে বাস করিতেন, শ্রীশ্রীমাতা ঠাকুরাণী পার্শ্বের ঘরে থাকিতেন এবং ভক্তগণ নীচের তলায় থাকিয়া ঠাকুরের সেবাশুশ্রূষা করিতেন। এই সময়—ইংরাজী ১৮৮৬ সালের ১লা জানুয়ারী শ্রীরামকৃষ্ণদেব "কল্পতরু" হন।

শ্রীরামকৃষ্ণ কল্পতরু।

"প্রভুর প্রতিজ্ঞা ছিল শুন বিবরণ।
হাটেতে ভাঙ্গিব হাঁড়ি যাইব যখন ॥
সেই হাঁড়ি-ভাঙ্গা-রঙ্গ আজিকার দিনে।
কি ভাবে ভাঙ্গিলা হাঁড়ি শুন একমনে ॥

*　　　*　　　*

"অন্তরঙ্গ ভক্ত তার দেবেন্দ্র ব্রাহ্মণ।
দ্বিতলে ডাকিয়া তাঁয় প্রভুদেব কন ॥
স্থিরতর কর কথা তোমরা সকলে।
রাম কি কারণে মোরে অবতার বলে ॥"*

* শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ পুঁথি।

দেবেন্দ্রনাথ বলিতেন,—"এই অবতার-সম্বন্ধীয় প্রশ্নের মর্ম্ম আমরা কি বুঝিব? ঠাকুর নিজেই ইহার মর্ম্মার্থ পরে প্রকটিত করিলেন। বৈকালবেলা আপনি 'কল্পতরু' হইয়া বসিলেন। একে একে সকলকে দ্বিতলে ডাকিয়া কৃপা করিতে লাগিলেন। তাহাতে দয়াময় প্রভু তৃপ্ত না হইয়া নীচে নামিয়া বাগানে বেড়াইতে লাগিলেন এবং আপনি যাচিয়া যাচিয়া সকলকে কৃপা করিতে লাগিলেন। কাহার বক্ষ, কাহার মস্তক স্পর্শ করিলেন। কাহারও কাণে কাণে কি বলিলেন।" ইত্যাদি ইত্যাদি।

রুগ্ন ঠাকুরের সেই দিনের অপরূপ রূপ বর্ণন করিতে যাইয়া দেবেন্দ্রনাথ আত্মহারা হইতেন। অতিরিক্ত হইলেও ঠাকুরের এই সময়কার অপূর্ব্ব দৃশ্যের বর্ণনা "শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ পুঁথি" হইতে উদ্ধৃত করিবার লোভ আমরা সম্বরণ করিতে পারিলাম না।

"আজি মনোহর বেশ প্রভুর আমার।
বারেক দেখিলে কভু নহে ভুলিবার॥
পরিধান লালপেড়ে সূতার বসন।
গায়ে বনাতের জামা সবুজ বরণ॥
সেই কাপড়ের টুপি কর্ণমূল ঢাকা।
মোজা পায়ে চটি জুতা লতাপাতা আঁকা॥
শ্রীঅঙ্গের মধ্যে খোলা বদনমণ্ডল।
কান্তিরূপে লাবণ্যেতে করে ঝলমল॥
দারুণ বিয়াধিভোগে শীর্ণ কলেবর।
কিন্তু বয়ানেতে কান্তি বহে নিরন্তর॥
মনে হয় অঙ্গবাস সব দিয়া খুলি।
নয়ন ভরিয়া দেখি রূপের পুতুলি॥

হঠাৎ দাঁড়ায়ে পথে শ্রীগিরীশে কন।
তোমরা কি দেখ মোরে, কিবা লয় মন॥
গিরীশ পাতিয়া জানু বসি' পাদমূলে।
করযোড়ে সম্ভাষিয়া প্রভুদেবে বলে—
'আমি ছার কি বলিব আপনার কথা।
শুক ব্যাস বিবরণে পরাভব যেথা' ॥" *

যুগপৎ আনন্দে ও দুঃখে বিহ্বল দেবেন্দ্রনাথ আত্যন্ত প্রভুর স থাকিয়া এই দিনের সমস্ত ব্যাপার দর্শন করিলেন। এইভা শ্রীশ্রীঠাকুরের সঙ্গে অন্ত্যলীলা উদ্বিগ্নচিত্তে সম্ভোগ করিতে লাগিলেন

"ঠাকুর আমার চিন্ময়"।

ঠাকুর এই সময় আপন অন্তরঙ্গ ভক্তগণকে ডাকিয়া পৃথ ভাবে গোপনে 'ব্রহ্মজ্ঞান তত্ত্বকথা' বলিতেন। দেহত্যাগের ত পূর্ব্বে একদিন দেবেন্দ্রনাথকে ডাকিয়া বলিয়াছিলেন—"দেখ আমার কেন এখন সর্ব্বদা ব্রহ্মভাবের উদ্দীপনা হচ্ছে—কেব সপ্তমের ঘরে সমাধিস্থ হয়ে থাকিতে প্রবল বাসনা হচ্ছে"? ঠাকু ব্যাধির জন্য দেবেন্দ্রনাথের এত ভাবনা, কিন্তু তাঁহার শ্রীমুখের ব শ্রবণমাত্র সকলই কোথায় ভাসিয়া যাইত! তাই তিনি বলিতে "ঠাকুর আমার **চিন্ময়**! তাঁহার অন্তরে ব্যাধির কোন পরি কখনও আমরা পাই নাই। তিনি নিত্য-নির্ব্বিকার!"

শ্রীশ্রীঠাকুর তদীয় ভক্তগণকে ধর্ম্মসমন্বয়ের একতাসূত্রে আ করিয়া ১২৯৩ সালের ৩১শে শ্রাবণ, ইং ১৮৮৬ সালের ১৫ই আ রবিবার রাত্রি ১টার সময় নিত্যধামে প্রস্থান করিলেন।

---

* শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ পুঁথি।

অষ্টাদশ পরিচ্ছেদ

শ্রীশ্রীঠাকুরের অদর্শনে।

(ইং ১৮৮৬—৯১)

পরদিন দ্বিপ্রহরের পর ডাক্তার মহেন্দ্রলালের অভিপ্রায় অনুসারে ঠাকুরের ভক্তমণ্ডলী-পরিবৃত তিরোভাবের একটী শেষ ফটো তোলা হয়। ইহাতে দেবেন্দ্রনাথ শোকসন্তপ্তচিত্তে দণ্ডায়মান রহিয়াছেন দেখিতে পাওয়া যায়।

ঠাকুরের অদর্শনে দেবেন্দ্রনাথ আপনাকে অতিশয় অসহায় মনে করিতে লাগিলেন। ঠাকুরের বিচ্ছেদ তাঁহার অসহ্য বোধ হইতে লাগিল। সহসা যেন জীবনের সমস্ত সুখ-শান্তি নিমিষের মধ্যে কোথায় অন্তর্হিত হইয়া গেল! যিনি তাঁহার অশান্ত জীবনে শান্তি আনিয়া দিয়াছেন, যাঁহাকে দেখিলে তাঁহার আনন্দের সীমা থাকিত না, যিনি তাঁহার হৃদয়ের আরাধ্য দেবতা এবং যিনি তাঁহার আপন হইতেও আপনার, তাঁহার বিরহ সহ্য করা দেবেন্দ্রনাথের পক্ষে অসম্ভব হইল। তিনি প্রাণত্যাগে কৃতসঙ্কল্প হইলেন।

দেবেন্দ্রনাথের গঙ্গাজলে প্রাণবিসর্জ্জনের চেষ্টা ও স্বামীজির বাধা।

দুই এক দিন পরে কাশীপুর বাগান হইতে গুরুভ্রাতৃগণের সহিত গঙ্গায় স্নান করিতে যাইয়া গঙ্গাজলে দেবেন্দ্রনাথের প্রাণবিসর্জ্জনের ইচ্ছা বড় বলবতী হইল। স্বামী বিবেকানন্দ তাঁহার সংকল্প বুঝিতে পারিয়া স্নানের সময় দেবেন্দ্রনাথের হস্ত ধারণ করিয়া বলিলেন,—"তা হবে না দেবেনবাবু, তুমি এইখানেই ডুব দাও, আমি তোমার হাত

ধরিয়া থাকি।” স্বামীজি দেবেন্দ্রনাথের হাত ধরিয়া সঙ্গে সঙ্গে ঘরে আনিলেন এবং তাঁহাকে সান্ত্বনা দান করিতে লাগিলেন।

শ্রীশ্রীঠাকুরের দেহত্যাগের পর ত্যাগী ভক্তগণ অতি স্বল্পদিন মাত্র কাশীপুর-বাগানে ছিলেন। পরে ভক্তপ্রবর শ্রীযুত সুরেশচন্দ্র মিত্র মহাশয়ের আগ্রহে বরাহনগরে মঠ স্থাপিত হয়। তথায় স্বামী বিবেকানন্দ, ব্রহ্মানন্দ, রামকৃষ্ণানন্দ, শিবানন্দ, সারদানন্দ, অভেদানন্দ, প্রেমানন্দ, অদ্বৈতানন্দ প্রভৃতি সন্ন্যাসীভক্তগণ যাইয়া বাস করিতে লাগিলেন।

এদিকে, জন্মাষ্টমী দিন ঠাকুরের অস্থি ভক্তপ্রবর রামচন্দ্রের কাঁকুড়গাছি “যোগোদ্যানে” সমাধিগত হইবার পর হইতে সেখানে ঠাকুরের নিত্য-পূজা ও মাঝে মাঝে কীর্ত্তন ও উৎসব হইতে আরম্ভ হয়। ইহা ব্যতীত প্রতিদিনই প্রাতে ও সন্ধ্যার পর বাগবাজার বলরাম বাবুর বাড়ী এবং বৈকালে গিরিশ বাবুর বাড়ী ভক্তগণের সম্মেলন হইত। শ্রীশ্রীঠাকুরের অদর্শনের পর হইতে তাঁহার আশ্রিত ভক্তগণ এই চারি স্থানে মিলিত হইয়া ঠাকুরের প্রসঙ্গে নানা কথাবার্ত্তা দ্বারা অদর্শন জনিত দুঃখের লাঘব করিতেছিলেন।

দেবেন্দ্রনাথও ঠাকুরের বিরহযাতনা লাঘব করিবার নিমিত্ত এই চারি স্থানে যাতায়াত করিতে লাগিলেন। তিনি ভক্তমণ্ডলীর এক পাশে যাইয়া বসিয়া থাকিতেন এবং সকলের কথাবার্ত্তা নীরবে শ্রবণ করিতেন।

বরাহনগর মঠের সন্ন্যাসিগণ তীব্র বৈরাগ্যপূর্ণ কঠোর তপস্যায় নিযুক্ত—দিন-রাত্র জপ, ধ্যান, পাঠ ও আলোচনায় ব্যস্ত—তাঁহাদের সেই সময়কার অপূর্ব্ব দৃশ্য ঈশ্বরানুরাগী মাত্রকেই আকৃষ্ট করিত। অনেকে তথায় যাইয়া সংসার-চিন্তা ভুলিয়া যাইতেন; এমন কি, দুঃ
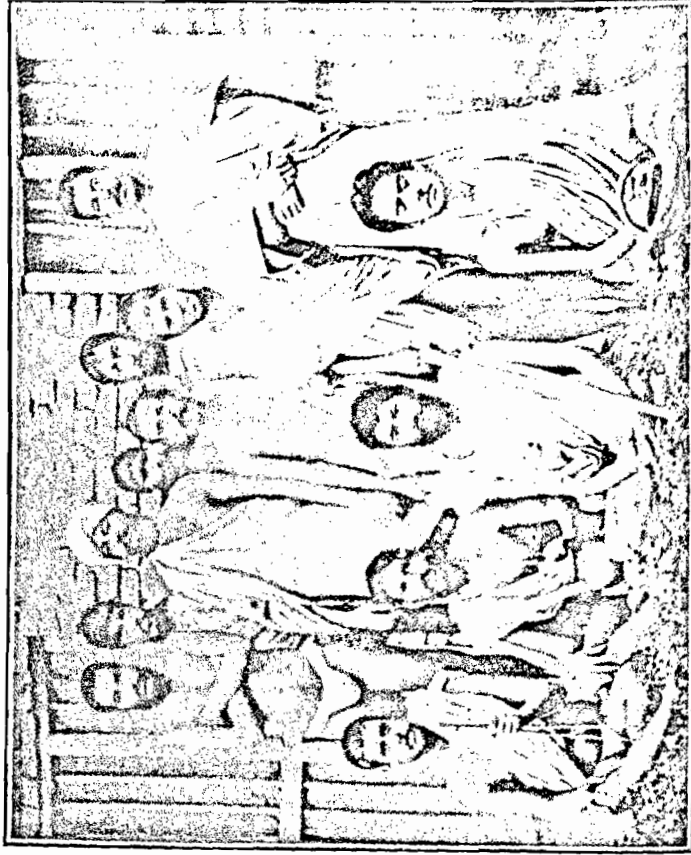
স্বামী রামকৃষ্ণানন্দ, পাচক ব্রাহ্মণ, শ্রীযুত মহেন্দ্রনাথ গুপ্ত,
...মী শিবানন্দ, স্বামী বিবেকানন্দ, দেবেন্দ্রনাথ, স্বামী ত্রিগুণাতীত, হরিশচন্দ্র মুস্তফী

একদিন তাঁহাদের সহিত রাত্রিযাপন করিতেন। দেবেন্দ্রনাথও অবকাশ পাইলেই প্রায় এই মঠে আসিয়া তাঁহার যুবক সন্ন্যাসী গুরুভ্রাতৃগণের সহিত কিছুকাল কাটাইয়া যাইতেন। পূজ্যপাদ স্বামী বিবেকানন্দের বড়ই ইচ্ছা ছিল—দেবেন্দ্রনাথ সন্ন্যাস লইয়া তাঁহাদের সহিত বাস করেন; কিন্তু ঠাকুর তাঁহাকে সন্ন্যাস লইবার অনুমতি দেন নাই বলিয়া, তিনি স্বামীজির প্রস্তাবে সম্মত হইতেন না।

বরাহনগর মঠে দেবেন্দ্রনাথের সন্ন্যাসীর সাজ।

এক দিবস দেবেন্দ্রনাথ তদীয় মাতুলের সহিত বরাহনগর মঠে আগমন করিলে, স্বামীজি তাঁহাকে সন্ন্যাস লইবার জন্য অনুরোধ করেন। দেবেন্দ্রনাথ বলিলেন,—"আমার ত ইচ্ছা করে সন্ন্যাসী হইতে, ঠাকুর দিলেন কৈ?" ইহাতে স্বামীজি তাঁহাকে ধরিয়া জোর করিয়া গেরুয়া-কৌপীন পরাইয়া, দণ্ড-কমণ্ডলু প্রভৃতিতে উত্তমরূপে নিজহস্তে সন্ন্যাসীর বেশে সাজাইয়া দেন। তৎপরে সন্ন্যাসীসকলে একত্র হইয়া ফটো তুলিয়া ছিলেন।

দেবেন্দ্রনাথ বলিতেন,—"স্বামীজি বড় শক্তিমান্ পুরুষ ছিলেন। তিনি আমাকে কৌপীন পরাইয়া দিবার সঙ্গে সঙ্গে আমার মনে তীব্র বৈরাগ্যের উদয় হইল এবং সংসারে আর ফিরিব না সঙ্কল্প করিলাম। মামাকে বলিলাম,—'আর আমি বাড়ী যাব না।' আমার কথা শুনিয়া মামার মুখ শুকাইয়া গেল। তিনি অগত্যা সেই দিনকার জন্য আমাকে বাড়ী ফিরিতে বলিলেন। বাড়ী আসিয়াও সন্ন্যাসের ঘোর কাটিল না। বাড়ীর লোকে ভয়ে কেহ আমার সহিত কথা কহিত না। কিসে আমি ভাল থাকি, সর্ব্বদা কেবল তাহারই চেষ্টা করিতে লাগিল। সন্ন্যাসের ঘোর প্রায় একমাস

পর্য্যন্ত ছিল। পরে ঠাকুরের আদেশ পুনঃ পুনঃ স্মরণ হওয়াতে আমার সন্ন্যাসের ঘোর কাটিয়া গেল এবং পূর্ব্বের ন্যায় সংসারের কাজে মন দিলাম।”

দেবেন্দ্রনাথ ও স্বামীজি কাঁকুড়গাছি যোগোদ্যান হইতে একসঙ্গে ফিরিতেছেন।

কাঁকুড়গাছি ‘যোগোদ্যানে’ ঠাকুরের সমাধিমন্দির নির্ম্মিত হইলে দেবেন্দ্রনাথ মধ্যে মধ্যে তথায় গমন করিতেন এবং সন্ধ্যার পূর্ব্বে প্রত্যাগমন করিতেন। একদিবস সন্ধ্যার পর স্বামীজি দেবেন্দ্রনাথের সহিত যোগোদ্যান হইতে ফিরিবার সময় আকাশের দিকে চাহিয়া তাঁহাকে বলিলেন, “দেখ দেবেন্ বাবু, ঐ যে আকাশে ছায়াপথ দেখিতে পাইতেছ, ওটা কি জান? ও হচ্ছে নক্ষত্রের কাদা, রাশি রাশি নক্ষত্র ওখানে পর পর আছে, এক একটা নক্ষত্র সূর্য্যের মত বা তাহা অপেক্ষা বড়। আবার এই সকল সূর্য্যের চারিদিকে আমাদের পৃথিবীর মত কত গ্রহ আছে। সুতরাং কত পৃথিবী, কত সূর্য্য আছে, বুঝিতে পারিতেছ? ভগবান্ এইরূপ অনন্ত ব্রহ্মাণ্ডের সৃষ্টি-কর্ত্তা। এমন ভগবান্‌কে কি ক্ষুদ্র মানব লাভ করিতে পারে? কত শত ইন্দ্র চন্দ্র বায়ু বরুণ যাঁহাকে অনন্তকাল ধরিয়া কৃতাঞ্জলি পুটে স্তব করিতেছে, সামান্য মানুষ তাঁহার নিকট যাইবে কি করিয়া?” স্বামীজির পূর্ব্বোক্ত কথা শুনিয়া দেবেন্দ্রনাথ ভাবিলেন,—তাও ত বটে! তুলনা করিয়া দেখিলে আমি ত একটা কীট অপেক্ষা ক্ষুদ্র, আমার দ্বারা ভগবান্‌লাভ কিরূপে সম্ভব হইতে পারে? স্বামীজির কথায় দেবেন্দ্রনাথের বুদ্ধি বিচলিত হইতে লাগিল। তিনি স্বামীজিকে গভীরভাবে তন্ময় দেখিয়া, ইহার মীমাংসা করিয়া দিতে কোন কথা তখন বলিতে সাহস করিলেন না। স্বামীজিও কিছু আর বলিলেন না।

পরদিবস গিরিশ বাবুর নিকট উপস্থিত হইয়া দেবেন্দ্রনাথ স্বামীজির কথা তাঁহাকে জানাইলে গিরিশ বাবু বলিলেন, "হ্যাঁ, এ ত ঠিক কথা,—ভগবান্ অনন্ত ব্রহ্মাণ্ডের অধীশ্বর। ঐশ্বর্য্যের দিক্ দিয়া দেখিতে গেলে মানুষের সাধ্য কি যে, সেই সর্ব্বশক্তিমান্ ভগবানের নিকট পৌঁছিতে পারে? ঐশ্বর্য্যমণ্ডিত থাকিলে ক্ষুদ্র মানব তাঁহাকে লাভ করিতে পারে না বলিয়াই, দয়াময় আমাদিগের নিকট ঠিক আমাদের মত হইয়া আসেন এবং কৃপা করিয়া আমাদের নিকট আপনাকে ধরা দেন।" গিরিশ বাবুর কথা শুনিয়া দেবেন্দ্রনাথ আশ্বস্ত হইলেন।

গিরিশ বাবুর বৈঠকখানায় দেবেন্দ্রনাথের ভাব।

একদিন দেবেন্দ্রনাথকে নিজের বৈঠকখানায় বসাইয়া ভক্তপ্রবর গিরিশচন্দ্র বাটীর ভিতর গমন করেন; কিছুক্ষণ পরে বৈঠকখানায় ফিরিয়া আসিয়া দেখেন, দেবেন্দ্রনাথ কাষ্ঠপুত্তলিকাবৎ নিস্পন্দ হইয়া বসিয়া আছেন। অনেকক্ষণ নাম ধরিয়া ডাকিবার পর দেবেন্দ্রনাথ প্রকৃতিস্থ হইলেন। গিরিশবাবু বলিলেন—"দেখ দেবেন্ বাবু, আমার এখানে ভাব-টাব করো না, ওতে আমার বড় ভয় করে।" একটী নারিকেল-বৃক্ষের শাখা বায়ুভরে তুলিতেছে দেখিয়া শ্রীকৃষ্ণের চূড়া নড়িতেছে মনে করিয়া তাঁহার ঐ অবস্থা হইয়াছিল।

ঐ সময় শ্রীকৃষ্ণের নাম বা তদীয় বৃন্দাবন-লীলার কথা শ্রবণ করিলে তিনি বিরহে অধীর হইয়া পড়িতেন, আর আত্মসংবরণ করিতে পরিতেন না। প্রকতিস্থ থাকিবার জন্য তিনি এই সময় শ্রীকৃষ্ণের নাম করিতেন না। পাছে, যখন তখন যেখানে সেখানে ভাবস্থ হইয়া পড়েন, সেই জন্য এই সময় তিনি অনবরত "মা ব্রহ্মময়ী, মা

ব্রহ্মময়ী" বলিতেন। স্বামীজি এই সময় তাঁহাকে বিদ্রূপ করিয়া বলিয়াছিলেন, "কদমতলার পিঁ-পিঁ, এখন বেশ ভাল লাগ্‌ছে, কিন্তু পরে কষ্ট পেতে হবে।" স্বামীজির বলিবার উদ্দেশ্য ছিল—শুধু আপন মুক্তিতে তৃপ্ত থাকিলে চলিবে না, জগতের হিতসাধনও চাই।

বাহিরী গ্রামে দেবেন্দ্রনাথ ও নৈয়ায়িক পণ্ডিত।

পূর্ব্বে ঠাকুরের কৃপাপ্রাপ্ত বিহারী নামক যে ব্রাহ্মণের কথা উল্লিখিত হইয়াছে, বাটীতে কোন কর্ম্মোপলক্ষে সেই বিহারীর নিতান্ত অনুরোধে একবার দেবেন্দ্রনাথ তাঁহার জন্মস্থান বীরভূম জেলার বাহিরী গ্রামে গিয়াছিলেন। একদিন বিহারী-প্রমুখাৎ দেবেন্দ্রনাথের কথা অবগত হইয়া তত্রত্য এক নৈয়ায়িক ব্রাহ্মণ একজন শিষ্য সমভিব্যাহারে তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিতে আসেন।

পণ্ডিতজী আসিয়া দেবেন্দ্রনাথকে জিজ্ঞাসা করিলেন,—"মহাশয়! শাস্ত্র বচনে বলে, একটী কেশকে শত ভাগ করিলে যাহা হয়, মনের পরিমাণ তাহাই এবং ভগবান্ অপার অনন্ত, অতএব ক্ষুদ্র মনোদ্বারা ভগবানের ধারণা কিরূপে সম্ভব হইতে পারে?—এ বিষয়ে আমার মনে দারুণ সন্দেহ উপস্থিত হইয়াছে, আপনি দয়া করিয়া যদি আমার এই সন্দেহ অপনোদন করিতে পারেন, তবে কৃতার্থ হই।"

পণ্ডিতজির প্রশ্ন শুনিয়া দেবেন্দ্রনাথ বিশেষ চিন্তিত হইলেন এবং কি উত্তর দিবেন, ভাবিয়া স্থির করিতে পারিলেন না। যে ঘরে বসিয়া কথাবার্ত্তা হইতেছিল, তাহার দেওয়ালে একখানি কালী মাতার ছবি ছিল। নিরুপায় দেবেন্দ্রনাথ ছবির দিকে চাহিয়া মনে মনে বলিলেন, 'মা, আমার শাস্ত্রজ্ঞান নাই, আমি এ প্রশ্নের কি উত্তর দিব? তোমার যাহা ইচ্ছা হয় কর।' এইরূপ ভাবিয়া ছবির দিকে একদৃষ্টে

নিরীক্ষণ করিতে করিতে হঠাৎ ভাবস্থ হইয়া দণ্ডায়মান হইলেন, কিয়ৎ-ক্ষণ পরে প্রকৃতিস্থ হইয়া দেখিলেন, পণ্ডিতজী কৃতাঞ্জলিপুটে দণ্ডায়মান হইয়া অশ্রু বিসর্জ্জন করিতেছেন। দেবেন্দ্রনাথ পণ্ডিতজীর হস্ত ধারণ করিয়া তাঁহাকে বসাইলেন এবং ঈশ্বরপ্রসঙ্গ আরম্ভ করিলেন।

পণ্ডিতজীর শিষ্য প্রশ্নের মীমাংসা শুনিবার জন্য এতক্ষণ ব্যগ্র হইয়া-ছিলেন; প্রশ্নের মীমাংসা সম্বন্ধে কোন কথা হইল না দেখিয়া, তিনি দেবেন্দ্রনাথকে বলিলেন, "মহাশয়, ইঁহার প্রশ্নের উত্তর দিলেন না?"

পণ্ডিতজি শিষ্যের দিকে চাহিয়া বলিলেন,—"বাপু, তোমার চেয়ে মূর্খ ত আর দেখি নাই। লোকে বলে, শোনার চেয়ে দেখা ভাল, তুমি তোমার সম্মুখে দেখিলে—কিরূপ মনের দ্বারা ঈশ্বরের ধারণা হইল, তথাপি আবার জিজ্ঞাসা করিতেছ"?

———
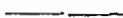
উনবিংশ পরিচ্ছেদ

মিনার্ভা থিয়েটারে কর্ম্ম গ্রহণ ও ত্যাগ—ইটালী আগমন।

(ইং ১৮৯২—৯৬)

শ্রীশ্রীঠাকুরের দেহত্যাগের পূর্ব্ব হইতে দেবেন্দ্রনাথ বাগবাজারে বাস করিতেছিলেন। তিনি তখনও যজ্ঞেশ্বর বাবুর বাটীতে কর্ম্ম করিতেন; সামান্য বেতন যাহা পাইতেন, তাহাতে তাঁহার সংসারব্যয় নির্ব্বাহ করিতে কষ্ট হইত।

দেবেন্দ্রনাথ থিয়েটারের কেসিয়ার নিযুক্ত।

এই সময়ে পাথুরিয়াঘাটানিবাসী নাগেন্দ্রভূষণ মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের নূতন এক থিয়েটার খুলিবার বাসনা হওয়াতে, তিনি নাট্যাচার্য্য গিরিশচন্দ্রকে থিয়েটার-সংক্রান্ত যাবতীয় কর্ম্মের ভার গ্রহণ করিতে অনুরোধ করেন। শ্রীযুত গিরিশচন্দ্র বলিলেন, "আমি আপনার থিয়েটার খুলিতে পারি, যদি দেবেন্‌বাবুর মত বিশ্বস্ত কর্ম্মচারী পাই।" দেবেন্দ্রনাথের সহিত নাগেন্দ্রবাবুর পূর্ব্ব হইতেই বিশেষ পরিচয় ছিল। নাগেন্দ্র বাবু ও গিরিশবাবুর অনুরোধে এবং অর্থের অসদ্ভাবপ্রযুক্ত দেবেন্দ্রনাথ থিয়েটারে কর্ম্ম করিতে স্বীকৃত হইলেন। তাঁহাকে কেসিয়ার নিযুক্ত করা হইল। থিয়েটারের নাম হইল "মিনার্ভা থিয়েটার"। ১৮৯৩ সালে ২৮শে জানুয়ারী শনিবার বহু আড়ম্বরের সহিত এই থিয়েটার খোলা হয়।

শ্রীযুত গিরিশচন্দ্র স্বয়ং নাট্যকার এবং অভিনেতা হইলেন। তাঁহার তত্ত্বাবধানে রঙ্গালয়ের উন্নতি হইতে লাগিল। নাগেন্দ্রবাবু দেবেন্দ্রনাথের
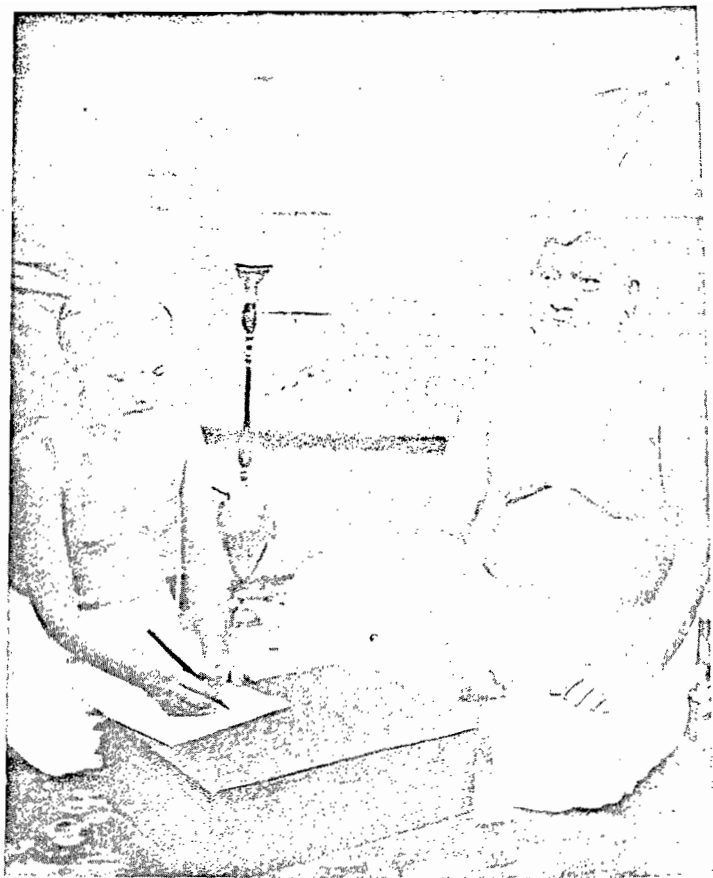
গিরিশচন্দ্রের লেখক—দেবেন্দ্রনাথ

আত্মীয় এবং সুহৃদ্, সুতরাং যাহাতে তাঁহার রঙ্গালয়ের উন্নতি হয়, তদ্বিষয়ে দেবেন্দ্রনাথ প্রাণপণে চেষ্টা করিতে লাগিলেন। বিশেষতঃ দেবেন্দ্রনাথের চরিত্রগত বিশেষত্ব এই ছিল যে, যখন যাঁহার কার্য্যগ্রহণ করিতেন, ষোল-আনা মনপ্রাণ দিয়া—নিজের কার্য্যজ্ঞানে তাহা সুসম্পন্ন করিতে চেষ্টা করিতেন। এই সময়ে দেবেন্দ্রনাথ দিবসে যজ্ঞেশ্বর বাবুর বাটীতে কার্য্য করিতেন এবং রাত্রিতে থিয়েটারে আসিতেন।

দেবেন্দ্রনাথ গিরিশবাবুর লেখক।

সুন্দর ও দ্রুত লেখক বলিয়া গিরিশবাবু দেবেন্দ্রনাথকে আপন লেখকরূপে নিযুক্ত করেন। এই সময়ের কয়েকখানি নাটকের তিনি লেখক হইয়াছিলেন।

দেবেন্দ্রনাথকে মধ্যে মধ্যে উপযুক্ত অভিনেতা ও অভিনেত্রীর সন্ধানে ছুটাছুটি করিতে হইত। এদেশে রঙ্গালয়ে সাধারণতঃ চরিত্রবান্ লোক অভিনেতা হন না; প্রায়ই উচ্ছৃঙ্খল যুবক ও বালক দ্বারা এই দলের পরিপুষ্টি হয়। আর অভিনেত্রীবৃন্দের কথা ত সর্ব্বজনবিদিত। ইহা বলা বাহুল্য যে, কোন্ শ্রেণীর ললনা লইয়া এই সকল গঠিত করা হয়। দেবেন্দ্রনাথকেও সর্ব্বদা এই সকল লোকের সংস্পর্শে আসিতে হইয়াছিল।

দেবেন্দ্রনাথকে রঙ্গালয়ে কার্য্য করিতে দেখিয়া তাঁহার সন্ন্যাসী গুরুভ্রাতাদিগের মধ্যে কেহ কেহ তাঁহাকে বিদ্রূপ করিয়া বলিয়াছিলেন, "কি দেবেন্‌বাবু! এখন কি হইল? আমরা যে সন্ন্যাসী, সেই সন্ন্যাসীই রহিলাম, কিন্তু আপনার এ কি হইল?"

"সোজা রে সন্ন্যাসী সাজা, হওয়া সেটা বিষম ল্যাঠা"।* ইত্যাদি গান রচনা করিয়া পূর্ব্বে দেবেন্দ্রনাথ তাঁহাদিগকে বিদ্রূপ করিয়াছিলেন।

---

* দেবগীতি, ৮৪ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য।

এখন সুযোগ পাইয়া তাঁহারাও বিদ্রূপ করিলেন। অবশ্যই ইহ ঈর্ষ্যা বা বিদ্বেষ বশতঃ নহে। পরস্পরের প্রতি আন্তরিক ভালবাস ও মঙ্গলেচ্ছাই এইরূপ রহস্যবাক্যের মূলে রহিয়াছে।

রঙ্গালয়ের সংস্রব চিরদিনের মত পরিত্যাগ।

রঙ্গালয়ের কার্য্যে প্রথমে অত্যধিক মনোনিবেশ করায় তাঁহার ধর্ম্ম-জীবনের কোন ক্ষতি হইতেছে কিনা, দেবেন্দ্রনাথ ভাবিয়া দেখিবার অবসর পান নাই। ক্রমে যত দিন যাইতে লাগিল, নিজের অবস্থার বিষয় ভাবিয়া তিনি বিষণ্ণ হইয়া পড়িতে লাগিলেন। পূর্ব্বসঞ্চিত সংস্কারের বিরুদ্ধে চলিতে হইলে বিবেকপরায়ণ ব্যক্তির হৃদয়ে এরূপ মনের ভাব হওয়া স্বাভাবিক। তিনি দেখিলেন, দয়াময় ঠাকুর নিজ গুণে তাঁহাকে কেমন দেবতা করিয়া দিয়াছিলেন! আর এখন তিনি নিজ দোষে অর্থের জন্য সামান্য মানুষের মত হীনতা প্রাপ্ত হইয়াছেন।

আপনার অবস্থা যতই চিন্তা করেন, ততই দেখিতে পান, তিনি ধীরে ধীরে অবনতির পথেই পতিত হইতেছেন, ভগবদ্ আনন্দের পরিবর্ত্তে বিষয়ানন্দে মত্ত হইতেছেন! তাঁহার দারুণ আত্মগ্লানি আসিয়া উপস্থিত হইল এবং একদিন স্থির করিলেন, রঙ্গালয়ের কর্ম্ম ত্যাগ করিবেন। সংকল্প অতি সত্বর কার্য্যে পরিণত হইল। ইং ১৮৯৫ সালের মার্চ্চ মাসে রঙ্গালয়ের সংশ্রব তিনি চিরদিনের মত পরিত্যাগ করিলেন।

মাষ্টার মহাশয়ের সহিত সাক্ষাৎ।

রঙ্গালয় ত্যাগ করিলেন বটে, কিন্তু তথাকার কৃতকর্ম্মের জন্য দারুণ অনুতাপ আসিয়া তাঁহার হৃদয়কে অভিভূত করিতে লাগিল এবং কি করিলে পুনরায় শান্তি লাভ করিতে পারেন, তাহার পরামর্শ গ্রহণ

করিবার জন্য গুরু-ভ্রাতৃগণের সহিত সাক্ষাৎ করিতে মনস্থ করিলেন। শ্রীমৎ স্বামী বিবেকানন্দ তখন কলিকাতায় ছিলেন না। দেবেন্দ্রনাথ সর্ব্বপ্রথম শ্রীযুত মহেন্দ্রনাথ গুপ্ত মাষ্টার মহাশয়ের সহিত সাক্ষাৎ করিয়া আপনার অবস্থা বিবৃত করিতে করিতে বলিলেন, "ঠাকুর বলিয়াছেন স্পর্শমণি-স্পর্শে লৌহ সোনা হয়; আমি তো ঠাকুরের কৃপা লাভ করিয়াছি, তবে এ অবস্থায় পতিত হইলাম কেন? তাহা হইলে কি আমার ঠিক্ ঠিক্ স্পর্শমণি স্পর্শ করা হয় নাই?"

তদুত্তরে শ্রীযুত মহেন্দ্রনাথ বলিলেন, "স্পর্শমণির স্পর্শে সোনা হইয়াছেন ঠিক, তবে এখন আঁস্তাকুড়ে পড়িয়া রহিয়াছেন।" মহেন্দ্র-নাথের কথা শুনিয়া দেবেন্দ্রনাথের সন্দেহ দূর হইল না বা প্রাণে তেমন শান্তি আসিল না। তাঁহার কেবলই চিন্তা হইতে লাগিল, 'ঠাকুর তবে কি আমায় পরিত্যাগ করিলেন? নিজ কর্ম্মদোষে দয়াময় ঠাকুরের কৃপা পাইয়াও তাহা হইতে বঞ্চিত হইলাম!' হৃদয়ে এ সন্দেহ পোষণ করিয়া দেবেন্দ্রনাথের মত প্রেমিক লোক অধিকক্ষণ স্থির থাকিতে পারেন না। কোথায় কাহার নিকট শান্তি পাইবেন, ভাবিতে ভাবিতে শ্রীযুত দুর্গাচরণ নাগমহাশয়ের নিকট গমন করিয়া অকপটহৃদয়ে তাঁহার নিকট আপনার অবস্থার বিষয় যথাযথ বিবৃত করিলেন।

শ্রীযুত নাগমহাশয়ের আশ্বাস বাণী।

শ্রীযুত নাগমহাশয় তখন তাঁহার কলিকাতাস্থ কুমারটুলীর বাসায় ছিলেন। তিনি দেবেন্দ্রনাথের কথা শুনিয়া বলিলেন,—"কাজলের ঘরে কাম্ করতে গেলে গায়ে দাগ লাগেই; তা ভয় কিসের, ভয় কিসের, গুরুগঙ্গা আছেন, ধুইয়া লইবেন, ধুইয়া লইবেন।"

শেষোক্ত কথাটী নাগমহাশয় এত উত্তেজিত স্বরে বলিয়াছিলেন যে তাঁহার কথা শুনিয়া দেবেন্দ্রনাথের সমুদয় অশান্তি মুহূর্ত্তমধ্যে কোথা অন্তর্হিত হইয়া গেল। দেবেন্দ্রনাথ আশ্বস্ত হইলেন এবং মনে-প্রা বুঝিলেন যে, হয় তো কোন মহদুদ্দেশ্যে দয়াময় ঠাকুর তাঁহাকে উক্ত অবস্থার মধ্যে ফেলিয়াছিলেন ; তিনিই আবার তাঁহাকে ভাল করিয়া সৎপথে চালিত করিবেন। বিষপান দেবাদিদেব মহাদেবেরই সাজে— শ্রীযুত গিরিশচন্দ্রই কেবল ঠাকুরের কৃপায় থিয়েটার লইয়াও অচল বিশ্বাসের সহিত থাকিতে সমর্থ। অন্য লোকে তাঁহার কার্য্যের অনুকরণ করিতে যাইলে আপনারই অহিতসাধন করিবে।

"দয়াময় ঠাকুর আমাকে পরিত্যাগ করেন নাই।"

থিয়েটারে কার্য্যকালে দেবেন্দ্রনাথ আপনাকে সংযত রাখিতে যথা-সাধ্য চেষ্টা করিলেও নিঃসঙ্কোচে বারবনিতার সহিত আলাপনে তাঁহার মনের ভাব কথঞ্চিৎপরিমাণে পরিবর্ত্তিত হইয়াছিল। তিনি বলিতেন, "সময়ে সময়ে ভোগবাসনা আমার মনে প্রবলভাবে উদয় হইত, কিন্তু দয়াময় ঠাকুরের কৃপায় আমি রক্ষা পাইতাম।" দেবেন্দ্রনাথ নিজ জীবনের এই সময়কার কথা সকলকে বিশেষভাবে জানাইতে বলিতেন তিনি বলিতেন, "লোকে আমার জীবনের এই সময়কার ঘটনা জানিতে পারিলে বুঝিতে পারিবে যে, জীবনে একবার মন্দ কার্য্য করিলে যে তাহাকে ভগবানের পথ হইতে জন্মের মত বিচ্যুত হইতে হইবে তাহার কোন কারণ নাই। আমি এই সময়ে কত গর্হিত কার্য্য করিয়াছি, তথাপি দয়াময় ঠাকুর আমায় পরিত্যাগ করেন নাই। যদি ভগবানের উপর কাহারও আন্তরিক টান থাকে, তিনি নিশ্চয় তাহার মঙ্গল করিবেন। যদি বাসনার তাড়নায় কেহ কোন নিন্দনীয়

কার্য্য করিয়া ফেলে, তাহার জন্য মন বিষন্ন না করিয়া তাহাকে ভগবানের শরণাগত হওয়া কর্ত্তব্য, তাহা হইলেই তিনি সকল বিপদ হইতে রক্ষা করেন। কতিপয় গর্হিত কার্য্য করাতে আমার এই উপকার হইয়াছে যে, ঠাকুর আমার মনের অহঙ্কারের ভাব একেবারে চূর্ণ করিয়া দিয়াছেন।"

উত্তরকালে এই সময়ের কথা উল্লেখ করিয়া ইটালীর কেহ তাঁহাকে অযথা নিন্দা করিলে তিনি বলিতেন,—"হাঁ, আমি তো মন্দ লোক নিশ্চয়ই, তবে দয়াময় ঠাকুর নিজ গুণে আমায় কৃপা করিয়াছেন, তার আমি কি করিব! সর্ব্বশক্তিমান্ দয়াল ঠাকুরের কার্য্যের উপর কে হস্তক্ষেপ করিবে? যাঁহারা ঠাকুরের নামে আজকাল আমার কাছে আসেন, তাঁহারা ঠাকুরের গুণেই আসেন—আমার নিজের গুণে নহে। আমার যাহা নিজস্ব, তাহা তো মন্দ হইতেই পারে।"

পরবর্ত্তী কালে দেবেন্দ্রনাথের জীবনের এই সময়কার কথা শুনিয়া স্বামীজি তাঁহার নিম্নোক্ত বাক্যটী একবারমাত্র গভীরভাবে উচ্চারণ করেন—

True greatness consists not in rising, but in rising every time we fall. (প্রকৃত মহত্ত্ব কেবল উন্নতিতে নহে, কিন্তু প্রতি অবনতির পর উন্নতিতে)।

দেবেন্দ্রনাথের মাতৃবিয়োগ ও কর্ম্মশূন্য অবস্থা।

থিয়েটারের কর্ম্ম পরিত্যাগ করিয়া মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথের ভ্রাতৃজামাতা যোগেশপ্রকাশ * গঙ্গোপাধ্যায় মহাশয়ের এষ্টেটে আরও দুই বৎসরকাল

* ভুলক্রমে ৬২ পৃষ্ঠার শেষ লাইনে এবং ১২৫ পৃষ্ঠার ৫ লাইনে যোগেশপ্রকাশ নামের পরিবর্ত্তে যজ্ঞেশ্বর বাবু লিখিত হইয়াছে।

দেবেন্দ্রনাথ কার্য্য করিয়াছিলেন। তাঁহার বেতন তথায় পঞ্চাশ টাকা ছিল। ১৮৯৪ খৃষ্টাব্দে সে কার্য্যও পরিত্যাগ করেন। ইহার পর প্রায় এক বৎসরকাল তিনি কর্ম্মশূন্য অবস্থায় বসিয়া ছিলেন। এই সময় বাগবাজারে অবস্থানকালে তাঁহার মাতৃবিয়োগ হয়। পরিবারমধ্যে এখন রহিলেন কেবল তাঁহার স্ত্রী ও ভ্রাতৃজায়া।

দেবেন্দ্রনাথের আর্থিক অবস্থা কখনও সচ্ছল ছিল না, চিরদিনই 'দিন আনা দিন খাওয়া' ভাবে সংসার নির্ব্বাহ করিতে হইত তাহার উপর মুক্ত-হস্তে দান, গুরুভাতৃগণকে বাটীতে নিমন্ত্রণ করিয়া ভোজন করান ইত্যাদি কার্য্যও ছিল। এই নিমিত্ত ভবিষ্যতের অবস্থার প্রতি কখনই লক্ষ্য রাখিতে পারিতেন না; সুতরাং দুর্দ্দিনের জন্য সঞ্চিত অর্থ কখনও তাঁহার থাকিত না। যোগেশ বাবুর এষ্টেটের কর্ম্ম পরিত্যাগের পরে এই এক বৎসরকাল তাঁহাকে নিদারুণ অর্থাভাব সহ্য করিতে হইয়াছিল।

ঠাকুরের অদর্শনে মর্ম্মান্তিক বেদনা, তৎপর স্নেহময়ী জননীর স্বর্গীয় ভালবাসার অভাব, তদুপরি উপার্জ্জনহীন অবস্থা তাঁহাকে এককালে প্রপীড়িত করিয়া ফেলিয়াছিল, এই সময়কার মানসিক অবস্থা সহজেই অনুমেয়। অর্থের অনটনে তাঁহাকে প্রায়ই পরিজন সহ অর্দ্ধাশনে বা অনশনে কাটাইতে হইত। এই সময় তাঁহাকে যাঁহারা দেখিয়াছেন, তাঁহারা বলেন, "দেবেন্ বাবুর ঠাকুরের প্রতি প্রীতি, চিত্তের প্রফুল্লতা, মিষ্টভাষিতা, উদারতা এবং পরোপকারিতা প্রভৃতি স্বভাবজাত গুণগুলির কোন বৈলক্ষণ্য কখনও দেখা যাইত না। তিনি যে সমস্ত দিন অনাহারে রহিয়াছেন, তাহা তাঁহার সহিত আলাপনে কেহ অনুমান করিতে পারিত না।" বলা বাহুল্য, এই দারুণ অভাবের দিনে গুরুভ্রাতৃগণ অনেক সময়ে তাঁহাকে সাহায্য করিতেন।

দেওয়ানজী—দেবেন্দ্রনাথ

দেবেন্দ্রনাথ ইটালীর মহেন্দ্রবাবুর এষ্টেটে দেওয়ান নিযুক্ত।

দেবেন্দ্রনাথের সংসারযাত্রা নির্ব্বাহ অসম্ভব হইয়া পড়িল। উপায়-বিহীন হইয়া আর তিনি বসিয়া থাকিতে পারিলেন না; পুনরায় জমিদারী সেরেস্তায় কর্ম্মের সন্ধান করিতে লাগিলেন। এই সময়ে ইটালীর স্বনামধন্য দেবনারায়ণ বাবুর এষ্টেটে একজন দেওয়ানের প্রয়োজন হওয়ায়, তাঁহার পৌত্র মহেন্দ্রনারায়ণ দেব মহাশয় কবিবর গিরিশচন্দ্রের কনিষ্ঠ ভ্রাতা হাইকোর্টের উকীল শ্রীযুত অতুলচন্দ্র ঘোষ মহাশয়কে একজন উপযুক্ত কর্ম্মচারী নিযুক্ত করিয়া দিতে অনুরোধ করেন। অতুল বাবু দেবেন্দ্রনাথকে ভালরূপে জানিতেন, তিনি তাঁহাকে মনোনীত করিয়া মহেন্দ্রবাবুর নিকট পাঠাইয়া দিলেন। বাংলা ১৩০৩ সালের ২৮শে জ্যৈষ্ঠ, ইং ১৮৯৬ সালের ৯ই জুন তারিখে দেবেন্দ্রনাথ ইটালীর মহেন্দ্রবাবুর এষ্টেটে দেওয়ান নিযুক্ত হইলেন। মাসিক পঁচিশ টাকা বেতন ধার্য্য হইল। দেবেন্দ্রনাথের বয়স তখন ৫২ বৎসর হইবে। ইহাই তাঁহার শেষ কর্ম্মগ্রহণ।

দেবেন্দ্রনাথের ইটালীতে আগমন।

দেবেন্দ্রনাথের অন্য কোনরূপ আয় ছিল না, এই পঁচিশটী টাকার দ্বারাই কোনরূপে সংসার চালাইতে হইত, ফলে দেওয়ানজী হইয়াও তাঁহার 'দিন আনা দিন খাওয়া' অবস্থা ঘুচে নাই। কার্য্য গ্রহণ করিয়া দেবেন্দ্রনাথ প্রথম প্রথম বাগবাজার হইতে ইটালী যাতায়াত করিতেন। ইহাতে তাঁহার বিশেষ কষ্ট হইত জানিতে পারিয়া মহেন্দ্র বাবু তাঁহাকে ইটালী আসিয়া বাসা করিতে বলেন। দেবেন্দ্রনাথ কার্য্যগ্রহণ করিবার প্রায় পাঁচ ছয় মাস পরে, বাঙ্গালা ১৩০৩ সালে, সপরিবারে ইটালী, বর্ত্তমান ৩৩নং দেব লেনের বাটীতে আসিয়া প্রথম বাস করিতে লাগিলেন।

বিংশ পরিচ্ছেদ

ইটালী অবস্থান ও সাধনা।

(১৮৯৬—৯৯)

একটী বালক প্রতিপালন।

দেবেন্দ্রনাথ নিঃসন্তান ছিলেন। তাঁহার শ্যালিকার মধ্যম পুত্র শ্রীমান্ বাদলকে আপনার নিকট রাখিয়াছিলেন। এই বালকের উপর তাঁহার পুত্রাধিক স্নেহ জন্মিয়াছিল। বালকটীর প্রতিপালনের ভার তিনি স্বেচ্ছায় গ্রহণ করিতে চাহিলে, তাঁহার সহধর্ম্মিণী তাঁহাকে নিষেধ করিয়া বলিয়াছিলেন,—"যদি সন্তান প্রতিপালন করিবার ইচ্ছা হইয়া থাকে, তবে নিজ পিতৃবংশীয় কোন বালককে আপনার নিকট রাখ; শ্বশুরবাড়ীর সম্পর্কীয় বালককে রাখিলে লোকনিন্দা হইবার সম্ভাবনা। বিশেষতঃ যখন নিজের সন্তানাদি নাই, তখন পরের ছেলে মানুষ করিবার কোন প্রয়োজন দেখা যায় না।"

দেবেন্দ্রনাথ পত্নীর নিষেধবাক্য শুনিলেন না। বাদল তাঁহার নিকট অবস্থিতি করিতে লাগিল। এই বালকের উপর তাঁহার মায়া এতই বর্দ্ধিত হইয়াছিল যে, অধিকক্ষণ তাহাকে দেখিতে না পাইলে তিনি অধীর হইতেন, এমন কি, নিদ্রাবস্থায় বাদলের নিশ্বাস পড়িতেছে কি না, দেখিবার জন্য মধ্যে মধ্যে তাহার নাসিকায় হস্ত দিয়া দেখিতেন।

বালকটী চৌর্য্যবৃত্তি আরম্ভ করে ও বিতাড়িত হয়।

দেবেন্দ্রনাথের বড় ইচ্ছা ছিল, তিনি এই বালককে সুশিক্ষিত করিবেন; কিন্তু ফলে তাহার বিপরীত হইল। বালকের বিদ্যাভ্যাসে

অনুরাগ ত হইলই না, অধিকন্তু, ক্রমে উচ্ছৃঙ্খল হইয়া মধ্যে মধ্যে বাটী হইতে পলায়ন করিতে আরম্ভ করিল। দেবেন্দ্রনাথও সন্ধান করিয়া তাহাকে বাটীতে আনয়ন করেন। অত্যধিক স্নেহে উচ্ছৃঙ্খলতা বর্দ্ধিত হইতে লাগিল—কিছুতেই তাহার মনোভিলাষ পূর্ণ হইল না; অবশেষে চৌর্য্যবৃত্তি আরম্ভ করিল; সুযোগ পাইলেই অর্থাদি আত্মসাৎ করিয়া পলায়ন করিত। এত দিনে দেবেন্দ্রনাথের চমক ভাঙ্গিল। তিনি এযাবৎ বালকের সমস্ত অত্যাচার নীরবে সহ্য করিয়া আসিতে-ছিলেন, কিন্তু সত্যপরায়ণ দেবেন্দ্রনাথ বালকের কুব্যবহারের প্রশ্রয় দিতে পারিলেন না; চিরদিনের মত স্নেহের বালকটীর মমতা ত্যাগ করিয়া গৃহ হইতে বিদায় করিয়া দিলেন।

এ বিষয়ে দেবেন্দ্রনাথ আমাদের নিকট বলিতেন,—"আমি বাদলের আশা কিছুতেই ছাড়িতে পারিতেছি না দেখিয়া, দয়াময় ঠাকুর যেন বালকের ঘাড়ে চাপিলেন—বালক চোর হইল, তখন তাহাকে দেখিলে আমার হৃৎকম্প উপস্থিত হইত। কাজেই বাধ্য হইয়া তাহাকে তাড়াইয়া দিলাম।"

দেবেন্দ্রনাথ এত দিন সংসারের অনেক প্রকার অবস্থা দেখিয়া আসিয়াছেন; কিন্তু পুত্রস্নেহ যে মানুষকে কতদূর মোহিত করিয়া একেবারে অন্ধতুল্য করিয়া ভগবানের পথ হইতে বিচ্যুত করিয়া ফেলে, তাহা দেখিবার সুযোগ পান নাই। এই বাদলের ঘটনায় তাহা বিশেষ করিয়া হৃদয়ঙ্গম করিবার সুযোগ পাইলেন।

ইটালীতে ধর্ম্মজীবন বিকাশের চেষ্টা।

মহেন্দ্র বাবুর কর্ম্ম গ্রহণ করিয়া দেবেন্দ্রনাথ প্রাতে ৮টার সময় বাবুদিগের বাটীতে যাইতেন এবং কার্য্যান্তে মধ্যাহ্নে বাসায় ফিরিয়া আসিতেন। আহারাদির পর ২।৩ ঘণ্টা বিশ্রাম করিয়া পুনরায়

কর্ম্মস্থলে যাইয়া, সন্ধ্যার পর পর্য্যন্ত কাজ করিয়া, পুনরায় বাসায় প্রত্যাবর্ত্তন করিতেন।

দেব লেনের বাটিতে কিছুদিন অবস্থানের পর দেবেন্দ্রনাথ ১৫নং ডিহি ইটালী রোডস্থ বাটীতে আসিয়া বাস করেন। এই সময় বাসাবাটী কর্ম্মস্থলের খুব সন্নিকট হওয়ায় মনিবের কর্ত্তব্য কার্য্য সমাপনান্তে দেবেন্দ্রনাথ নিজের ইষ্টচিন্তার জন্য যথেষ্ট সময় পাইতেন। অবকাশকালে বাবুদের পুষ্পোদ্যানে (বড় বাগানে) নির্জ্জন স্থানে একাকী বসিয়া জপ-ধ্যান করিতেন। ইটালীতে আসিয়া তাঁহার ধর্ম্মজীবনের বিশেষ বিকাশ হয়। তিনি এখানে থাকিয়া লোকচক্ষুর অন্তরালে কত যে সাধনা করিয়াছেন, তাহা কাহারও জানিবার উপায় নাই।

দেবেন্দ্রনাথের সহকর্ম্মী শ্রীযুত ননীগোপাল মিত্র মহাশয়ের নিকট অবগত হওয়া যায় যে, অনেক সময় দেবেন্দ্রনাথকে দপ্তরখানায় কার্য্যান্তে নীরবে নিস্পন্দভাবে বসিয়া থাকিতে তিনি দেখিতেন। প্রথম প্রথম তিনি তাঁহার আন্তরিক ব্যাধি আছে বলিয়া শঙ্কা করিতেন; কিন্তু তিনি তাঁহার মুখজ্যোতি দর্শনে আশ্চর্য্য হইয়া যাইতেন। পরবর্ত্তী ঘটনার পর হইতে ইহা যে ঈশ্বরীয় ভাব, তাহা ননীবাবু বুঝিতে পারিয়া তাঁহাকে অতিশয় শ্রদ্ধা ও ভক্তি করিতেন।

দেবেন্দ্রনাথ ইটালীতে আসিয়া বাস করিবার সময় তাঁহার দেশস্থ গোবর্দ্ধন রায় মহাশয় নামক জনৈক ব্যক্তি মধ্যে মধ্যে তাঁহার নিকট আসিয়া থাকিতেন। কোন এক সময় রাত্রিতে এই রায় মহাশয়কে সঙ্গে লইয়া দেবেন্দ্রনাথ ৺কালীঘাটে কেওড়াতলার শ্মশানে জপ-ধ্যান করিবার জন্য গিয়াছিলেন। ধ্যানে মগ্ন হইয়া স্থির-নিশ্চল-ভাবে তিনি বসিয়া আছেন, নিকটে রায় মহাশয় বসিয়া তাঁহাকে নিরীক্ষণ করিতেছেন। কিছুক্ষণ পর সেই গভীর নিশীথে শ্মশানে ঐরূপভাবে

বসিয়া থাকিতে রায় মহাশয়ের বড় ভয় হইতে লাগিল। তিনি বারংবার উচ্চৈঃস্বরে দেবেন্দ্রনাথকে ডাকিয়া বলিলেন, "বাবাজি—বাবাজি, বড় ভয় কচ্ছে।" দেবেন্দ্রনাথ তখন ভাবাবিষ্ট ও গভীর ধ্যানস্থ। সহসা ভীতিব্যঞ্জক বিকট চীৎকারে তাঁহার হৃদয়ের স্পন্দন যেন বন্ধ হইয়া আসিল। ইহাতে তিনি উঠিয়া পড়িলেন এবং ক্ষিপ্রপদবিক্ষেপে সে স্থান পরিত্যাগ করিয়া দৌড়াইতে দৌড়াইতে নিকটস্থ রাস্তার পার্শ্বে এক দোকানে প্রবেশ করিলেন। রায় মহাশয়ও তাঁহার পশ্চাতে পশ্চাতে, "ও বাবাজি দাঁড়াও, ও বাবাজি দাঁড়াও" বলিয়া ডাকিতে ডাকিতে সেই স্থানে উপস্থিত হইলেন। কিছুক্ষণ পরে দেবেন্দ্রনাথ সমুদয় ব্যাপার বুঝিতে পারিলেন। এই ঘটনা উল্লেখ করিয়া, তিনি সকলকে ধ্যানের সময় কোন শব্দ হইলে অনিষ্ট ঘটিতে পারে বলিয়া নির্জ্জনে নিঃসঙ্গে ধ্যান করিতে বলিতেন।

প্রথমে ইটালীতে শ্রীরামকৃষ্ণ নাম প্রকাশ করিতেন না।

তিনি যে শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণদেবের আশ্রিত, ইটালীতে কাহারও নিকট এ কথা ব্যক্ত করিতেন না এবং ঈশ্বরীয় প্রসঙ্গে কাহারও সহিত কথা বলিতে ঠাকুরের নাম উল্লেখ করিতেন না। কেবল মাত্র শ্রীযুত রামদত্ত প্রভৃতি গুরুভ্রাতৃগণ কখনও তাঁহাকে দেখিতে আসিলে তাঁহাদের সহিত গোপনে ঠাকুরের বিষয় আলোচনা করিতেন। লোকে দেখিলে তাঁহাকে কখনও ভক্ত বলিয়া চিনিতে বা বুঝিতে পারিত না। একে রূপবান্, তাহার উপর দরিদ্র হইয়াও পরিচ্ছন্ন ও পরিপাটীভাবে থাকিতে দেখিয়া ইটালীর অনেকেই তাঁহাকে ঘোর বিষয়ী ও বাবু বলিয়া মনে করিত।

শ্রীরামকৃষ্ণ নাম প্রকাশের বাসনা।

স্বামী বিবেকানন্দ হিন্দু-ধর্ম্মের বিজয়-দুন্দুভি বাজাইয়া সগৌরবে তৎকালে দেশে প্রত্যাগমন করিয়াছিলেন। শ্রীরামকৃষ্ণনাম জগন্ময় প্রচারিত হইবার সংবাদ শুনিয়া দেবেন্দ্রনাথের মনে যুগপৎ আনন্দ ও ক্ষোভের উদয় হইল। তিনি ভাবিলেন, আমরাও ত তাঁহার আশ্রিত কৃপাপ্রাপ্ত; কৈ আমরা তাঁহার কৃপার সদ্ব্যবহার কি করিলাম? ইহার পর হইতে দেবেন্দ্রনাথের জীবনের এক নূতন অধ্যায় আরম্ভ হইল। এখন হইতে ভগবদ্-আলোচনাপ্রসঙ্গে শ্রীশ্রী-রামকৃষ্ণদেবের উপদেশ ও ঘটনার উল্লেখ করিতে তিনি আরম্ভ করেন।

মহেন্দ্রবাবুর বাড়ীতে কার্য্য করিতে যাইলে তাঁহার বৈমাত্রেয় ভ্রাতা উপেন্দ্রনারায়ণ দেব মহাশয়ের সহিত দেবেন্দ্রনাথের অনেক সময় ভগবৎপ্রসঙ্গে আলোচনা চলিত। কথাপ্রসঙ্গে একদিন তিনি দেবেন্দ্র-নাথকে বলেন যে,—"অনেক সাধু দেখিয়াছি, কিন্তু পরমহংসের ন্যায় সাধু দেখিলাম না।" 'পরমহংস' নামটী শুনিবামাত্র দেবেন্দ্রনাথ পুলকিত হইলেন এবং জিজ্ঞাসা করিয়া জানিলেন যে, উপেন্দ্র বাবু শৈশবে শ্রীরামকৃষ্ণদেবকে কয়েকবার দর্শন করিয়াছিলেন। তদবধি উপেন্দ্র বাবুর সহিত শ্রীরামকৃষ্ণদেবের সমন্ধে আলোচনা হইতে আরম্ভ হয়। ক্রমে দেবেন্দ্রনাথের নিকট হইতে শ্রীশ্রীঠাকুরের বিষয় ও তদাশ্রিত স্বামী বিবেকানন্দের অসীম শক্তি এবং সদ্গুণাবলীর কথা শ্রবণ করিয়া ইনি স্বামীজির প্রতি আকৃষ্ট হন। ইহা সর্ব্বজন বিদিত যে, স্বামীজি উপেন্দ্রনারায়ণকে বিশেষ ভালবাসিতেন এবং উপেন্দ্রনারায়ণও স্বামীজির সেবা এবং কার্য্যের জন্য তাঁহার সম্পত্তি মুক্তহস্তে ব্যয় করিয়া গিয়াছেন।

অবসরকালে সর্ব্বদা একাকী ঈশ্বরের চিন্তায় কাটাইলেও মধ্যে মধ্যে দেবেন্দ্রনাথ তাঁহার বাটীর পার্শ্বস্থ শ্রীযুত দুর্গাচরণ ভট্টাচার্য্য নামক জনৈক ভদ্রলোকের চালাঘরে বসিয়া সমাগত লোকদিগের সহিত কখনও সদ্‌গ্রন্থ পাঠে, ভগবদ্‌প্রসঙ্গে, কখনও বা নীতিপূর্ণ গল্প বলিয়া সময় কাটাইতেন। এই ভাবে প্রায় তিন চারি বৎসর কাল কাটিয়া যায়। শ্রীযুত অক্ষয় মাষ্টার মহাশয় এই সময়ে দেবেন্দ্রনাথকে তাঁহার রচিত হস্তলিখিত পুঁথি শুনাইতে সর্ব্বদাই আসিতেন। এই সময়ে ইটালীর শ্রীযুত চারুচন্দ্র মুখোপাধ্যায়, সতীশচন্দ্র পাল ও কালীনাথ মুখোপাধ্যায় প্রভৃতির সহিত তাঁহার পরিচয় হয়। ইঁহারা পরে দেবেন্দ্রনাথের প্রিয় ভক্তমধ্যে পরিগণিত হন।

দেবেন্দ্রনাথ যথাসাধ্য সংসারের কর্ত্তব্য পালন করিয়া জীবনের শেষ ভাগে নীরবে ঠাকুরের চিন্তায় সময় কটাইয়া দিবেন, এইরূপ ভাব পূর্ব্বে মনে মনে পোষণ করিতেন। কিন্তু ঠাকুর স্বীয় প্রিয় ভক্তকে সেরূপ গোপন ও নিষ্ক্রিয়ভাবে আর বেশী দিন থাকিতে দিলেন না।

একবিংশ পরিচ্ছেদ

দেবেন্দ্রনাথ সাধারণের নিকট প্রকাশ।

সন্ন্যাসীর গান।

একদিন অতর্কিতে একটী ঘটনা আসিয়া দেবেন্দ্রনাথের সমস্ত নীরবতা ভাঙ্গিয়া দিয়া তাঁহাকে সাধারণের নিকট প্রকাশ করিয়া দিল। একদিন সন্ধ্যার পর দেবেন্দ্রনাথ মহেন্দ্রবাবুর উপরের বৈঠকখানায় বসিয়াছিলেন, এমন সময় মহেন্দ্রবাবুর জ্যেষ্ঠ পুত্র সুরেন্দ্রবাবু * আসিয়া দেবেন্দ্রনাথকে বলিলেন, "মশাই, আমাদের ভিতরের বৈঠকখানায় একজন সন্ন্যাসী আসিয়াছেন, তিনি শ্যামা-বিষয়ক অতি সুন্দর গান গাহিতেছেন। তাঁহার কণ্ঠস্বর অতি মধুর; আপনাকে শুনাইবার জন্য ডাক্‌তে এলাম।"

দেবেন্দ্রনাথ বলিলেন, "আমি এইখান হইতেই শুনিব, ও বৈঠকখানায় যাইতে আমার ইচ্ছা নাই।"

সুরেন্দ্র বাবু একটু দুঃখিতভাবে বলিলেন, "মশাই, আমার বড় ভাল লাগ্‌ল ব'লে তাই এত আগ্রহের সহিত আপনাকে ডাক্‌তে এলাম। আপনি যদি না যান, তা হ'লে আমার বড় কষ্ট হবে।" সুরেন্দ্র বাবু

---

* ইঁনি দেবেন্দ্রনাথকে আন্তরিক শ্রদ্ধা-ভক্তি করিতেন; প্রাতে ও সন্ধ্যার সময় একসঙ্গে বেড়াইতেন ও ধর্ম্মপ্রসঙ্গে আলাপ করিতেন এবং প্রয়োজনমত তাঁহার নিকট হইতে শ্যামা-বিষয়ক সঙ্গীত রচনা করিয়া লইতেন। ইনি বাল্যকাল হইতেই সঙ্গীতপ্রিয়, ভগবদ্ভক্ত, বিনয়ী ও নম্রস্বভাব, সুকণ্ঠ গায়ক এবং সুনিপুণ হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসক। দেবেন্দ্রনাথ ইঁহাকে বড় ভালবাসিতেন।
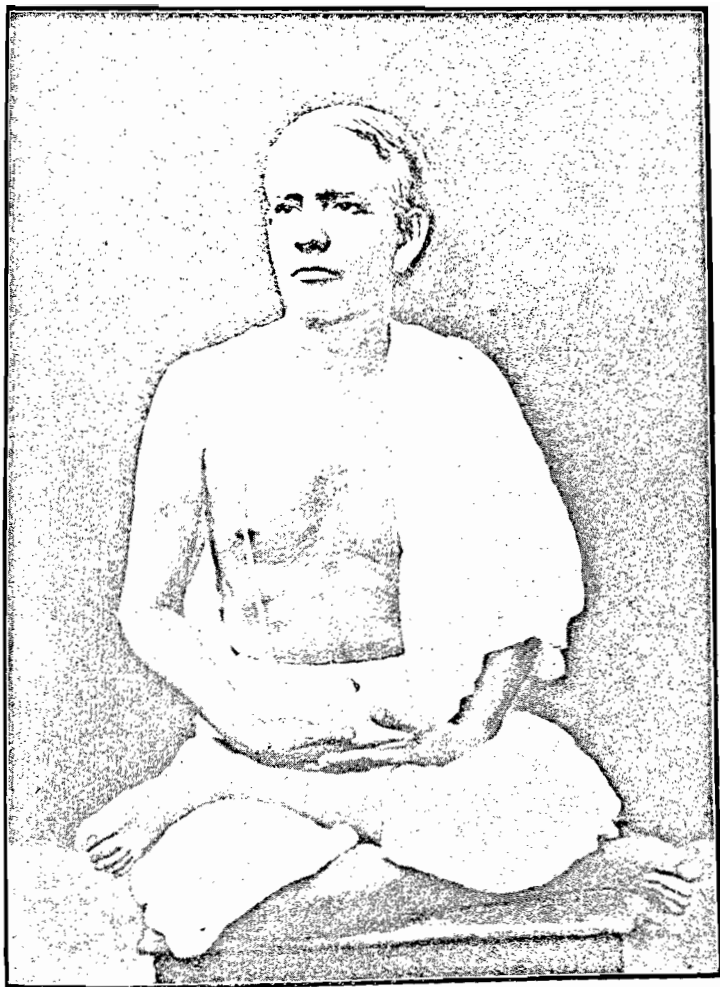
বিকাশোন্মুখ—দেবেন্দ্রনাথ

পুনঃ পুনঃ অনুরোধ করায় তিনি সুরেন্দ্র বাবুর সহিত ভিতরের বৈঠকখানায় যাইয়া উপস্থিত হইলেন।

"এই বৈঠকখানায় উপবিষ্ট এক ব্যক্তি দেবেন্দ্রনাথের নিকট যাতায়াত করিতেন ও ভগবদ্‌বিষয়ে আলোচনা করিতেন, তিনিও গান শুনিতেছিলেন। তিনি এক্ষণে দেবেন্দ্রনাথের আশ্রিত ও ঠাকুরের ভক্ত। ঐ ভক্তটী দেবেন্দ্রনাথকে দেখিয়া আনন্দিত হইলেন এবং যত্নপূর্ব্বক আপনার পার্শ্বে উপবেশন করাইলেন। সন্ন্যাসী গাহিতে লাগিলেন—

"উঠ গো করুণাময়ী, খোল মা কুটীর-দ্বার।
আঁধারে হেরিতে নারি, হৃদি কাঁপে অনিবার॥"

প্রথম দু'কলি গান হ'তেই দেবেন্দ্রনাথ ভক্তটীকে বলিতে লাগিলেন, "বেশ গান!" ভক্তটী কেবল 'হাঁ' দিতে লাগিলেন। সন্ন্যাসী গাহিতে লাগিলেন—

"তার-স্বরে তারা তোমায়, ডাকি আমি বারে বার
মা মা ব'লে ডেকে ডেকে, হল অস্থিচর্ম্ম সার।
সন্তানে রাখি' বাহিরে, আছ শুয়ে অন্তঃপুরে,
(কত) মা মা ব'লে ডাকি, তবু, নিদ্রা ভাঙ্গে না তোমার।"

"সন্তানে রাখি' বাহিরে" শুনিয়াই দেবেন্দ্রনাথ "আহা! আহা!" করিয়া উঠিলেন, সঙ্গে সঙ্গে সর্ব্বশরীরে রোমাঞ্চ হইল; ভাব চাপিবার জন্য পুনঃ পুনঃ ভক্তটীর উরুৎ চাপড়াইয়া বলিতে লাগিলেন, "বেশ গান, বেশ গান না?" ভক্তটীও পূর্ব্বের ন্যায় কেবল 'হাঁ হাঁ' বলিতে লাগিলেন। গানখানি তখন খুব জমেছে, সকলেই সন্ন্যাসীকে বাহবা দিচ্ছিলেন। সন্ন্যাসী গাহিতে লাগিলেন—

"খেলায় মত্ত আছি ব'লে, বুঝি মুখ মা বাঁকাইলে,
চাহ মা কৃপা নয়নে-যাব না খেলিতে আর॥"

দেবেন্দ্রনাথ হঠাৎ দণ্ডায়মান।

"দেবেন্দ্রনাথ আর ভাব চাপিতে পারিলেন না, 'ওঁ কালী' বলিয়া দাঁড়াইয়া উঠিলেন। পার্শ্বে যে ভক্তটী ছিলেন, তিনি তাড়াতাড়ি উঠিয়া দেবেন্দ্রনাথকে ধরিয়া ফেলিলেন। দেবেন্দ্রনাথের এই অবস্থা দেখিয়া সকলে ভীত এবং বিস্মিত হইলেন। অনেকে মনে করিলেন, দেবেন্দ্রনাথের হঠাৎ সর্দ্দি-গর্ম্মি হইয়াছে এবং যাহাতে সুস্থ হন, সেই অনুযায়ী কার্য্য করিতে লাগিলেন। সুরেন্দ্র বাবু ঐ সময় বড় কষ্ট অনুভব করিতে লাগিলেন। উপেন্দ্রবাবু (ইনি স্বামী বিবেকানন্দের আশ্রিত) ঘটনাস্থলে উপস্থিত ছিলেন এবং দেবেন্দ্রনাথের অবস্থা দেখিয়া বলিলেন, "কোন ভয় নাই, ভগবানের নাম করিলেই ইনি প্রকৃতিস্থ হইবেন। ইহাকে ভাবসমাধি বলে, ভগবানের সহিত জীবের মিলন হইলেই এরূপ অবস্থা হয়।" দেবেন্দ্রনাথের কর্ণের নিকট 'ওঁ কালী, ওঁ কালী' বলিতে বলিতে ক্রমে তিনি প্রকৃতিস্থ হইলেন।

ইটালীতে শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ নাম প্রচার।

"সকলে যখন শুনিলেন, ভগবানে তন্ময়তা প্রাপ্ত হইলে এইরূপ অবস্থা হয়, তখন অনেকে দেবেন্দ্রনাথকে বিশেষ শ্রদ্ধা ও ভক্তির চক্ষে দেখিতে লাগিলেন। সেই দিন হইতে দেবেন্দ্রনাথ ইটালীতে প্রকাশ্যরূপে প্রকাশ হইয়াছিলেন—সেই দিন হইতে অনেকে দেবেন্দ্রনাথকে আন্তরিক শ্রদ্ধা-ভক্তি করিতে শিখিয়াছিলেন—সেই দিন হইতে দেবেন্দ্রনাথ ইটালীতে ভগবান্ শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ-দেবের নাম প্রচার করিতে লাগিলেন—সেই দিন হইতে ইটালীর অনেক লোক জানিতে পারিলেন—দেবেন্দ্রনাথ ভগবান্ শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণপরমহংস-দেবের শিষ্য।

ইটালীতে দেবেন্দ্রনাথ সম্বন্ধে নানা কথা।

"সেই দিন হইতে ইটালীতে দেবেন্দ্রনাথ সম্বন্ধে মহা সমালোচনাও হইতে লাগিল। কতিপয় ব্যক্তি বলিতে লাগিল,—'হ্যাঁ, দক্ষিণেশ্বরে রাণী রাসমণির কালীবাড়ীর পূজারী ব্রাহ্মণ রামকৃষ্ণ, তিনি আবার অবতার! তাঁর শিষ্য আবার মহাপুরুষ! কালে আরও কত শুন্‌তে হবে! আমাদের শাস্ত্রে ত দশ অবতারের কথা আছে, তবে রামকৃষ্ণ আবার ঝাঁ ক'রে কোথা থেকে অবতার হ'ল!' তাঁহারা সে দিন থেকে দেবেন্দ্রনাথের প্রতি বিদ্বেষভাবাপন্ন হইলেন।" * * *

দেবেন্দ্রনাথের পত্নীবিয়োগ।

এই ঘটনার অল্প পরে তাঁহার গুণবতী সাধ্বী সহধর্ম্মিণী বসন্ত রোগে আক্রান্তা হন এবং দশ দিন ভুগিয়া ১৩০৬ সালের ৪ঠা পৌষ, ইং ১৮৯৯ সালের ১৮ই ডিসেম্বর তারিখে স্বধামে প্রস্থান করেন। আসন্নকালে দেবেন্দ্রনাথ শ্রীশ্রীঠাকুরের ছবি বক্ষে ধরিতে গেলে পত্নী বলিয়াছিলেন, "তোমার পা মাথায় দেও, আমার সম্মুখে দাঁড়াও।" পতিকে সম্মুখে করিয়া ঠাকুরের ছবি বক্ষে ধারণ করিয়া সহাস্যে দেবী চিরতরে নয়ন মুদ্রিত করিলেন। দেবেন্দ্রনাথ ও চারুচন্দ্র মুখোপাধ্যায় প্রাণপণে শেষ পর্য্যন্ত তাঁহার সেবা-শুশ্রূষা করিয়াছিলেন।

স্ত্রীবিয়োগের অল্পদিন পরে তাঁহার জ্যেষ্ঠা ভগিনী আসিয়া তাঁহার সহিত বাস করিতে থাকেন। পরে ১৯০৫ সালের শেষভাগে তিনি দেহত্যাগ করেন। এখন সংসারে একমাত্র ভ্রাতৃজায়া ও ভগিনী ভিন্ন অন্য কেহই রহিল না। ভ্রাতৃজায়াকে মাতৃজ্ঞানে শেষ পর্য্যন্ত ভরণপোষণ করিয়াছিলেন। তিনিও দেবেন্দ্রনাথকে সন্তানের ন্যায় আদর-যত্ন করিতেন। ইনি সুবিখ্যাত অভিনেতা অর্দ্ধেন্দুশেখর

* "জন্মভূমি" ১৩২০ সাল, আশ্বিন, ২২০—২২২ পৃষ্ঠা।

মুস্তফীর ভগিনী, ঋষিকবি সুরেন্দ্রনাথের 'মহিলা' কাব্যের জায়া অংশের অনুপ্রাণয়িত্রী গুণবতী জায়া। ইঁহার মত বুদ্ধিমতী গৃহিণী সচরাচর দেখা যায় না। যেমন গৃহকর্ম্মে ও রন্ধনে সুনিপুণ, তেমন সেবাকার্য্যে সুদক্ষ। ইঁহার হস্তের রন্ধন খাইবার জন্য স্বামীজি ও রাখাল মহারাজ প্রভৃতি গুরুভ্রাতৃগণ ও বন্ধু-বান্ধবগণ অনেক সময় দেবেন্দ্রনাথের নিকট যাচিয়া নিমন্ত্রণ গ্রহণ করিতেন। ইঁহাকে দেবেন্দ্রনাথের যেরূপ সেবা ও শুশ্রূষা করিতে দেখিয়াছি সেরূপ অন্যত্র অল্পই দৃষ্ট হয়। দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের প্রথম দর্শন লাভের পর যখন একচল্লিশ দিন অজ্ঞানপ্রায় অবস্থায় ছিলেন, তখন এই ভ্রাতৃজায়াই তাঁহার শয্যাপার্শ্বে দিবারাত্র বসিয়া সেবা করিয়াছিলেন।

দেবেন্দ্রনাথের বৈরাগ্য।

আমরা দেবেন্দ্রনাথের এই পর্য্যন্ত জীবনালোচনা করিয়া দেখিতে পাই যে, তাঁহার সংসার করিবার স্পৃহা কখনই ছিল না। প্রথম-জীবনে, অগ্রজের আশ্রয়ে থাকিয়া যোগাভ্যাসে রত; পরে মাতার নিতান্ত নির্ব্বন্ধাতিশয়ে বাধ্য হইয়া দারপরিগ্রহ; ঈশ্বরলাভে তীব্র ব্যাকুলতা আসিলে পরিবারবর্গ হইতে স্বতন্ত্র বাস; ঠাকুরের নিকট সন্ন্যাস প্রার্থনা এবং স্বামীজি সন্ন্যাসীর বেশে তাঁহাকে সাজাইয়া দিলে অনেক দিন পর্য্যন্ত বৈরাগ্যের ঘোর—ইত্যাদি হইতে স্পষ্ট বুঝা যায় যে, তিনি কেবল কর্ত্তব্যানুরোধ ও শ্রীশ্রীঠাকুরের আদেশ রক্ষার্থ সংসারধর্ম্ম পালন করিয়াছিলেন।

স্ত্রীবিয়োগের পর ভ্রাতৃজায়াকে অন্যত্র রাখিবার বন্দোবস্ত করিয়া, সংসার ছাড়িবার একান্ত বাসনা পুনরায় হৃদয়ে বলবতী হইয়া উঠিল। কিন্তু তাঁহার ভ্রাতৃজায়া তাঁহাকে ছাড়িয়া অন্যত্র যাইতে প্রস্তুত হইলেন না, তিনিও পিতৃতুল্য অগ্রজের পত্নীকে উপেক্ষা করিতে পারিলেন না;

বাধ্য হইয়া সংসারে থাকিতে হইল। তাঁহার জনৈক প্রিয় ভক্তের নিকট লিখিত নিম্নোদ্ধৃত পত্রাংশ হইতে ইহা বেশ স্পষ্ট প্রতীয়মান হয়—

* * "আমি এ পর্য্যন্ত সংসারে আছি, যে কোন কারণে হউক, একবার ইহার বাহিরে গেলে আর ইহার ভিতরে আসিবার ইচ্ছা রাখি না। * * * ঈশ্বর তদনুকূল অবস্থা আমাকে কিছুতেই দিতেছেন না। যখনই সংসার ছাড়িব বাসনা করি, তখনই প্রতিবন্ধক উপস্থিত হয়। তাহার একটী স্পষ্ট ঘটনা নিম্নে লিখিতেছি, বুঝিতে পারিবে। * * *

"এখন বুঝিলে, ঠাকুর কেন আমাকে হাতুড়ি-পেটা করিতেছেন, ইহাতেও আবার ধর্ম্মের প্রতি সখ্ আছে! আচ্ছা 'খান-দান-চাষা' হইয়াছি! যখনই মনে করি, সংসার ত্যাগ করিব, বেশ আনন্দে দিন কাটাইব, তখনই এই দুর্দ্দশা!" * * *

দেবেন্দ্রনাথ কখনই ভাবেন নাই যে, ঠাকুরের নাম প্রচার, ভক্তমণ্ডলী সংগঠন, বা ঠাকুরের স্থান প্রতিষ্ঠা ইত্যাদি কার্য্য তাঁহার দ্বারা কখনও সম্পাদিত হইতে পারিবে। একা নিজেই ভগবদ্-আনন্দ উপভোগ দ্বারা মানবজীবন সার্থক করিয়া অপরিচিতের ন্যায় জীবনলীলা সমাধা করিবেন, এইরূপ ইচ্ছাই তিনি মনে মনে পোষণ করিতেন।

দ্বাবিংশ পরিচ্ছেদ

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ অর্চ্চনালয়ের স্থাপনা।

(১৯০০—০২)

ইটালীর উচ্ছৃঙ্খল যুবকদল।

ইটালীতে একদল উচ্ছৃঙ্খল চরিত্রের যুবক নানারূপ নেশা করিয়া আড্ডা দিয়া বেড়াইত। দেবেন্দ্রনাথকে দেখিয়া তাহারা নানারূপ ঠাট্টা-বিদ্রূপ ও নিন্দাবাদ করিত। অনেকে তাঁহার প্রতি লোষ্ট্র নিক্ষেপও করিত। দেবেন্দ্রনাথ ইহাতে বিন্দুমাত্রও বিচলিত না হইয়া ঠাট্টা-বিদ্রূপ ও তাঁহার নিন্দাকারীদের দেখিতে পাইলে অগ্রে প্রণাম করিয়া সাদর সম্ভাষণে তাঁহাদের কুশলবার্ত্তা জিজ্ঞাসা করিতেন। এইরূপ প্রীতিপূর্ণ সরল ও অমায়িক ব্যবহারে বিদ্রূপকারিগণ অনুতপ্ত হইয়া পরে তাঁহার প্রতি আকৃষ্ট হন ও তাঁহার আশ্রয় গ্রহণ করেন। এই সময় শ্রীযুত হেমচন্দ্র বসু নামক এক সম্ভ্রান্তবংশীয় যুবক দেবেন্দ্রনাথকে দেখিলেই তাঁহার পশ্চাৎ হইতে "প্যাক্ প্যাক্" শব্দ করিয়া চলিয়া যাইত। দেবেন্দ্রনাথ পরম-হংসের চেলা, অতএব তিনিও হংস; হংস ডাকিবার শব্দ "প্যাক্ প্যাক্"। হেমচন্দ্র ও তাহার বন্ধুগণ এইরূপ শব্দ করিয়া দেবেন্দ্রনাথকে বিদ্রূপ করিত।

কিছুদিন পরে এই হেমচন্দ্র তাঁহার কতিপয় বন্ধুর অনুরোধে দক্ষিণেশ্বরে শ্রীশ্রীঠাকুরের জন্মোৎসব দেখিতে গমন করেন। উৎসব-দর্শনে তাঁহার ভাবান্তর ঘটে এবং ঠাকুরের প্রতি বিদ্রূপভাব অন্তর্হিত হয়। তিনি পরদিবস হইতেই বাজে ইয়ারকী করিয়া বৃথা সময় না

কাটাইয়া রামকৃষ্ণ দেবের নামগুণানুকীর্ত্তনে সময় কাটাইবেন স্থির করিলেন। পরে হেমচন্দ্র পূর্ব্বকৃত বিদ্রূপের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করিয়া দেবেন্দ্রনাথের নিকট ঘন ঘন যাতায়াত আরম্ভ করেন। ক্রমে তাঁহার সঙ্গে তাঁহার বন্ধুগণও আসিতে লাগিলেন।

হেমচন্দ্রের বাটীতে কীর্ত্তন আরম্ভ ও শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ অর্চ্চনালয়ের উৎপত্তি।

এখন হইতে দেবেন্দ্রনাথের মুখে মধুর ভগবৎপ্রসঙ্গের কথা শুনিবার জন্য অনেকেই নিত্য আসিতে লাগিল। সমবেত ভক্তমণ্ডলীর মধ্যে হেমচন্দ্রের মনে প্রথম কীর্ত্তন করিবার বাসনা উদিত হয়; পরে সকলেই তাহা অনুমোদন করেন। হেমচন্দ্র উদ্যোগী হইয়া তাহার ব্যবস্থা করিতে থাকেন।

দেবেন্দ্রনাথ যে বাটীতে বাস করিতেন, তথায় সমাগত ভক্তগণের বসিবার স্থান সঙ্কুলান না হওয়ায় প্রথমে হেমচন্দ্রের বাটীতে ভক্তগণের কীর্ত্তনের স্থান করা হইল। বর্ত্তমান ৪৩ নং দেব লেনের বাটীতে তখন হেমচন্দ্র বাস করিতেন। তাঁহার বাহিরে বসিবার যে জায়গাটী ছিল, তাহাতে তখন কার্য্যোপলক্ষে চূণ রাশীকৃত করিয়া রাখা হইয়াছিল। উহার অর্দ্ধেকাংশের চূণ সরাইয়া দরমা দিয়া ঢাকিয়া কীর্ত্তনের জায়গা করা হইল। হেমচন্দ্র মৃদঙ্গ, করতাল এবং পরে ঠাকুরের একখানি ছবি কিনিয়া আনিলেন। ছবিখানি বসিবার স্থানের দেওয়ালে টাঙ্গাইয়া দেওয়া হইল। ভক্তগণ দেবেন্দ্রনাথকে লইয়া এই ভাবে ১৩০৭ সালে ২৪শে বৈশাখ, ইং ১৯০০ সালের ৬ই মে রবিবার সন্ধ্যার সময় মহানন্দে কীর্ত্তন আরম্ভ করিয়া দিলেন। ইহাই বর্ত্তমান ইটালী শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ অর্চ্চনালয়ের * প্রতিষ্ঠার দিন।

* অতি প্রথমে ইহার কোন নাম ছিল না। ১৯০১ সালে স্বামীজি 'রামকৃষ্ণ মিশন' নামে ইহাকে অভিহিত করিয়া যান। এই নাম ১৯০৮ সাল পর্য্যন্ত প্রচলিত ছিল।

স্থান অতি সংকীর্ণ, তবুও দেবেন্দ্রনাথের প্রতি আকৃষ্ট শ্রীযুত সতীশচন্দ্র পাল, হেমচন্দ্র বসু, চন্দ্রকুমার দে, সূর্য্যকুমার দে, কালীনাথ মুখোপাধ্যায়, মতিলাল সরকার, নগেন্দ্রনাথ বসু, কানাইলাল পাল, হরিনাথ ঘোষ প্রভৃতি ভক্তগণ প্রত্যহই নিরূপিত সময়ে উপস্থিত হইতে লাগিলেন। সংকীর্ত্তনে কালীনাথের বিশেষ অনুরাগ ছিল। ইনি দেবেন্দ্রনাথকে গুরু বলিয়া মান্য করিতেন। ইনি অল্পদিন পরে দেহত্যাগ করেন। দেহত্যাগের সময় আপন গুরুদেবকে সম্মুখে দেখিয়া রামকৃষ্ণ নাম উচ্চারণ করিতে করিতে চক্ষু মুদ্রিত করিয়াছিলেন।

একদিন কীর্ত্তন আরম্ভ হইবার পূর্ব্বে হেমচন্দ্র দেবেন্দ্রনাথকে বলিয়াছিলেন, "মশাই, আমরা কিছুই জানি না, দয়া করিয়া আমাদের 'রামকৃষ্ণ' নাম-গান আপনাকে শেখাতে হবে।"

দেবেন্দ্রনাথ বলিলেন—"আমি কি জানি যে শেখাব? আমি যাবৎ বাঁচি, তাবৎ শিখি। তবে এই শুভকার্য্যে তোমাদের সহিত যোগদান করবো।" দেবেন্দ্রনাথ সংকীর্ত্তনস্থলে উপস্থিত হইলে প্রথম প্রথম ভক্তগণ উচ্চৈঃস্বরে "জয় রামকৃষ্ণ" বলিয়া জয়ধ্বনি করিতেন। তাহাতে দেবেন্দ্রনাথ বলিয়াছিলেন, "দেখ, এখন তোমরা ওরূপ ভাবে চীৎকার করিও না। এখন শুধু ধীরে ধীরে কার্য্য ক'রে যাও। প্রথমে অনেক বাধা-বিঘ্ন অতিক্রম করতে হবে, অনেক সহ্য করতে হবে।"

কীর্ত্তনান্তে "জয় গুরু, জয় গুরু; ওঁ গুরুদেব, ওঁ গুরুদেব"—বলিয়া দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরকে প্রণাম করিতেন। "জয় গুরু, জয় গুরু" বলিয়া

পরে শ্রীমৎ সারদানন্দ স্বামীর অনুরোধে বিশেষ কারণবশতঃ দেবেন্দ্রনাথ ইহার বর্ত্তমান নামকরণ করেন। আমরা পূর্ব্বাপর "অর্চ্চনালয়" নামই ব্যবহার করিব।

শ্রদ্ধার সহিত ভক্তগণও দেবেন্দ্রনাথের সহিত প্রণাম করিতেন। নবানুরাগী ভক্তগণের কীর্ত্তন শ্রবণ করিয়া ক্রমে ক্রমে অন্যান্য ভক্তগণ জুটিতে লাগিলেন। ইটালীর পালপাড়া হইতে শ্রীযুত দ্বারিকানাথ বিশ্বাস, বিনোদবিহারী পাল, মদনমোহন পাল, বীরেন্দ্রনাথ পাল, শ্যামাচরণ দাস (লালুবাবু), নিবারণচন্দ্র দাস, খগেন্দ্রনাথ সেন, চন্দ্রকুমার ভট্টাচার্য্য ও কেদারনাথ বিশ্বাস প্রভৃতি আসিলেন।

শ্রীরামকৃষ্ণ-সঙ্গীত রচনা।

এইরূপে প্রত্যহই সন্ধ্যার পর দেবেন্দ্রনাথ সংকীর্ত্তনে যোগ দিতে লাগিলেন এবং মধ্যে মধ্যে যাহাতে ভক্তগণের হৃদয়ে ভগবানে বিশ্বাস ও ভক্তি জন্মে, তাহার জন্য অতি সরল ভাষায় তত্ত্বকথা বুঝাইয়া দিতে লাগিলেন। ভক্তগণ দেবেন্দ্রনাথের মুখনিসৃঃত সুমধুর গল্প ও রসিকতাপূর্ণ বাক্য শ্রবণ করিয়া আপনাদিগকে ভাগ্যবান্ মনে করিতে লাগিলেন। তিনিও তাঁহাদিগকে উৎসাহিত করিবার জন্য মধ্যে মধ্যে এক একখানি সঙ্গীত রচনা করিয়া দিতেন।

"দিবা-বিভাবরী, ডাক প্রাণ ভরি,
জয় রামকৃষ্ণ ব'লে।" *

এই গানটী এই উপলক্ষে প্রথম রচিত হয়।

শ্রীরামকৃষ্ণ শিষ্যগণের আগমন।

এইভাবে রামকৃষ্ণ-নাম-কীর্ত্তন, দেবেন্দ্রনাথের মধুর উপদেশ ও ভালবাসার গুণে ভক্তমণ্ডলীমধ্যে অনুরাগের একটা জমাট বাঁধিয়া যায়। দেবেন্দ্রনাথ আপন গুরুভ্রাতৃগণের নিকট যাইয়া এ বিষয়ে উল্লেখ করেন এবং তাঁহাদিগকে ইটালী আসিয়া ঠাকুরের কার্য্যে সহায়তা

* দেবগীতি : ৪ পৃঃ দ্রষ্টব্য।

করিতে অনুরোধ করেন। তাঁহারাও এই সময় প্রায়ই ইটালী আসিয়া শ্রীশ্রীঠাকুরের নাম-কীর্ত্তন, পাঠ ইত্যাদি করিয়া ভক্তমণ্ডলীর উৎসাহ ও আনন্দ বর্দ্ধন করিতেন। হেমচন্দ্রের বাটীতে স্থানাভাব হইত বলিয়া ঐ সমুদয় কার্য্য দেবনারায়ণ বাবুর ঠাকুরদালানে সম্পন্ন হইত। উভয় স্থানেই ঠাকুরকে ভোগ দেওয়া হইত। ঠাকুরের আশ্রিত শ্রীযুত কালীপদ ঘোষ (দানা কালী) কাঁকুড়গাছি যোগোদ্যানের ভক্তমণ্ডলীসহ ১৯০০ সালের ১০ই এবং ১৩ই জুন তারিখে আসিয়া প্রায় রাত্রি ৩টা পর্য্যন্ত কীর্ত্তন করেন।

ঐ সালের ৩০ শে জুন স্বামী সারদানন্দ আসিয়া শাস্ত্রাদি পাঠ ও ব্যাখ্যা করেন। ইহার পর তিনি প্রায় দুই মাসকাল প্রতি শনিবারে নিয়মিতরূপে আসিয়া পাঠাদি করিয়াছিলেন। তৎপরে স্বামী শুদ্ধানন্দ ও কিছু কাল তাঁহার পরিবর্ত্তে কার্য্য করেন। তৎকালে ইটালী হইতে ভক্তগণও প্রায় প্রতি রবিবার বাগবাজার 'বলরাম মন্দিরে' যাইয়া কীর্ত্তন করিতেন।

স্বামী বিবেকানন্দের আগমন।

১৯০১ সালের ১৬ই ফেব্রুয়ারী প্রাতে ১০ টার সময় শ্রীমৎ স্বামী বিবেকানন্দ দেবনারায়ণ বাবুর বাটীতে আগমন করেন। তাঁহার সহিত এক জন জার্ম্মান সাহেব ও দশ জন সন্ন্যাসী আসিয়াছিলেন। স্বামীজি রাত্রিতে ঐ বাটীতে অবস্থান করেন। প্রায় সমস্ত সময়ই তিনি দেবেন্দ্রনাথের সহিত কথাবার্ত্তায় কাটাইয়াছিলেন। সন্ধ্যার প্রাক্‌কালে দেবেন্দ্রনাথ স্বামীজিকে লইয়া হেমচন্দ্রের বাটীতে শ্রীশ্রীঠাকুরের কীর্ত্তনের স্থান দেখাইতে লইয়া যান। পথিমধ্যে একটী ক্লান্ত মুটে ভারী মোট মাথায় করিয়া সম্মুখ হইতে আসিতেছিল। একজন

তাহাকে সরিয়া যাইতে বলায় স্বামীজি বলিলেন,—"কেন, ওর সরার চেয়ে আমাদের স'রে গেলেই ভাল হয় না?" এই বলিয়া স্বামীজি এক পাশে সরিয়া গেলেন।

ঠাকুরের স্থান দর্শন করিয়া স্বামীজি অত্যন্ত আহ্লাদিত হইলেন এবং ইহাকে 'ইটালী রামকৃষ্ণ মিশন' নামে অভিহিত করিয়া অনাথ, বিপন্ন ও পীড়িত লোকের সেবা করিতে বলিয়া যান। দেবেন্দ্রনাথ স্বামীজির এই সাধু সঙ্কল্প কার্য্যে পরিণত করিতে ভক্তগণকে উৎসাহিত করেন। তদবধি তাঁহারা দ্বারে দ্বারে যাইয়া মুষ্টিভিক্ষা ও অর্থ সংগ্রহ করিয়া মিশনের কার্য্য করিতে প্রবৃত্ত হন।

দেবেন্দ্রনাথ ও স্বামীজির ভালবাসা।

স্বামীজি ও অপর গুরুভ্রাতৃগণের উপর দেবেন্দ্রনাথের অগাধ ভক্তি বিশ্বাস ছিল। তিনি আপনাকে সর্ব্বাপেক্ষা ছোট জ্ঞান করিতেন। তাঁহাদের বাক্য গুরুবাক্যবৎ পালন করিতেন। তাঁহাদের গুণের কথা বলিতে বলিতে তিনি উত্তেজিত হইয়া উঠিতেন। স্বামী বিবেকানন্দের সুখ্যাতি তাঁহার এক মুখে ধরিত না, তিনি বলিতেন,—"এমন শক্তি-শালী পুরুষ কখনও দেখিতে পাওয়া যায় না। বিবেকানন্দ একটাই হয়, বনে একটা সিংহই থাকে।" স্বামী বিবেকানন্দও তাঁহাকে তেমনি ভালবাসিতেন। আমরা দেখিয়াছি স্বামীজি যখন বেলুড় মঠে অবস্থান করিতেন তখন দেবেন্দ্রনাথ প্রায়ই তাঁহাকে দর্শন করিতে যাইতেন।* দেবেন্দ্রনাথ তাঁহার সম্মুখে উপস্থিত হইলে স্বামীজি তাঁহার চতুর্দ্দিকে উপবিষ্ট ভক্ত ও দর্শকবৃন্দকে পরিত্যাগ করিয়া উঠিয়া

---

* সুরেনবাবু ও অনেক ভক্ত দেবেন্দ্রনাথের সঙ্গে মঠে যাইতেন। সুরেন বাবু স্বামিজীর সহিত দেবেন্দ্রনাথ প্রভৃতির ফটো তুলিয়াছিলেন।

দেবেন্দ্রনাথের কাঁধের উপর হাত দিয়া মঠের এক প্রান্ত হইতে অপর প্রান্ত পর্য্যন্ত অনেকক্ষণ ধরিয়া পাদচারণ করিতেন; কত গল্প, কত রসিকতা করিতেন। সহজে তাঁহাকে ছাড়িয়া দিতেন না।

দেবেন্দ্রনাথ একদিন বলিয়াছিলেন,—"পূর্ব্বে কোন এক সময়ে আমার মনে হতাশ ভাব উপস্থিত হওয়ায় নিজের মনকে এই বলিয়া আশ্বাস দিয়াছিলাম যে, যদিও ঠাকুর আমাকে পরিত্যাগ করেন, আমি বিবেকানন্দ স্বামী ও নাগ মহাশয়কে স্পর্শ করিয়াছি, আমার আবার ভাবনা কি?" তিনি প্রায়ই বলিতেন,—"এবারে রামকৃষ্ণ অবতারে দুইজনের আলোকে জগৎ আলোকিত হইয়াছে। স্বামীজির আলোক সূর্য্যালোকের ন্যায় প্রখর দীপ্তিশালী, উহাতে নয়ন ঝলসিয়া যায়। আর, নাগ মহাশয়ের আলোক চন্দ্রালোকের ন্যায় স্নিগ্ধ, সুশীতল— মন-প্রাণ শান্ত করিয়া দেয়!"

আমরা আরও দেখিয়াছি দেবেন্দ্রনাথ মঠে যাইয়া স্বামীজির পদধূলি গ্রহণ করিতে উদ্যত হইলে, স্বামীজি তাঁহাকে আলিঙ্গন করিয়া বলিতেন,—"দেবেন্ বাবু, তুমি বড় ভক্ত লোক, তোমার অঙ্গ-স্পর্শে আমার শরীর শীতল হয়, তোমায় কি পা ছুঁতে দিতে পারি?" কখনও আবার বলিতেন,—"দেবেন্ বাবু, ঠাকুর তোমায় বড় ভালবাসিতেন, আমি সে ভালবাসা কোথায় পাব যে পদধূলি দেবো?"

কীর্ত্তনে দেবেন্দ্রনাথের ভাব হয় দেখিয়া, স্বামীজি তাঁহাকে ভাব চাপিতে ও তিনি মৎস্য মাংস আহার করেন না জানিয়া, মৎস্য মাংস খাইতে অনুরোধ করিয়া বলেন,—"দেখ দেবেন্ বাবু, তোমার কিছু দিন বেশী বাঁচিয়া থাকা দরকার। তুমি অল্প ক'রে মাছ মাংস খেয়ো, আর বেশী ক'রে ফল খেয়ো।"

দেবেন্দ্রনাথ তাহাতে রহস্য করিয়া বলিয়াছিলেন,—"যদি কুমড়োর মত বড় বড় ফল এক পয়সায় একটা পাওয়া যায় তা হ'লে আমি খেতে পারি।"

ইহার উত্তরে স্বামীজি উত্তেজিত হইয়া বলিয়াছিলেন,—"যারা তোমার কাছে আসে তারা—বেচে দিতে পারে না ?"

দেবেন্দ্রনাথ এই কথা গুরুবাক্যবৎ জ্ঞান করিয়া তদবধি মৎস্য খাইতে আরম্ভ করেন, কিন্তু মাংস খাইতে তাঁহার রুচি হয় নাই।

দেবেন্দ্রনাথের মনোহর নৃত্য।

ভাবোন্মত্ত অবস্থায় দেবেন্দ্রনাথের মনোহর নৃত্য দেখিতে স্বামীজি অত্যন্ত ভালবাসিতেন। দেবেন্দ্রনাথের নৃত্য দেখিবার ইচ্ছা হইলেই স্বামীজি

"আমি মথুরা নগরে, প্রতি ঘরে ঘরে,
খুঁজিব যোগিনী হ'য়ে।
আমি যোগিনীর বেশে, যাব সেই দেশে,
যথায় নিঠুর হরি॥"

এই গানটী গাইতে আরম্ভ করিতেন। স্বামীজির গানে যে কি মোহিনী শক্তি ছিল তাহা সকলেই জানেন। গানটী শ্রবণ করিলেই দেবেন্দ্রনাথ আত্মহারা হইয়া যাইতেন। ভাবোন্মত্ত অবস্থায় বাহ্য-জ্ঞান রহিত হইয়া নৃত্য করিতে থাকিতেন।

স্বামীজি তাঁহাকে অনেক সময়ে "সখি" বলিয়া সম্বোধন করিতেন, আর বলিতেন,—"আমি অনেক বাইজীর নাচ দেখিয়াছি, কিন্তু এরূপ মধুর নৃত্য করিতে কাহাকেও দেখি নাই।" স্বামী অখণ্ডানন্দ আমাদিগকে এক সময় বলিয়াছিলেন,—"একদিন বলরামবাবুর বাটীতে

দাদা (দেবেন্দ্রনাথ) সখীভাবে প্রায় দুই ঘণ্টাকাল যে নৃত্য করিয়াছিলেন সে নৃত্যের তুলনা হয় না।”

ইটালীতে প্রথম উৎসব।

স্বামীজির দ্বারা উৎসাহিত হেমচন্দ্র প্রভৃতি ভক্তবৃন্দের হৃদয়ে শ্রীরামকৃষ্ণ-উৎসব করিবার বিশেষ ইচ্ছা জাগরূক হওয়ায় ১৩০৮ সনের ২৪শে বৈশাখ (১৯০১ সালের ৭ই মে) শ্রীশ্রীঠাকুরের এক উৎসব সম্পন্ন হয়। উৎসবকার্য্যে দেবেন্দ্রনাথ প্রথমে অমত প্রকাশ করেন, পরে ভক্তগণের আগ্রহ দেখিয়া সম্মতি দেন। হেমচন্দ্রের বাটীতে ভক্তগণ খিচুড়ী প্রসাদ গ্রহণ করেন। বৈকালে দেবনারায়ণ বাবুর পূজার দালানে ঠাকুরকে সাজান হয় এবং সুরেন বাবুদের কালী-কীর্ত্তন গান হয়। এই উপলক্ষে পরবর্ত্তী ১২ই মে তারিখ রবিবার শিবমন্দিরের মাঠে শ্রীরামকৃষ্ণ নাম-কীর্ত্তনান্তে দরিদ্রনারায়ণ ভোজন করান হয়। ইহাই ইটালীর প্রথম শ্রীরামকৃষ্ণ মহোৎসব। তদবধি প্রতিবৎসরই উৎসব হইয়া আসিতেছে।

উৎসবের পরদিবস (৮ই মে তারিখে) দেবনারায়ণ বাবুর বাটীতে উপরের বৈঠকখানায় সুকণ্ঠ গায়ক শ্রীযুত হরিনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের গান শ্রবণ করিয়া দেবেন্দ্রনাথের ভাব-সমাধি হয়। প্রায় এক ঘণ্টাকাল তিনি সমাধি অবস্থায় ছিলেন। সুরেন্দ্র বাবু প্রভৃতি তথায় উপস্থিত ছিলেন।

দেবেন্দ্রনাথ ১৩০৮ সালের ১০ই আশ্বিন পূর্ব্বের বাটী পরিত্যাগ করিয়া ৫৩ নং দেবলেনের বাটীতে উঠিয়া আসেন এবং তথায় মাত্র পাঁচ মাসকাল বাস করেন। এই বাটীতে অবস্থান কালে অন্নপ্রস্তুতের বিলম্ব আছে দেখিয়া স্নানান্তে দেবেন্দ্রনাথ বাটীর সম্মুখের রাস্তায়

পাদাচরণ করিতেছিলেন। সহসা দেখিলেন ঘর, দ্বার, বাটী, রাস্তা, বৃক্ষাদি তাঁহার সম্মুখ হইতে অন্তর্হিত হইয়া সুমহান্ অনন্তে মিশিয়া যাইতেছে, পরে জগতের অস্তিত্ব ও নিজের অস্তিত্ব পর্য্যন্ত লোপ হইয়া গেল। বাহ্যজ্ঞানশূন্য অবস্থায় কিয়ৎক্ষণ দণ্ডায়মান রহিলেন। অনেক ডাকাডাকির পর তাঁহার বাহ্যজ্ঞান ফিরিয়া আসিয়াছিল।

দ্বিতীয় উৎসব।

পুনরায় এই সনের ১লা ফাল্গুন, ইং ১৯০২ সালের ১৩ই ফেব্রুয়ারী বৃহস্পতিবার সরস্বতীপূজার দিন সুরেন বাবুদিগের বড়বাগানে দ্বিতীয় উৎসবকার্য্য সম্পন্ন হয়। দেবেন্দ্রনাথের ইচ্ছানুসারে ঠাকুরকে পত্রপুষ্পাদিতে সুসজ্জিত করা হয়—ঠাকুর সজ্জা সকলেরই হৃদয়গ্রাহী হইয়াছিল। এই উৎসবে স্বামী ব্রহ্মানন্দ প্রভৃতি সন্ন্যাসিগণ এবং বহু গৃহী ভক্তগণ আসিয়া যোগদান করিয়াছিলেন। শ্রীযুত রামলাল দাদা ঠাকুরের পূজা কার্য্য সম্পাদন করেন।

ইহার পর হইতে প্রতি শনিবারে দেবনারায়ণ বাবুদের ঠাকুর-দালানে রামকৃষ্ণ নামকীর্ত্তন ও সুরেন বাবুর 'কালীকীর্ত্তন' গান হইত। সম্মুখে ঠাকুরের ছবি সজ্জিত থাকিত এবং জিলিপী ভোগ দেওয়া হইত।

এই সালের ৪ঠা জুলাই তারিখে রাত্রি ৯॥ টার সময় স্বামী বিবেকানন্দ নশ্বর দেহ পরিত্যাগ করেন। এই সংবাদ পাইয়া পরদিবস অতি প্রত্যূষে দেবেন্দ্রনাথ শোকাকুলিত-চিত্তে উপেন্দ্রনারায়ণের সহিত বেলুড়মঠে উপস্থিত হন। স্বামীজির হঠাৎ অন্তর্দ্ধানে দেবেন্দ্রনাথের প্রাণে এত আঘাত লাগিয়াছিল যে, তিনি একেবারে বিবর্ণ হইয়া গিয়াছিলেন। স্বামীজির শোক সংবরণ করিতে তাঁহার অনেক দিন লাগিয়াছিল।

রায় মহাশয়ের উপহাস।

পূর্ব্বে দেবেন্দ্রনাথের দেশস্থ যে রায় মহাশয়ের কথা উল্লিখিত হইয়াছে, তিনি এই সময় দেবেন্দ্রনাথের নিকট সমাগত ভক্তদিগকে তাঁহার অসাক্ষাতে বলিতেন, "দেখ, তোমরা বাবাজির নিকট ধর্ম্মকথা কি জান্‌বে? ধর্ম্ম-কর্ম্ম কি অমনি হয়? কত যোগ কর্‌তে হয়— ধ্যান করতে হয়; আমি কত যোগ-ধ্যান করেছি, বাবাজি কি জানে?" ইত্যাদি ইত্যাদি। দেবেন্দ্রনাথ রায় মহাশয়ের বিপরীত উপদেশের কথা শুনিয়াও তাঁহাকে কিছুই বলিতেন না, শুধু বলিতেন, "তাঁহার মুখে 'বাবাজি' ডাক বড় মিষ্ট শুনায়"। রায় মহাশয় কিছু দিন পরেই অসুস্থ হইয়া দেবেন্দ্রনাথের নিকট হইতে চিরতরে প্রস্থান করেন।

ত্রয়োবিংশ পরিচ্ছেদ

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ অর্চ্চনালয়ের কার্য্য।

(১৯০২—০৬)

অর্চ্চনালয়ের বাটীতে দেবেন্দ্রনাথের বাস।

ভক্তমণ্ডলী কেবল কীর্ত্তন করেন, অন্য কোন সাধনা করেন না দেখিয়া দেবেন্দ্রনাথ একদিন বলিলেন, "দেখ বাপু, শুধু কীর্ত্তন কর্‌লে হবে না, মধ্যে মধ্যে নির্জ্জনে বসিয়া ধ্যান-ধারণাদি কর্‌তে হবে। তোমরা দেখিয়া শুনিয়া একখানি ঘর ভাড়া কর এবং সুবিধা ও অবসর-মত এক একজন করিয়া যাইয়া তথায় ধ্যান করিও।" দেবেন্দ্রনাথের কথায় উৎসাহিত হইয়া নবানুরাগে উন্মত্ত ভক্তগণ ঘরের সন্ধানে বহির্গত হইলেন। ১৩০৮ সনের ফাল্গুন, ইং ১৯০২ সালের ফেব্রুয়ারী মাসে বর্ত্তমানে যে বাটীতে শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ অর্চ্চনালয় প্রতিষ্ঠিত রহিয়াছে, সেই বাড়ীখানি দেখিয়া ভাড়া করা হইল।

দেবেন্দ্রনাথ যে বাড়ীতে ছিলেন, তথায় তাঁহার অসুবিধা হয় দেখিয়া ভক্তগণ স্থির করিলেন যে, এই বাড়ীর ভিতর-মহলে তিনি বাস করিবেন, আর বহির্ব্বাটীর দুইটী ঘর ভক্তদিগের জন্য ব্যবহৃত হইবে। সিদ্ধান্তমত ভক্তগণের অনুরোধে দেবেন্দ্রনাথ কয়েক দিন পরেই এই বাটীতে উঠিয়া আসিয়া ভিতরে বাস করিতে লাগিলেন। বাহিরের পূর্ব্বদিকের ঘরটীতে ভগবৎপ্রসঙ্গ ও কীর্ত্তনাদি এবং পশ্চিমদিকের ছোট ঘরটীতে বসিয়া ধ্যান-ধারণা ইত্যাদি চলিতে লাগিল। ধ্যানের ঘরের দেওয়ালে পূর্ব্বোক্ত ঠাকুরের ছবিখানি টাঙ্গাইয়া রাখা হইল।

রামকৃষ্ণ ঠাকুর দোলমঞ্চে।

প্রথমে শ্রীশ্রীঠাকুররে পূজা কিংবা ভোগরাগাদি কিছুই হইত না; শুধু ভক্তেরা তাঁহার সম্মুখে বসিয়া ধ্যান-জপাদি করিতেন মাত্র। ইহার পরেই দোল-পূর্ণিমার দিন হেমচন্দ্রের ঠাকুরকে সিংহাসনে বসাইয়া দোলাইবার ইচ্ছা হওয়াতে একটী সিংহাসন নির্ম্মাণ করাইয়া ভক্তগণ ঠাকুরকে দোলমঞ্চে স্থাপন করিলেন এবং দেবেন্দ্রনাথের নিকট হইতে,

"কে তুমি মোহন বেশে, দোলমঞ্চে দোল বসি,
তুমি কি গোকুলচন্দ্র! কোথা তবে চুড়া বাঁশী?"*

—এই দোলের গানটী রচনা করাইয়া লইলেন। ঐ দিবস সন্ধ্যার সময় এই গানটী গীত হয়।

পঞ্চমদোল—ভোগ আরম্ভ।

ইহার পর (১৩০৮ সালের ১৫ই চৈত্র) পঞ্চম দোলের দিন দেবেন্দ্রনাথের ভ্রাতৃজায়া কাহাকেও কিছু না বলিয়া সহসা শ্রীশ্রীঠাকুরকে অন্নভোগ দেওয়াতে দেবেন্দ্রনাথ মনে করিলেন, ঠাকুর ভক্তগণের সেবা গ্রহণ করিতে ইচ্ছা করিয়াছেন। তদবধি শ্রীরামকৃষ্ণদেবের নিত্য পূজা ও ভোগরাগ শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ-অর্চ্চনালয়ে আরম্ভ হয় এবং এখন পর্য্যন্ত তদনুসারে চলিয়া আসিতেছে। এই পঞ্চম দোলের দিন সন্ধ্যার পর অর্চ্চনালয়ে সুরেন বাবুর কালীকীর্ত্তন গান এবং প্রসাদ বিতরণ হয়।

শ্রীশ্রীঠাকুরের স্থান প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে জানিয়া শ্রীযুক্ত গিরিশচন্দ্র আহ্লাদিত হইয়া ঐ সালের ২৩শে জুন তারিখে দেবেন্দ্রনাথের সহিত সাক্ষাৎ করিতে আসেন।

---

* দেবগীতি ৪৪ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য।

বারো মাসে তেরো পার্ব্বণ।

বর্ত্তমান ৩৯ নং দেব লেনে অর্চ্চনালয় স্থাপিত হওয়ায় হেম-চন্দ্রের বিশেষ সুবিধা হইয়াছিল। কারণ, তিনি সর্ব্বদা দেবেন্দ্রনাথের নিকট অবস্থিতি করিবার সুযোগ পাইয়াছিলেন। তাঁহারই কৃপায় হেমচন্দ্রের অন্তরে ভগবদ্ভক্তি ও ভালবাসা দিন দিন পরিবর্দ্ধিত হইতে লাগিল, শ্রীশ্রীঠাকুর ও গুরুদেবের সেবায় মন-প্রাণ ঢালিয়া দিলেন এবং ভক্তগণকে লইয়া "বারো মাসে তেরো পার্ব্বণ" করিতে লাগিলেন।

হেমচন্দ্রের আগ্রহে অর্চ্চনালয়ের উন্নতি।

হেমচন্দ্র মুক্তহস্ত পুরুষ ছিলেন। শ্রীশ্রীঠাকুরের কার্য্যে অকাতরে অর্থব্যয় করিতেন এবং ঠাকুরবাড়ীর প্রয়োজনীয় আসবাবপত্র প্রস্তুত করিয়া বা ক্রয় করিয়া দিতে লাগিলেন। এ কথা বলিলে অত্যুক্তি হইবে না যে, হেমচন্দ্রের বিশেষ আগ্রহে ও পরিশ্রমেই শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ অর্চ্চনালয় গঠিত হইয়াছে এবং উন্নতি লাভ করিয়াছে। হেমচন্দ্র স্বয়ং ঠাকুরঘরের সমুদয় কার্য্য সম্পন্ন করিতেন। এতদ্ব্যতীত দেবেন্দ্রনাথ-প্রবর্ত্তিত আতুর-অনাথাদিগের জন্য নির্দ্দিষ্ট বাড়ী বাড়ী হইতে মুষ্টিভিক্ষার চাউল আদায় করিয়া স্বয়ং তাহা বহন করিয়া আনিতেন। ঠাকুরবাড়ীর কার্য্য উপস্থিত হইলে হেমচন্দ্রের নিজ সংসারের কোন কথা মনে থাকিত না। পরম উৎসাহে অগ্রে ঠাকুরের কার্য্য সম্পাদন করিতেন। শ্রীযুত সতীশচন্দ্র, হরিনাথ (বড় বাবু), ও বিনোদবেহারী প্রভৃতি ক্রমশঃ এই সকল কার্য্যে হেমচন্দ্রের সহিত যোগদান করিতে থাকেন। অদ্যাপিও ঐসমুদয় কার্য্য অর্চ্চনালয়ে সম্পাদিত হইয়া আসিতেছে।

শ্রীমৎ অখণ্ডানন্দ স্বামীজির আশ্রমে সাহায্য।

দেবেন্দ্রনাথ ১৯০১ সাল হইতে প্রথম প্রথম নিজে, পরে এই সকল ভক্তগণ দ্বারা লোকের নিকট হইতে ভিক্ষা করিয়া ন্যূনপক্ষে মাসে পনর টাকা করিয়া স্বামী অখণ্ডানন্দ মহারাজ-প্রতিষ্ঠিত মুর্শিদাবাদ আশ্রমে প্রেরণ করিতেন। শ্রীযুত উপেন্দ্রনারায়ণ দেব এই সৎকার্য্যে দেবেন্দ্রনাথের সহিত যোগদান করায়, তাঁহার অত্যধিক আগ্রহ ও পরিশ্রমের ফলে ভিক্ষালব্ধ অর্থ অনেক বর্দ্ধিত হইয়াছিল। দেবেন্দ্রনাথ এই অখণ্ডানন্দ স্বামীর সাধুসংকল্পে উৎসাহ ও সাহায্যদান করাতে স্বামীজি তাঁহাকে আশ্রমের হিতকারী বন্ধু বলিয়া সর্ব্বদা আনন্দ প্রকাশ করেন এবং প্রায়ই ইটালীতে আসিতেন। দেবেন্দ্রনাথের এই আরব্ধ কার্য্যটী পরে মিরাটস্থিত ভক্তগণ বহুদিন পর্য্যন্ত নিয়মিত-ভাবে চালাইয়া অসিয়াছিলেন। নানা কারণে ইহা এখন বন্ধ আছে।

তৃতীয় উৎসব।

উৎসবকার্য্যে সকলের উৎসাহ দেখিয়া দেবেন্দ্রনাথ ভক্তগণের সুবিধার জন্য সন ১৩০৯ সালের ২৪শে ফাল্গুন, ইং ১৯০৩ সালের ৮ই মার্চ্চ গুডফ্রাইডের পর রবিবার উৎসবের দিন নির্দ্ধারণ করেন। সুরেন বাবুদের বড়বাগানে তৃতীয় বার্ষিক উৎসব সম্পন্ন হয়। ঠাকুরসজ্জা, কীর্ত্তন, দরিদ্রনারায়ণ ও ভক্ত সেবা উৎসবের প্রধান অঙ্গ ছিল। এই বৎসর হইতে প্রতি বৎসর গুডফ্রাইডের রবিবারে ইটালীতে উৎসব হইয়া আসিতেছে। এবারের উৎসবেও স্বামী ব্রহ্মানন্দ মহারাজ, শ্রীযুত গিরিশ বাবু, মাষ্টার মহাশয়, মহিম বাবু, শিষ্টার নিবেদিতা ও ক্রিশ্চিয়ানা এবং শ্রীযুক্ত হরমোহন মিত্র প্রভৃতি উপস্থিত থাকিয়া সকলের আনন্দবর্দ্ধন করেন। শিষ্টার নিবেদিতা উৎসবে দরিদ্র-

দেবেন্দ্র চক্রবর্ত্তী, অজ্ঞাত, অজ্ঞাত, অবিনাশ মুখোপাধ্যায়, (সিঁথির) মহেন্দ্র কবিরাজ, বিজয় মজুমদার
দানা কালী, দেবেন্দ্রনাথ, স্বামী অদ্বৈতানন্দ,
তারক দত্ত, অক্ষয় মাষ্টার, গিরিশচন্দ্র, স্বামী অদ্ভুতানন্দ, মহেন্দ্র মাষ্টার।
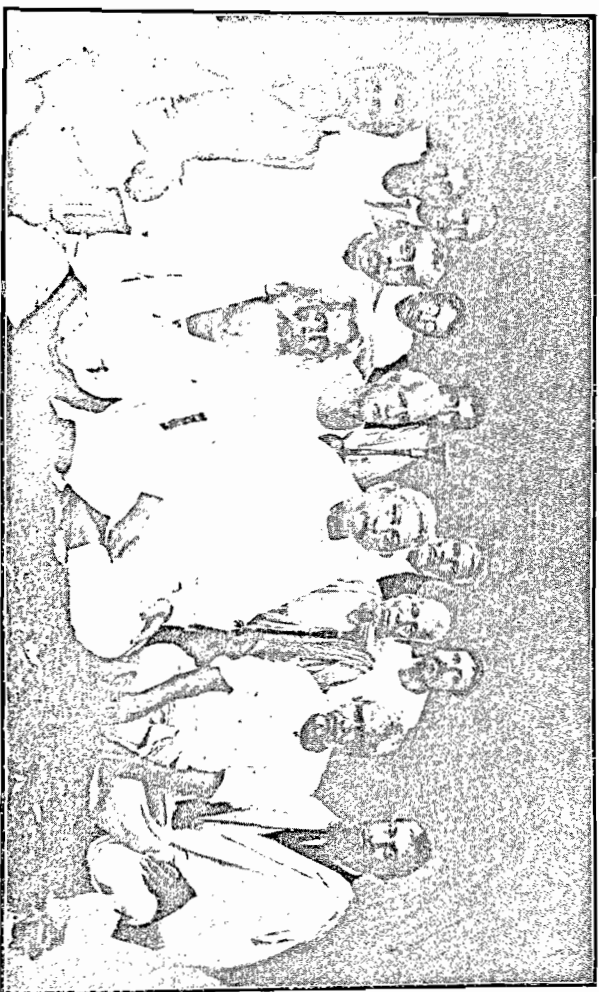
নারায়ণগণের ভোজনের পর উচ্ছিষ্ট পাতা পরিষ্কার করিতে আরম্ভ করেন, অনেকের অনুরোধে সামান্য করিবার পর ক্ষান্ত হন।

শ্যালালোক সব্ আন্ধা হ্যায়।

পূর্ব্বোক্ত সতীশচন্দ্র যখন দেবেন্দ্রনাথের নিকট প্রথম আসেন, তখন তিনি মেডিকেল কলেজের ছাত্র। তিনি বাড়ী হইতে মৌলালীর দরগার নিকট সার্কুলার রোডে যাইলে একটী লোক কিছুদিন পর্য্যন্ত প্রত্যহ ঠিক একই সময়ে "এ শ্বশুরা, এ শ্বশুরা" বলিতে বলিতে শেয়ালদহ মোড় অবধি তাঁহার পিছন পিছন যাইত। এই কথা দেবেন্দ্রনাথকে বলায়, দেবেন্দ্রনাথ ঐ লোকটীকে দেখিতে ইচ্ছা করেন। কয়েক দিন পরেই ঐ লোকটী স্বয়ং দেবেন্দ্রনাথের বাড়ীর জানালার নিকট আসিয়া দাঁড়াইয়া দাঁড়াইয়া তাঁহাকে দেখিত। দেবেন্দ্রনাথকে সে কি বুঝিয়াছিল, সেই জানিত। তদবধি কিন্তু সে রাত্রিতে ইটালীর রাস্তায় রাস্তায়—"ইয়ে শ্যালালোক সব্ আন্ধা হ্যায়, শ্যালালোক সব্ আন্ধা হ্যায়"—এই বলিয়া উচ্চৈঃস্বরে চীৎকার করিয়া বেড়াইত। ইহার অর্থ, বাড়ীর নিকট মহাপুরুষ অবস্থান করিতেছেন, অথচ কেহ তাঁহাকে চিনিতে পারিতেছে না। তাহাকে সকলে পাগল মনে করিত। কিছুদিন পরে সে চলিয়া যায়, আর তাহাকে কেহ কখনও দেখিতে পায় নাই।

দেবেন্দ্রনাথের ভগবৎ কথা।

অর্চ্চনালয় স্থাপিত হইবার পর দেবেন্দ্রনাথের নিকটে তত্ত্বজিজ্ঞাসু ব্যক্তিগণের সমাগম ক্রমশঃ বৃদ্ধি পাইতে লাগিল। ঐ সময় যোগোদ্যানের ভক্ত শ্রীযুত তারকনাথ দত্ত, অক্ষয়কুমার পাত্র, বিজয়নাথ মজুমদার, স্বামী যোগবিনোদ ও আহিরীটোলা হইতে শ্রীযুত নিবারণচন্দ্র

দত্ত, চন্দ্রকুমার চট্টোপাধ্যায়, খগেন্দ্রবাবু প্রভৃতি ভক্তগণ আসিয়া রাত্রিতে থাকিতেন। দেবেন্দ্রনাথ তাঁহাদিগের সহিত অনবরত ভগবৎ-কথা কহিতেন। কথাপ্রসঙ্গে অনেক দিন রাত্রি দুইটা, আড়াইটা বাজিয়া যাইত, তবুও দেবেন্দ্রনাথের কথার বিরাম নাই। তিনি ঠাকুরের প্রসঙ্গে কথা বলিতে কখনও ক্লান্ত হইতেন না। এমন কি, নিয়মিত সময়ে স্নানাহার করিতে ভুলিয়া যাইতেন। শ্রোতৃবর্গ মুগ্ধ হইয়া কেবল দেবেন্দ্রনাথের জ্যোতিঃপূর্ণ মুখকান্তির দিকে চাহিয়া বাক্যামৃত পান করিতেন; তাঁহারাও আহারাদির বিষয় একেবারে ভুলিয়া যাইতেন। এইরূপ প্রায় নিত্যই ঘটিত। অনেক ডাকাডাকির পর কোন দিন অতিরিক্ত বেলায়, কোন দিন বা রাত্রি দ্বিপ্রহরের সময় আহার করিতে যাইতেন। শেষ-জীবনে আহারাদি একটু নিয়মিত সময়ে করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন, কারণ, তখন তাঁহার শরীর একেবারে ভাঙ্গিয়া পড়িয়াছিল।

কে কাহার গুরু ?

দেবেন্দ্রনাথ কখনও গুরুর আসন গ্রহণ করেন নাই। ঠাকুরের কথার পুনরুল্লেখ করিয়া বলিতেন—"কে কাহার গুরু ? একমাত্র ঈশ্বরই সকলের গুরু। চাঁদা মামাই সকলের মামা।" প্রথম প্রথম তিনি লোকদিগকে নিজ পাদস্পর্শপূর্ব্বক প্রণাম করিতে দিতেন না। কেহ কেহ জোর করিয়া পাদস্পর্শ করিলে অত্যন্ত ব্যথিত ও কুণ্ঠিত হইতেন। পরে এক ব্যক্তি তাঁহাকে একদিন বলিলেন, "আপনি কেন মনে করেন যে, সকলে আপনাকে প্রণাম করিতেছে ? সকলেই সেই ঠাকুরকে প্রণাম করিতেছে, ইহা মনে করিলেই হয়।" এইরূপে কিছুদিন কাটিলে, সমাগত ভক্তগণ তাঁহার পাদস্পর্শ করিতে না পাইলে অত্যন্ত

দুঃখিত হন দেখিয়া, কোমলহৃদয় দেবেন্দ্রনাথ নিজ সংকল্প ত্যাগ পূর্ব্বক সকলকে পাদস্পর্শ করিয়া প্রণাম করিতে দিতেন; কিন্তু তাঁহাকে প্রণাম করিবার অগ্রেই তিনি তাঁহাদিগকে হাত যোড় করিয়া প্রণাম করিতেন।

আমাকে রক্ষা কর্‌বার একজন আছেন।

ভাল মন্দ, সরল ও অসরল লোক সকল স্থানের ন্যায় ইটালীতেও যথেষ্ট ছিল। এইরূপ একজন কুটিলপ্রকৃতির লোক দেবেন্দ্রনাথের এক ভক্তকে একদিন বলিল, "দেখ না, উহার শীঘ্রই পতন হইবে। সকলে পায়ে হাত দিয়া প্রণাম করিলে অভিমানবৃদ্ধি হইবে, আর তাহাতেই পতন ঘটিবে।" ভক্তপ্রমুখাৎ এই কথা শ্রবণান্তে দেবেন্দ্রনাথ বলিয়াছিলেন,—"ওরে, আমাকে রক্ষা কর্‌বার একজন আছেন, যিনি এত কাল ধ'রে আমাকে রক্ষা ক'রে আস্‌ছেন, এখনও তিনিই আমাকে রক্ষা কর্‌বেন।"

ঈশ্বরে সম্পূর্ণ নির্ভরতা।

ইটালীতে আগমনের পর হইতেই দেবেন্দ্রনাথের ভগবানে আত্ম-সমর্পণের ভাব বিশেষরূপে পরিস্ফুট হইতে আরম্ভ হয়। নিজ হইতে ঠাকুরের নাম প্রচার বা আপন অন্তরের ভাব প্রকাশ করিতে তাঁহাকে কখনও প্রয়াস পাইতে দেখা যায় নাই; উহা আপনা হইতেই প্রকাশ পাইয়াছে। ভক্তসমাগম, কীর্ত্তন, ঠাকুর-প্রতিষ্ঠা, উৎসব, ভোগরাগাদি যাহা কিছু অনুষ্ঠিত হইয়াছে, সকলই ভগবদিচ্ছায় ঘটিতেছে বুঝিয়া দেবেন্দ্রনাথ তাহা গ্রহণ করিয়াছেন এবং যন্ত্রের ন্যায় কার্য্য করিয়া গিয়াছেন। এই সকল ব্যাপারের আলোচনা করিলে তাঁহার চরিত্রের বিশেষত্ব, নিরভিমানিতা, ধৈর্য্য, ক্ষমা, ঈশ্বরে সম্পূর্ণ নির্ভরতা, সরলতা

প্রভৃতি গুণের পরিচয় পাওয়া যায়। এ বিষয় তাঁহার নিম্নলিখিত পত্রাংশ হইতে বেশ সুস্পষ্ট বুঝিতে পারা যায় :—

"প্রিয়—! তোমার মধ্যম ভ্রাতা * * এখানে আসিয়া উপস্থিত। তাহার আসিবার ব্যাপার শুনিয়া আশ্চর্য্য হইলাম। সে বলিল,—'* * * দাদা বলিলেন, একবার তাঁহাকে দেখিয়া এস। মনে করিলাম, আমি স্বেচ্ছায় যাইব না। যদি তাঁহার কোন ক্ষমতা থাকে, তিনি আমাকে আকর্ষণ করিয়া লইতে পারেন। শেষে ছুটীর যখন কেবলমাত্র তিন দিন বাকী আছে, তখন আপনাকে দেখিবার জন্য মনের ভিতর এমন ব্যাকুলতা জন্মিল যে, আমি কোন-মতে স্থির হইতে পারিলাম না। কিন্তু দশ মাসের আমার একটী সন্তানের পীড়া ছিল। * * তাহার চরম অবস্থা জানিয়া ঘর হইতে বাহির করা হইল। * * ঠাকুরের ছবির দিকে আমি চাহিয়া বলিতে লাগিলাম, 'ঠাকুর, তুমি কি আমাকে যাইতে দিবে না?' তাহার পরেই আশ্চর্য্য দেখিলাম; ঘণ্টা কয়েকের মধ্যে তাহার সে অবস্থা গিয়া দুগ্ধ পান করিল। উহা দেখিয়াই আপনার নিকট আসিবার ইচ্ছা আরও প্রবল হইয়া উঠিল। * * আর এক বিভ্রাট উপস্থিত। হাতে একটী পয়সা নাই, ছুটী ফুরাইয়া গিয়াছে, সুতরাং যাহা কিছু আনিয়াছিলাম, সব খরচ হইয়া গিয়াছে। যাহা হউক, যাইতে হইবে। আহার করিতে বসিয়াছি, কর্ম্মস্থান হইতে ৩৮৲ টাকার মনি অর্ডার আসিয়া উপস্থিত। হর্ষে, বিস্ময়ে খাওয়া হইল না। * * * অদ্য আপনার চরণতলে হাজির হইয়াছি।'

"* * * এই সমস্ত শুনিয়া তো অবাক্ হইয়া গেলাম। হে— ম—কে বলে যে, যদি আসিয়াছেন * * * প্রভৃতি ভাল ভাল লোক আছেন, তাঁহাদের সহিত দেখা করিয়া যান। ম—বলিল, 'আমি

যাঁহাকে দেখিতে আসিয়াছি, দেখিলাম। আমার যাঁহাকে দরকার, পাইয়াছি।'—এ কি বিশ্বাস !!! সত্যি বল্‌ছি, তুমি বল্‌তে পার, এ সব ব্যাপার কি ? আমি তো হতভম্ব হয়ে গেছি। ঠাকুর এ সব কি কোরছেন ? আমি অবসর লইবার যত চেষ্টা কচ্ছি, ততই কি জড়িয়ে ধচ্ছে ? এদিকে আর এক ব্যাপার,—যত থিয়োজফিষ্ট আমদানী হইতেছে। তাঁহারা সব বিদ্বান্ লোক—এম, এ ; বি, এ ;—কেহ উকিল, কেহ উচ্চপদস্থ ! এই সব ব্যাপার দেখিয়া আমি কিছুই বুঝিতে পারিতেছি না। যাহা হয় হউক—তাঁহার ইচ্ছা যাহা, তাহাই হইবে।"

"যাঁর কথায় লোকে ভগবান্ বিশ্বাস করে, সে বড় না আমি বড় ?"

দেবেন্দ্রনাথ সমাগত ভক্তগণকে শ্রীশ্রীঠাকুরের উপদেশাবলী গ্রন্থাদি হইতে পাঠ করিয়া শ্রবণ করাইতেন এবং অবসর পাইলে ভক্তবৃন্দ সমভিব্যাহারে নিজ গুরুভ্রাতৃগণের নিকট যাইতেন ও তাঁহাদের উপদেশ শ্রবণ করাইতেন। এক দিবস দেবেন্দ্রনাথ ভক্তমণ্ডলী সঙ্গে গিরিশ বাবুর নিকট গমনপূর্ব্বক তাঁহার সুখ্যাতি করায় উত্তরে গিরিশ বাবু বলিয়াছিলেন,—"দেখুন দেবেন্ বাবু, ও সব আপনি অন্য স্থানে বলবেন। যাঁর কথায় লোকে ভগবান্ বিশ্বাস করে, সে বড়, না আমি বড় ?"

আশ্রিত ভক্তসংখ্যা ক্রমশঃ বৃদ্ধি পাইতে লাগিল ; শ্রীযুক্ত অমলচন্দ্র মিত্র ও কৃষ্ণকুমার ভট্টাচার্য্য প্রভৃতি বালক ভক্তগণ অর্চ্চনালয় স্থাপনের সময়, তাঁহাদের বাড়ী অর্চ্চনালয়ের নিকটবর্ত্তী থাকায় মধ্যে মধ্যে তথায় আসিতেন ; পরে ১৯০৪ সাল হইতে প্রকাশ্যভাবে তাঁহারা আসিতে লাগিলেন। ইঁহাদের পর শ্রীযুক্ত সত্যেন্দ্রনাথ দাস এবং

বিমলচন্দ্র পাল, কৃষ্ণকুমার মজুমদার, নগেন্দ্রনাথ রাম, প্রফুল্লচন্দ্র মিত্র আসেন। ভবানীপুর হইতে শ্রীযুত কুমুদচন্দ্র মণ্ডল আসিয়া দেবেন্দ্রনাথের আশ্রয় গ্রহণ করেন। এই সালে ১০ই জুলাই তারিখে দেবেন্দ্রনাথ একবার তাঁহার বাড়ী গিয়াছিলেন; তাঁহার যত্ন ও ভক্তি দেখিয়া তিনি বিশেষ সুখী হইয়াছিলেন।

শ্রীশ্রীঠাকুর রথে—শ্রীশ্রীমার আগমন।

এই বৎসর হেমচন্দ্রের ঠাকুরকে রথে বসাইবার জন্য একান্ত সাধ হওয়ায় তিনি দেবেন্দ্রনাথের অনুমতি প্রার্থনা করিলেন। দেবেন্দ্রনাথ প্রথমে আপত্তি করিয়া অনেক বুঝাইলেন, পরে তাঁহার আগ্রহাতিশয্যে অনুমতি দিলেন। অনুমতি পাইয়া হেমচন্দ্র একখানি কাগজের রথ পুষ্পদামে সজ্জিত করেন এবং সেই রথে ঠাকুরকে বসাইয়া টানা হয়। এই উপলক্ষে শ্রীশ্রীমাতাঠাকুরাণী অর্চ্চনালয়ে আগমন করেন এবং দেবেন্দ্রনাথ একটী গান রচনা করিয়া বালকগণের দ্বারা তাঁহার নিকট গান করান। ইহাতে মাতাঠাকুরাণী আনন্দে অশ্রু বিসর্জ্জন করিতে করিতে বালকগণকে ক্রোড়ে টানিয়া লইয়া আশীর্ব্বাদ করেন এবং তাহাদিগকে মিষ্টান্ন-ভোজন জন্য দেবেন্দ্রনাথের হস্তে দুইটী টাকা প্রদান করেন।

পূর্ব্বে মাতাঠাকুরাণী দেবেন্দ্রনাথের সহিত ঘোমটা খুলিয়া কথা কহিতেন না, কিন্তু অদ্যকার গান শ্রবণে অত্যন্ত আনন্দিত হইয়া তাঁহার সহিত কথা কহিয়া তাঁহাকে আশীর্ব্বাদ করিয়া যান। এই ব্যাপারে সকলের যে কিরূপ আনন্দ হইয়াছিল, দেবেন্দ্রনাথের নিম্নোদ্ধৃত জনৈক ভক্তের নিকট লিখিত পত্রাংশ হইতে তাহার আভাষ প্রাপ্ত হওয়া যায়ঃ—

শ্রীশ্রীমাতাঠাকুরাণী

"তোমার ভাগ্যের কথা আমি আর কি লিখিব? তোমার প্রেরিত টাকায় মহামায়ীর পূজা হইয়াছে। আমি ইহাতে যে কি সন্তোষ লাভ করিয়াছি, তাহা ব্যক্ত করিবার শক্তি আমার নাই। হেম বাবুর রথযাত্রা উপলক্ষে মাতাঠাকুরাণী এ বাটীতে আসিয়াছিলেন এবং যথেষ্ট আনন্দ ও কৃপা প্রকাশ করিয়া গিয়াছেন, বালকদিগের সঙ্গীতে তিনি অতিশয় মুগ্ধ হইয়াছিলেন; ইটালীস্থ ভক্তদিগকে যাহার-পর-নাই আশীর্ব্বাদ করিয়া গিয়াছেন। সে আনন্দের কথা কালি কলমে ব্যক্ত হইবার নহে। বালকদিগের গীতটী পরপৃষ্ঠায় লিখিত হইল।" * * *

"এল তোর দুষ্টু ছেলে, তুষ্টু করে নে মা কোলে"।*

দেবেন্দ্রনাথের চন্দ্রকুমারকে সেবা।

পূর্ব্বোক্ত কালীনাথ মুখোপাধ্যায়ের ন্যায় চন্দ্রকুমার দেবও দেবেন্দ্র-নাথকে গুরুজ্ঞানে মান্য করিতেন। তিনি সদাসর্ব্বদা তাঁহার নিকট আসিতে না পারিলেও অন্তরের সহিত দেবেন্দ্রনাথকে শ্রদ্ধা করিতেন। ১৯০৪ সালে তিনি পীড়িত হন, দেবেন্দ্রনাথ প্রায়ই তাঁহাকে দেখিতে যাইতেন এবং সাগু ইত্যাদি নিজ হস্তে প্রস্তুত করিয়া খাওয়াইতেন ও সেবাশুশ্রূষা করিতেন। একদিন দেবেন্দ্রনাথকে তিনি বলিয়াছিলেন, "আমি বেশ বুঝিতে পারিয়াছি, আপনি মানুষ নহেন—দেবতা! যদি আমি এবার সেরে উঠ্তে পারি, তবে সকলকে ডেকে বল্ব যে, দেবেন্দ্রনাথ মানুষ নহেন—দেবতা।" চন্দ্রকুমার কি ভাবে দেবেন্দ্রনাথকে দেখিয়াছিলেন বা বুঝিয়াছিলেন, তিনিই

* দেবগীতি ৪৪ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য।

জানিতেন ; কিন্তু দুঃখের বিষয়, তাঁহার এই ইচ্ছা পূর্ণ হইল না, সেই অসুখেই তাঁহার মৃত্যু হয়।

১৯০৫ সালের শেষভাগে বিক্রমপুর, পাইকপাড়ানিবাসী শ্রীযুত জগদীশকুমার মজুমদার আসিয়া দেবেন্দ্রনাথের আশ্রয় গ্রহণ করেন। ১৯০৬ সালের এপ্রিল মাসে ঢাকা, বেঞ্জরা গ্রামনিবাসী শ্রীযুত হরেন্দ্রকুমার নাগ জগদীশকুমারের সহিত দেবেন্দ্রনাথকে দর্শন করিতে আসেন। জগদীশকুমার ও হরেন্দ্রকুমার উভয়েই সাধু নাগ মহাশয়কে দর্শন করিয়াছিলেন। হরেন্দ্রকুমার নাগমহাশয়ের কৃপা প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। নাগমহাশয়ের স্মৃতি দেবেন্দ্রনাথের বড়ই আদরের পুণ্যস্মৃতি। ইঁহারা দুইজনে প্রায়ই একসঙ্গে আসিতেন। ইঁহাদের দেখিলে তাঁহার নাগমহাশয়ের কথা মনে পড়িত। একদিন রাত্রিতে ঠাকুরবাটীতে ইঁহারা দুইজন ও বড় বাবু (শ্রীযুত হরিনাথ ঘোষ) বসিয়া আছেন, এমন সময় দেবেন্দ্রনাথ বড়বাবুর দিকে চাহিয়া, "ইঁহারা বড় আপনার, বড় আপনার"—এই বলিতে বলিতে সমাধিস্থ হইয়া পড়েন। সমাধি অনেকক্ষণ স্থায়ী ছিল।

ইঁহাদের সহিত ময়মনসিংহের শ্রীযুত শশিভূষণ দাসও আসিতেন। এই সময় ভবানীপুর হইতে শ্রীযুত হেমচন্দ্র রায়, নফরচন্দ্র কুণ্ডু, সিদ্ধেশ্বর রায়, যামিনীনাথ মণ্ডল, হেমচন্দ্র ভট্টাচার্য্য, বসন্তকুমার ঘোষ, রাজেন্দ্রনাথ মণ্ডল প্রভৃতি ভক্তগণ আসিয়া দেবেন্দ্রনাথের আশ্রয় লাভ করেন। স্থানীয় ভক্তগণ অবসর পাইলেই দেবেন্দ্রনাথকে দর্শন করিতে আসিতেন। দূরস্থ ভক্তবৃন্দ প্রায় প্রত্যহই সন্ধ্যার পূর্ব্বে সমাগত হইতেন। শনি ও রবিবারে ভক্তসমাগম অধিকতর হইত। দেবেন্দ্রনাথও উপদেশাবলী সুমধুর গল্পচ্ছলে বলিয়া তাঁহাদের মনে ভগবান্‌-লাভের আকাঙ্ক্ষা জাগাইয়া দিতেন।

ইহার পর হইতে ইটালী ও অন্যান্য স্থান হইতে হিন্দু, মুসলমান, ইহুদী ও খৃষ্টিয়ান্ প্রভৃতি নানা সম্প্রদায়ের লোক তাঁহাকে দর্শন করিতে আসিতে লাগিল।

'সর্ব্বং খল্বিদং ব্রহ্ম' মুখে আওড়াইলে কি হইবে?

এই সময় এক দিবস বাগবাজার হইতে একজন বৃদ্ধ পণ্ডিত ব্রাহ্মণ দেবেন্দ্রনাথকে দর্শন করিতে আসিয়া বলেন,—"মহাশয়, আমি ৺কাশীতে এই বৃদ্ধ বয়স পর্য্যন্ত থাকিয়া বেদান্ত চর্চ্চা করিয়াছি; উপনিষদের মতে 'সর্ব্বং খল্বিদং ব্রহ্ম', কিন্তু আজীবন ইহার চর্চ্চা করিয়াও এখন সর্ব্বভূতে ব্রহ্ম দর্শন করিতে পারিলাম না। পূর্ব্বে আমার নিকট যে বৃক্ষ ছিল, এখনও সেই বৃক্ষই আছে, যেমন গরু ছিল, তেমন গরুই রহিয়াছে; এমন কি, মনুষ্যে যে ব্রহ্মের অধিষ্ঠান, তাহাও বুঝিতে পারিলাম না। জানি না, বেদান্তবাক্য সত্য কি না! কিন্তু এখন জীবনের শেষ-সীমায় উপনীত হইয়াছি, কবে আর ব্রহ্মোপলব্ধি হইবে?" ব্রাহ্মণ অতি কাতরতা-ব্যঞ্জক স্বরে এই কথা কয়েকটী বলিলেন।

ব্রাহ্মণের কাতরোক্তিতে ব্যথিত হইয়া দেবেন্দ্রনাথ বলিতে লাগিলেন,—"আপনি বৃক্ষকে বৃক্ষ, গরুকে গরু বলিয়া দেখিয়াছেন মাত্র। উহাদের নানা অবস্থার পরিবর্ত্তনের মধ্যে যে একটী অপরিবর্ত্তনীয় বস্তু আছে, তাহা ত কখনও লক্ষ্য করেন নাই। প্রত্যেক বস্তুতেই এইরূপ দেখতে অভ্যাস কর্‌তে হয়, আবার এই বস্তু সমষ্টির পরিবর্ত্তনের ভিতরেও অপরিবর্ত্তনীয়—বহুতে এক বস্তু—দেখতে চেষ্টা কর্‌তে হয়। সঙ্গে সঙ্গে নিজের দৈহিক ও মানসিক পরিবর্ত্তনের বিষয়ও ভাবতে হয়; আপনার পরিবর্ত্তনের ভিতরও নিত্য বস্তুর

সন্ধান করতে হয়। ইহার অনুভব হইলেই সর্ব্বভূতে ব্রহ্মদর্শন ঘটে। নতুবা, শুধু 'সর্ব্বং খল্বিদং ব্রহ্ম' মুখে আওড়াইলে কি হ'বে? আপনি যদি এই ভাবে সর্ব্বত্র ব্রহ্ম বিরাজমান রহিয়াছেন ধারণা করবার জন্য অনন্যচিত্ত হইয়া সাধনা করতেন, তাহা হইলে অবশ্যই আপনার ব্রহ্মানুভূতি হইত। বেদান্তবাক্য মিথ্যা নহে। এখনও চেষ্টা করুন, নিরাশ হইবেন না, চিত্ত নির্ম্মল হইলে এক মুহূর্ত্তে জ্ঞানোদয় হয়।"

দেবেন্দ্রনাথের কথা শুনিয়া ব্রাহ্মণ অশ্রু বিসর্জ্জন করিতে করিতে বলিলেন,—"তাই ত, পূর্ব্বে এ রকম ক'রে বুঝি নাই কেন? আজ আপনার কৃপায় ব্রহ্ম-জ্ঞান-লাভের সাধনপথ জানিয়া ধন্য হইলাম।" ব্রাহ্মণ সন্তুষ্টচিত্তে প্রস্থান করিলেন।

হেমচন্দ্রের দেহত্যাগ।

ইটালীতে শ্রীশ্রীঠাকুরের কার্য্য মন-প্রাণ দিয়া আরম্ভ করিয়া হেমচন্দ্র ১৯০৬ সালের উৎসবের পর কঠিন জ্বররোগে আক্রান্ত হন। মৃত্যু-শয্যায় শায়িত হইয়া হেমচন্দ্র কেবল ঠাকুরের কথাই বলিতেন। দেবেন্দ্রনাথ এই সময়ে তাঁহাকে কিছু প্রার্থনীয় আছে কি না, জিজ্ঞাসা করায়, তিনি একবার ঠাকুরের ছবির দিকে আর একবার দেবেন্দ্রনাথের দিকে চাহিলেন; ইহাতে বুঝাইলেন—ইহা ব্যতীত তাঁহার আর কিছুই প্রার্থনীয় নাই। হেমচন্দ্র সংসারের সমস্ত মায়া-মমতা অকাতরে পরিত্যাগ করিয়া ঐ সালের ১১ই জুন রাত্রি ৯॥টার সময় প্রভুর নিকট প্রস্থান করেন। অন্তিম সময় সমাগত জানিয়া বড়বাবুকে সম্বোধন করিয়া বলেন,—"বড়বাবু, ঠাকুরকে লইয়া অনেক খেলা করা হইল, আর খেলার সময় নাই, Here full stop (এখানে পূর্ণ

বিরাম)।" ঠিক সেই সময় হরি-সংকীর্ত্তন করিতে করিতে বীরশীলের বাজারের পল্লীস্থ লোকেরা আসিয়া রাস্তায় রাস্তায় সমস্ত রাত্রি কীর্ত্তন করে। হেমচন্দ্রের মৃত্যুতে দেবেন্দ্রনাথ বলিয়াছিলেন,—"ইটালী রামকৃষ্ণ-মিশনের একটী স্তম্ভপাত হইল।"

হেমচন্দ্র তিনটী নাবালক পুত্র ও দুইটী কন্যা রাখিয়া যান। হেম-চন্দ্রের স্ত্রী পূর্ব্বেই গত হইয়াছিলেন। এক্ষণে এই অনাথ পরিবারের সমস্ত বিষয়ের ভার দেবেন্দ্রনাথকে গ্রহণ করিতে হইয়াছিল। হেম-চন্দ্রের জ্যেষ্ঠা কন্যা শ্রীমতী পঙ্কজিনী এবং তিন পুত্র শ্রীযুত পুরেন্দ্রনাথ, রমেন্দ্রনাথ ও নলীন্দ্রনাথ শ্রীশ্রীঠাকুরের আশ্রয় লাভ করিয়াছেন।

পূর্ব্বোক্ত হরেন্দ্রকুমারের কনিষ্ঠ ভ্রাতা শ্রীযুত হেমচন্দ্র নাগ ১৯০৬ সালের আগষ্ট মাসে তাঁহার ভ্রাতার অনুরোধে কলিকাতায় দেবেন্দ্র-নাথকে দেখিতে আসিয়া তাঁহার আশ্রয় লাভ করেন। জগদীশকুমারের দুইটী ভ্রাতা কলিকাতায় তাঁহার নিকট থাকিয়া কলেজে অধ্যয়ন করিতেন। ঐ সালের সেপ্টেম্বর মাসে একদিন দেবেন্দ্রনাথের আদেশক্রমে জগদীশকুমার মধ্যম ভ্রাতা প্রাণেশকুমারকে দেবেন্দ্র-নাথের নিকটে লইয়া যান। প্রথম-দর্শনাবধি প্রাণেশকুমার দেবেন্দ্র-নাথের প্রতি চিরতরে আকৃষ্ট হন। জগদীশকুমারের কনিষ্ঠ ভ্রাতা শ্রীযুত তারণকুমার পরে আসিয়া তাঁহার সঙ্গলাভ করেন। এই সময় সতীশচন্দ্রের বন্ধু শ্রীযুত বরেন্দ্রনাথ সান্ন্যাল মীরাট হইতে আসিয়া দেবেন্দ্রনাথকে দর্শন করেন।

চতুর্বিংশ পরিচ্ছেদ

৺পুরীধামে গমন—নফরের আত্মত্যাগ।

(১৯০৬—০৭)

দেবেন্দ্রনাথের স্বাস্থ্যভগ্ন।

অতিরিক্ত পরিশ্রমে এই সময় দেবেন্দ্রনাথের স্বাস্থ্যভঙ্গ হইয়া পড়িল। অগ্নিমান্দ্য ও অম্বল দেখা দিল। লিখিতে যাইলে হাত কাঁপিত। তিনি মনিব মহেন্দ্র বাবুকে বলিলেন, "মহাশয়, আমায় এইবার কর্ম্ম হইতে অবসর প্রদান করুন। জমিদারী সেরেস্তায় লেখাপড়ার কার্য্য, কিন্তু লেখাপড়া এখন আমার দ্বারা এক প্রকার অসম্ভব হইয়াছে ; লিখিতে যাইলে হাত কাঁপে। এ অবস্থায় আপনার নিকট বেতন লইলে এক প্রকার আপনাকে ফাঁকি দেওয়া হইবে।"

মহেন্দ্র বাবু দেবেন্দ্রনাথকে বড় ভালবাসিতেন, তিনি বলিলেন, "হাত কাঁপে, তার আর কি হ'বে ? আপনাকে লিখিতে হইবে না, আপনি শুধু চুপ করিয়া বসিয়া থাকিবেন, তাহা হইলেই কার্য্য আপনি চলিয়া যাইবে।"

পুরীধামে গমন করেন।

কর্ম্ম হইতে অব্যাহতি পাইলেন না দেখিয়া, স্থানান্তরে বায়ু-পরিবর্ত্তনের দ্বারা শরীরের কোন উপকার হয় কি না, দেখিবার জন্য ভক্তগণের, বিশেষতঃ কুমুদচন্দ্রের অনুরোধে, তাঁহার সঙ্গে ১৯০৬ সালের ১২ই ডিসেম্বর দেবেন্দ্রনাথ শ্রীশ্রী৺পুরীধামে গমন করেন।

শ্রীযুত সর্ব্বেশ্বর লাহিড়ী নামক জনৈক বৃদ্ধ ব্রাহ্মণভক্তও তাঁহার সহিত গিয়াছিলেন। ইনি দেবেন্দ্রনাথকে গুরু-জ্ঞানে ভক্তি করিতেন।

মহেন্দ্র মাষ্টার মহাশয়ের সহিত মিলন।

৺পুরীধামে পূজনীয় শ্রীযুত মহেন্দ্রনাথ গুপ্ত মাষ্টার মহাশয়ের সহিত তাঁহার সাক্ষাৎ হয়। সহসা গুরুভ্রাতাকে এইরূপ স্থানে পাইয়া দেবেন্দ্রনাথ অত্যন্ত আনন্দিত হইয়াছিলেন এবং তাঁহার সহিত মিলিত হইয়া দেবালয়সমূহ দর্শন করিতে লাগিলেন। সমুদ্র দর্শন করিয়া তিনি অত্যন্ত প্রীত হইয়াছিলেন। মহান্ জলরাশির একত্র সমাবেশ দেখিয়া তাঁহার মনে মহা আনন্দের উদয় হয়। তিনি বলিতেন, "বিশাল তরঙ্গসমাকুল সমুদ্র যেন আপনার ভাবে আপনি মগ্ন হইয়া আনন্দোচ্ছ্বাসে "ওঁ-ওঁ" ধ্বনি করিতেছে।" দেবেন্দ্রনাথ দেবালয় দর্শন করিবার পর সময় পাইলেই সমুদ্রের তীরে ভ্রমণ করিতেন।

টোটা গোপীনাথ দর্শন।

শ্রীশ্রীঠাকুর বলিয়াছিলেন, "৺পুরীধামে যদি কেহ যাও ত, টোটা গোপীনাথ দর্শন করিও।" তাঁহার কথামত দেবেন্দ্রনাথ ও মহেন্দ্রনাথ-উভয়ে সমুদ্রতীর দিয়া শ্রীশ্রীগোপীনাথ দর্শনে চলিলেন। গোপীনাথ বিগ্রহ দেখিতে বড় সুন্দর; কাহারও কাহারও মতে মহাপ্রভু শ্রীশ্রীচৈতন্যদেব এই বিগ্রহে লীন হইয়াছিলেন। মন্দিরদ্বার উদ্‌ঘাটিত হইলে উভয়ে ভিতরে প্রবেশ পূর্ব্বক ভক্তিভরে বিগ্রহকে প্রণাম করিলেন। মহেন্দ্রনাথ "গোরা আমার হেথা......" এই গান ধরিলেন। দেবেন্দ্রনাথ কর যোড় করিয়া গান শুনিতে শুনিতে ভাবাবিষ্ট হইয়া পড়িলেন। তাঁহার নয়নদ্বয় হইতে প্রেমাশ্রু বিগলিত হইতে

লাগিল। পরে এক দিন তিনি একাকী গোবর্দ্ধন মঠ দর্শন করিতে গিয়াছিলেন।

কলিকাতায় প্রত্যাবর্ত্তন।

৺পুরীধামে থাকিয়া দেবেন্দ্রনাথের স্বাস্থ্যের বেশ উন্নতি হইতে লাগিল। কিন্তু কোন বিশেষ আবশ্যকীয় কার্য্যের জন্য দেবেন্দ্রনাথ তথায় মাত্র আঠার দিন থাকিয়া, ২৮শে ডিসেম্বর তারিখে অত্যন্ত অনিচ্ছার সহিত কলিকাতা ফিরিয়া আসিতে বাধ্য হইলেন। তাঁহার নিম্নোদ্ধৃত পত্রাংশ হইতে ইহা সুস্পষ্ট বুঝা যায়ঃ—

"আমার স্বাস্থ্য সম্বন্ধে দিন দিন এখানে যেরূপ উন্নতি হইতেছে, বোধ হয় তিন মাস এখানে থাকিলে পরমায়ু সংখ্যায় দশ বৎসর বৃদ্ধি হইতে পারে। অম্বল একেবারে নাই, ক্ষুধা এত বৃদ্ধি যে, বলা যায় না। ক্ষুধা যে কেমন, তাহার ভাব বহুদিন জানিতাম না। প্রত্যহ অক্লেশে তিন চারি ক্রোশ বেড়াই, মহেন্দ্র মাষ্টার এখানে আসিয়াছেন। সুখসঙ্গী মিলিয়াছিল। কিন্তু আমার প্রাক্তন বশতঃ এ opportunity (সুবিধা) খোয়াইতে হইয়াছে। ইটালীতে পত্রপাঠ আমার যাওয়ার আবশ্যক হইয়াছে, সুতরাং অদ্যই সন্ধ্যার ট্রেণে ইটালি রওয়ানা হইলাম। চক্ষের জলের সহিত আমাকে এ পুণ্যভূমি ছাড়িয়া যাইতে হইল। অদ্য আঠার দিবস আমি এখানে যে কি আনন্দে ছিলাম, তাহা পত্রে লেখা যায় না, অদৃষ্টচক্রে আমাকে আবার সে বিষয়ের পেষণে নিষ্পেষিত হইতে হইবে। যে সমস্ত কারণে যাইতে বাধ্য হইতে হইল, তাহা কলিকাতায় গিয়া লিখিব।

"* * * ঠাকুর পরের কার্য্যে আমার জীবন রাখিয়াছেন গোলামের সুখের আশা বিড়ম্বনা। * * * অদৃষ্টলিপি কিছুতে খণ্ডন হয় না; আমার জীবনপ্রবাহ একটী অদ্ভুত ব্যাপার * * *।"

৺পুরীধাম হইতে ফিরিয়া আসিয়া দেবেন্দ্রনাথ ইটালীতে পূর্ব্ববৎ অবস্থান করিতে লাগিলেন। এই সময় ভবানীপুর হইতে শ্রীযুত পশুপতি দত্ত, ধীরেন্দ্রনাথ ঘোষ, হরিগোপাল ঘোষ, সুশীলচন্দ্র মুখোপাধ্যায় প্রভৃতি আগমন করেন ও দেবেন্দ্রনাথের কৃপা প্রাপ্ত হন। ভক্তসমাগম ক্রমশঃ বৃদ্ধি হইতে লাগিল। নিত্যই অধিক রাত্রি পর্য্যন্ত তাঁহাদিগকে লইয়া ভগবৎপ্রসঙ্গে আলোচনা চলিত। সকলেই আত্মহারা হইয়া দেবেন্দ্রনাথকে দর্শন করিতেন ও তাঁহার সাদর সম্ভাষণ এবং ভালবাসা আস্বাদন করিয়া মনের যাবতীয় অশান্তি ও শোকসন্তাপ ভুলিয়া যাইতেন।

গিরিশবাবুর বাটীতে দেবেন্দ্রনাথ।

ইং ১৯০৭ সালের ফেব্রুয়ারী মাসের শেষভাগে একদিন দেবেন্দ্রনাথ সতীশচন্দ্র, জগদীশকুমার, কৃষ্ণকুমার, ও প্রাণেশকুমারকে সঙ্গে করিয়া বেলা দুই ঘটিকার সময় গিরিশবাবুর বাটীতে উপস্থিত হন। দেবেন্দ্র-নাথকে পাইয়া গিরিশবাবুর আনন্দের পরিসীমা রহিল না। সমস্ত কাজ বন্ধ করিয়া কেবল দেবেন্দ্রনাথের সহিত ঠাকুরের বিষয়ে আলাপ করিতে লাগিলেন। দেবেন্দ্রনাথের সঙ্গীর মধ্যে একজন ব্রাহ্মভাবাপন্ন ছিলেন। তিনি, গুরু অত্যাবশ্যকীয় নহে, গুরু ব্যতীতও ঈশ্বর লাভ হইতে পারে এবং গুরু ও ঈশ্বর অভেদ কখনই হইতে পারে না—ইত্যাদি ভাবের কথা সর্ব্বদা বলিতেন। তাঁহাকে বুঝাইবার জন্যই দেবেন্দ্রনাথ গুরুবাদ সম্বন্ধে প্রথমে গিরিশবাবুর নিকট কথা উত্থাপন করেন।

কিয়ৎক্ষণ বাদানুবাদের পর গিরিশবাবু গম্ভীরভাবে চক্ষু বিস্ফারিত করিয়া ধীরে ধীরে বলিতে লাগিলেন,—"অন্যে যে যাই বলে বলুক্,

আমি গুরু না মেনে থাকৃতে পারব না,—গুরুকে ঈশ্বর না ব'লে থাকৃতে পারব না। আমি যে কত অকার্য্য করেছি, সকলেই আমাকে কেবল ঘৃণা করেছে—যে আমাকে অপবিত্র অবস্থায় কোলে তুলে নিয়েছে, পবিত্র ক'রে দিয়েছে, তাঁকে ভগবান্ বলব না? তাঁর চাইতে বড় ভগবান্ আমি ত দেখি নাই!"

খানিক চুপ করিয়া থাকিয়া আবার বলিতে লাগিলেন, "দেবেন বাবু, ঠাকুরকে বকল্‌মা দিয়ে মনে করেছিলাম, বড় বুদ্ধির কাজ করেছি। আমার আর কিছু করৃতে হবে না। এখন দেখছি, যাঁকে বকল্‌মা দিলাম, উঠ্‌তে, বস্‌তে, খেতে, শুতে তাঁরই স্মরণ চলছে—পানটুকু নাম না ক'রে মুখে তুলতে পারছি না। তাঁর ছবিটী ঘরে টাঙ্গাবার যো নাই, পাছে পায়ের ধুলো উড়ে যেয়ে তাতে পড়ে!"

এই ভাবে ঠাকুরের সম্বন্ধে পরস্পরের মধ্যে মহা আনন্দে কথাবার্ত্তা চলিতে লাগিল। রাত্রি নয়টার পর দেবেন্দ্রনাথ বাড়ী যাইবার জন্য উঠিলেন। তাঁহার চলিয়া আসিবার কিছুক্ষণ পরে ঝড়-বৃষ্টি আরম্ভ হয়। ইহাতে গিরিশবাবু বিশেষ চিন্তিত হইয়া শ্রীযুত অবিনাশ বাবুকে বার বার জিজ্ঞাসা করেন,—"দেবেন বাবু ভিজিলেন না ত? পথে কোন কষ্ট হ'ল না ত? তাঁর সংবাদ নাও ত?" অবিনাশ বাবু পত্র লিখিলেন। পত্রোত্তরে দেবেন্দ্রনাথ লিখিয়াছিলেন, "আমাদের বাড়ী পৌঁছিবার পর ঝড়-বৃষ্টি আরম্ভ হয়, পথে কোন কষ্টই হয় নাই। * * * অবিনাশ, ভালবাসা কাকে বলে, এই থেকে বুঝে নেও।"

নফর কুণ্ডের আত্মোৎসর্গ।

পূর্ব্বে আমরা ভবানীপুরবাসী নফরচন্দ্র কুণ্ডুর নাম উল্লেখ করিয়াছি। নফরচন্দ্র প্রায় প্রত্যহ অফিস হইতে ফিরিবার সময় ইটালীতে

আসিতেন এবং রাত্রি প্রায় ১১টা পর্য্যন্ত দেবেন্দ্রনাথের নিকট থাকিতেন। নফরচন্দ্র কর্ম্মবীর ছিলেন। দেবেন্দ্রনাথ তাঁহাকে নিঃস্বার্থ কর্ম্মরহস্য বুঝাইতেন। একদিন ভক্তি, কর্ম্ম ও পূজা সম্বন্ধে কথা উঠিলে দেবেন্দ্রনাথ নফরকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "যদি তুমি কোন পুকুরে একটী ছেলে ডুবে যাচ্ছে দেখ, তাহা হ'লে কি কর ?"

ইহার উত্তরে নফরচন্দ্র বলেন, "আমি তৎক্ষণাৎ জলে ঝাঁপাইয়া পড়িয়া ঐ ছেলেকে রক্ষা করিবার চেষ্টা করি।"

তাহাতে দেবেন্দ্রনাথ বলেন,—"ইহাই তোমার কর্ম্ম ও পূজা, —জীবের সেবাই শিব পূজা।" ইহার পর নফরচন্দ্র শিব-জ্ঞানে জীবসেবার অভ্যাসে মনোযোগী হন। নফরচন্দ্রের অবস্থা ভাল ছিল না; সামান্য বেতনে বাথ্গেটের বাড়ী চাকরী করিয়া জীবনযাত্রা নির্ব্বাহ করিতেন; কিন্তু পরোপকার অনুষ্ঠানে সর্ব্বদাই তাঁহাকে অগ্রণী দেখা যাইত।

১৩১৪ সালের ২৯শে বৈশাখ, ইং ১৯০৭ সালের ১২ই মে তারিখ বঙ্গবাসিমাত্রেরই চিরস্মরণীয় দিন। যখন নফরচন্দ্র অফিসে যাইতে-ছিলেন, তখন ভবানীপুর, সাউথ চক্রবেড়িয়া রোডে আসিয়া রাস্তার নীচে নর্দ্দামার একটা গর্ত্তের (man-hole) চতুর্দ্দিকে বহু লোক ভিড় করিয়া গোলমাল করিতেছে দেখিতে পাইয়া দ্রুতপদবিক্ষেপে তাহাদের নিকট আসিলেন, এবং জিজ্ঞাসা করিয়া জানিলেন, দুইটী মুসলমান কুলী উক্ত গর্ত্তে নামিয়া অজ্ঞান হইয়া পড়িয়াছে। নফরচন্দ্র সমাগত লোকদিগকে বলিলেন, "মশাই, দু দুটো লোক মারা যাচ্ছে, আর আপনারা দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে তামাসা দেখ্ছেন!" বলিতে বলিতে জনতা ঠেলিয়া, ভিতরে প্রবেশ করিযা, পায়ের বুটজুতার ফিতা বলপূর্ব্বক টানিয়া ছিঁড়িয়া ফেলিয়া গর্ত্তের ভিতর লাফাইয়া পড়িতে

উদ্যত হইলেন। তথায় দণ্ডায়মান একটী ধনী যুবক বলিয়া উঠিলেন, "মশাই, কি করেন, যাবেন না—যাবেন না, গেলেই মারা যাবেন।"

নফরচন্দ্র অতি ব্যস্তভাবে প্রত্যুত্তরে বলিলেন, "আপনারা বড়লোক, আপনাদের প্রাণের মূল্য বেশী, আমি গরীব লোক, আমর জীবনের মূল্য নাই—যদি দুটী লোককে বাঁচাতে পারি, তবে জীবন সার্থক হ'বে।" মুহূর্ত্তমধ্যে "জয় গুরু" শব্দোচ্চারণপূর্ব্বক গর্ত্তের মধ্যে লাফাইয়া পড়িলেন। গর্ত্তের দূষিত বাষ্প আঘ্রাণ করিয়া কুলী বালকদ্বয়ের ন্যায় তিনিও অচেতন হইয়া প্রাণত্যাগ করেন।

দেবেন্দ্রনাথ সেই সময় ভবানীপুর গাড়ী করিয়া সিদ্ধেশ্বরের বাটী যাইতেছিলেন। সন্ধ্যার পূর্ব্বে পশুপতি প্রভৃতির নিকট নফরের সংবাদ পাইয়া তিনি কেমন এক রকম হইয়া গেলেন—অর্দ্ধ বাহ্য দশায় কখনও দুঃখ, কখনও আনন্দের ভাব প্রকাশ পাইতে লাগিল। সন্ধ্যার সময় ঠাকুরের স্তোত্রপাঠ ও গান আরম্ভ হইলে দেবেন্দ্রনাথ অনেকক্ষণ পর্য্যন্ত ঘুরিয়া ঘুরিয়া উন্মত্তের ন্যায় নৃত্য করিয়াছিলেন।

সংবাদপত্রে আন্দোলন।

এই পরোপকারনিষ্ঠ নিঃস্বার্থ আত্মবিসর্জ্জন ব্যাপার লইয়া ইংরাজী এবং দেশীয় পরিচালিত সংবাদপত্র-সমূহের স্তম্ভে প্রশংসার রোল প্রতিধ্বনিত হইতে লাগিল। প্রথমে অক্সফোর্ড মিশনের প্রেসিডেন্ট রেভারেণ্ড ব্রাউন সাহেব এই বিষয়ে লেখেন; পরে চারিদিক্ হইতে নফরচন্দ্রের শোকসন্তপ্ত পরিবারবর্গের সাহায্যার্থ পত্রিকায় নিবেদন বাহির হয় এবং বহু অর্থ সংগৃহীত হইতে থাকে। কলিকাতাস্থ সহৃদয় রাজপুরুষগণ এই কার্য্যে অগ্রণী হইয়াছিলেন এবং রাজা মহারাজা হইতে দীনদুঃখী শ্রমজীবী পর্য্যন্ত ইহাতে যোগদান করিয়াছিলেন।

নফরচন্দ্রের স্মৃতিস্তম্ভ সংস্থাপন।

প্রায় সাত হাজার টাকা সংগৃহীত হইলে, উক্ত অর্থ কি ভাবে ব্যয়িত হইবে তজ্জন্য একটী কার্য্যনির্ব্বাহক কমিটী গঠিত হয়। এই কমিটীতে কলিকাতা করপোরেশনের চেয়ারম্যান সার চার্লস্‌-য়ালেন্, ইংলিসম্যানের সম্পাদক, ইণ্ডিয়ান্ মিরারের সম্পাদক স্বর্গীয় রায় নরেন্দ্রনাথ সেন বাহাদুর, শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ মিশনের প্রেসিডেণ্ট পূজ্যপাদ শ্রীমৎস্বামী ব্রহ্মানন্দ মহারাজ ও ইটালী অর্চ্চনালয়ের প্রেসিডেণ্ট শ্রীযুত দেবেন্দ্রনাথ মজুমদার—এই কয়েকজন উদারচেতা ব্যক্তি কমিটীর সদস্য নির্ব্বাচিত হন। কমিটীর কয়েকটী অধিবেশনে দেবেন্দ্রনাথের সরল ও নির্ভীক যুক্তিপূর্ণ উক্তি শুনিয়া সভ্যগণ সকলেই চমৎকৃত হইয়াছিলেন এবং সংগৃহীত অর্থ হইতে দেবেন্দ্রনাথের প্রস্তাবমত, নফরচন্দ্রের অদ্ভুত কীর্ত্তি চিরস্মরণীয় রাখিবার জন্য একটী স্মৃতিস্তম্ভ (ভবানীপুর, সাউথ চক্রবেড়িয়া রোডের) ঐ গর্ত্তের নিকটবর্ত্তী স্থানে করপোরেশন-প্রদত্ত জমির উপর সংস্থাপিত হয়। নফরচন্দ্রের বৃদ্ধ পিতা, বিধবা স্ত্রী, শিশুকন্যা ও ধাত্রীমাতা আজীবন বৃত্তি পাইবেন স্থির হয়। "এই ঘটনার পর গিরিশবাবু দেবেন্দ্রনাথকে বলিয়াছিলেন, "দেবেন্ বাবু! স্বামীজি বাঁচিয়া থাকিলে আজ আপনাকে কোলে করিয়া নাচিতেন।"

দেবেন্দ্রনাথের ইচ্ছানুসারে উক্ত ১২ই মে তারিখে, নফরচন্দ্রের স্মৃতিস্তম্ভের নিকট অর্চ্চনালয়ের ভক্তগণকর্ত্তৃক শ্রীশ্রীঠাকুরের উৎসব ও দরিদ্রনারায়ণের সেবাকার্য্য প্রতি বৎসর সম্পন্ন হইয়া আসিতেছে।

পূর্ব্বোক্ত হরেন্দ্রকুমারের মধ্যমভ্রাতা শ্রীযুত মহেন্দ্রকুমার নাগ এই সময় দেবেন্দ্রনাথের নিকট আসিয়া তাঁহার আশ্রয় লাভ করেন।

পঞ্চবিংশ পরিচ্ছেদ

মীরাট গমন।

(১৯০৭—০৮)

পূর্ব্বোক্ত সতীশচন্দ্র পাল হেমচন্দ্রের দেহত্যাগের পূর্ব্ব হইতেই মীরাটে তদীয় শ্বশুর সুপ্রসিদ্ধ ডাক্তার ত্রৈলোক্যনাথ ঘোষ মহাশয়ের নিকট অবস্থান করিয়া চিকিৎসা বিদ্যা শিক্ষা করিতেছিলেন। দেবেন্দ্রনাথের শরীর অসুস্থ জানিয়া সতীশচন্দ্র তাঁহাকে বায়ু-পরিবর্ত্তনের জন্য মীরাট যাইতে অনুরোধ করেন। কলিকাতায় শরীর ক্রমশঃই অসুস্থ হইতেছে দেখিয়া, ভক্তগণের বিশেষ অনুরোধে ১৯০৭ সালের সেপ্টেম্বর মাসে দেবেন্দ্রনাথ মীরাট গমন করেন। সঙ্গে ছিলেন হরিগোপাল ও কুমুদচন্দ্র। প্রথমে একটী বাড়ী ভাড়া করা হয়। তথায় থাকিবার সুবিধা না হওয়ায় বরেন্দ্রনাথের বাসায় আসিয়া অবস্থিতি করিতে লাগিলেন। মীরাটে তখন অধিক বাঙ্গালীর বাস ছিল না, এজন্য নূতন একজন বাঙ্গালী আসিলে সকলেই তাঁহার সংবাদ জানিতে পারিতেন। সকলে শুনিলেন, একজন সাধু আসিয়াছেন, তিনি সতীশ ও বরেন্দ্রের গুরু। কিন্তু ক্রীড়া ও আমোদ পরিত্যাগ করিয়া সাধু দর্শন করিতে কাহারও আগ্রহ হইল না।

ভক্ত-সমাগম।

ইটালীতে প্রথম প্রথম যেরূপ ঘটিয়াছিল, মীরাটেও তাহার কিঞ্চিৎ পুনরভিনয় হইতে লাগিল। দেবেন্দ্রনাথ স্বয়ং এক দিবস ক্রীড়া-স্থলে আসিয়া মীরাট কলেজের অধ্যাপক শ্রীযুত চারুচন্দ্র মুখোপাধ্যায়

মহাশয়ের সহিত কথা কহিতে লাগিলেন। দেবেন্দ্রনাথের মধুর সম্ভাষণে আকৃষ্ট হইয়া অধ্যাপক মহাশয় পরদিন তাঁহার সহিত দেখা করিতে যান ও সকলকে তাঁহার নিকট যাইতে বলেন। তিনি বলিয়াছিলেন,—"সাধুটী গিরিশ-গ্রন্থাবলী সুন্দর পাঠ করেন।" শ্রীযুত কালীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় নামক জনৈক যুবক গিরিশবাবুর লেখার অত্যন্ত পক্ষপাতী ছিলেন। তিনি দেবেন্দ্রনাথের গিরিশ-গ্রন্থাবলী-পাঠ শ্রবণে মুগ্ধ হইলেন এবং মধ্যে মধ্যে তাঁহার নিকট আসিতে লাগিলেন।

একদিবস দেবেন্দ্রনাথ কথাপ্রসঙ্গে চারু বাবুকে বলিলেন, "দেখুন চারু বাবু! যখন বন্যা আসে, তখন দেশে জলকষ্ট থাকে না। ঘরের দ্বারে এক বাঁশ জল হয়। শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণদেবের আবির্ভাবে ধর্ম্মজগতের এখন এইরূপ অবস্থা হইয়াছে।" কথাগুলি তথায় উপস্থিত কালীচরণের মর্ম্মস্পর্শ করিল। তিনি সকলকে এই কথা জানাইতে লাগিলেন। একদিবস ক্রীড়ার সুবিধা না হওয়ায় মিরাট কলেজের অধ্যাপক শ্রীযুত প্রতাপচন্দ্র বরাট প্রমুখ কয়েক জন তাঁহাকে কয়েকটী প্রশ্ন করিবার মানসে তাঁহার নিকট উপস্থিত হন। দেবেন্দ্রনাথ পূর্ব্ব হইতেই কতিপয় ব্যক্তির সহিত কথোপকথনে নিরত ছিলেন। কথাপ্রসঙ্গে যাহা বলিলেন, তাহাতে প্রশ্নকারিগণের মনের প্রশ্নসকলের স্থিরমীমাংসা হইয়া গেল। কাহাকেও আর ক্লেশ স্বীকার করিয়া প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিতে হইল না।

ইহার পর হইতে ইঁহারা সকলে মধ্যে মধ্যে তাঁহার নিকট আসিতে আরম্ভ করিলেন; প্রথমে উক্ত প্রতাপচন্দ্র, পরে শ্রীযুত গণেশচন্দ্র দে, ত্রৈলোক্যনাথ সেন গুপ্ত, শীতলচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, কালাচাঁদ বন্দ্যোপাধ্যায়, কালীকুমার দে, মহেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, অতুলচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, কালীনাথ কুণ্ডার প্রভৃতি আসিয়া মিলিত হইলেন।

প্রসন্নকুমারের সহিত দেবেন্দ্রনাথের আলাপ।

একদিন কথাপ্রসঙ্গে দেবেন্দ্রনাথ শুনিলেন যে, ডাক্তার ত্রৈলোক্যনাথ ঘোষ মহাশয়ের ভ্রাতা শ্রীযুত প্রসন্নকুমার ঈশ্বরের কথা শ্রবণ করিলে কাঁদেন। তাঁহাকে দেখিবার ইচ্ছা হওয়ায়, তিনি স্বয়ং একদিন যাইয়া প্রসন্নকুমারের সহিত ভগবৎপ্রসঙ্গে আলাপ আরম্ভ করিলেন। প্রসন্নকুমারের তখন বৃদ্ধাবস্থা। যৌবনে জীবন সুপথে পরিচালিত করিতে পারেন নাই বলিয়া তিনি বড় অনুতাপ করিতেন; সাধু-সন্ন্যাসী দেখিলে তাঁহাদের সেবা করিতেন। তাঁহার আশা ছিল, এইরূপ করিলে যদি কোন মহাত্মা দয়াপরবশ হইয়া তাঁহাকে উদ্ধার করেন। কি এ পর্য্যন্ত কেহ তাঁহাকে শান্তিদানে সমর্থ হন নাই। দেবেন্দ্রনাথের সুমধুর কথা এবং আশ্বাসবাণী শুনিয়া প্রসন্নকুমারের প্রাণে সাময়িক শান্তি আসিল, কিন্তু তাহা অধিকক্ষণ স্থায়ী হইল না। তিনি কেবলই বলিতেন, "আমি মহাপাপী, আমার উদ্ধার নাই।"

ক্রমাগত মাসাবধিকাল দেবেন্দ্রনাথ প্রসন্নকুমারকে কত আশাবাণী শুনাইলেন, শ্রীশ্রীঠাকুরের অভয়বাণী সকল শুনাইয়া কতরূপে আশ্বস্ত করিতে লাগিলেন; কিন্তু যতক্ষণ দেবেন্দ্রনাথ তাঁহার নিকট থাকিতেন, ততক্ষণই প্রসন্নকুমারের প্রাণে শান্তি থাকিত, তিনি চলিয়া আসিলেই আবার পূর্ব্বাবস্থা! আবার তিনি নিজেকে মহাপাপী মনে করিয়া হতাশ-সাগরে ডুবিয়া থাকিতেন। অবশেষে একদিন প্রসন্নকুমার জনৈক ভক্তকে বলিলেন, "যদি পরমহংসদেব স্বয়ং আসিতেন, তবে কি হইত, বলিতে পারি না। আমায় উদ্ধার করা জাহাজের কর্ম্ম—জেলে ডিঙ্গীর কর্ম্ম নহে।"

দেবেন্দ্রনাথ একদিন অপরাহ্ণে প্রসন্নকুমারের সহিত সাক্ষাৎ করেন এবং অনেক কথাবার্ত্তার পর ঠাকুরের কথা বলিতে বলিতে হঠাৎ

ভাবস্থ হইয়া তাঁহাকে বলিলেন, "তোমার সমস্ত পাপ আমাকে দাও।"

"আমি আর সে প্রসন্ন নই।"

প্রসন্নকুমার তাঁহার অমানুষিক ভালবাসা দেখিয়া মুগ্ধ হইলেন এবং কাঁদিতে কাঁদিতে বলিলেন, "বাবা, আমার অদৃষ্টে যাহা আছে, তাহা হউক, তোমায় আমি আমার পাপ দিতে পারিব না। সকলে আদর ক'রে তোমায় কত ভাল ভাল জিনিষ দেয়; আমি কোন্ প্রাণে তোমায় আমার পাপ দান করিব?"

কিন্তু দেবেন্দ্রনাথ কিছুতেই ছাড়িলেন না, একটু উত্তেজিত হইয়া বলিলেন, "তুমি দাও আর না দাও, আমি স্বেচ্ছায় তোমার সমস্ত পাপ গ্রহণ করিলাম।" এই বলিয়া তিনি আরও গভীর ভাবস্থ হইয়া পড়িলেন এবং সেই অবস্থায় প্রসন্নকুমারের বক্ষে পাদস্পর্শ করিলেন। সেই দিন হইতে প্রসন্নকুমার নিজেকে নিষ্পাপ মনে করিতে লাগিলেন; এবং তাঁহার মুখে আনন্দের লক্ষণ পরিস্ফুট হইতে লাগিল। তিনি তাঁহার এক বন্ধুকে বলিয়াছিলেন, "ভাই, তোমরা আশ্চর্য্য হ'বে, কিন্তু আমি আর সে প্রসন্ন নই।"

৩০

এই ঘটনার প্রায় ষোল বৎসর পূর্ব্বে স্বামী বিবেকানন্দ হিমালয়-ভ্রমণে যাইয়া পীড়িত হইলে, তাঁহার গুরুভ্রাতৃগণ তাঁহাকে চিকিৎসার্থ মীরাটে আনয়ন করিয়াছিলেন। এখানে অবস্থানকালে ডাক্তার ত্রৈলোক্যনাথ ঘোষ ও তাঁহার কনিষ্ঠ ভ্রাতা প্রসন্নকুমার ঘোষ মহাশয়ের সহিত তাঁহারা পরিচিত হন। সন্ন্যাসিগণের তেজঃপুঞ্জ শরীর এবং সাধু ব্যবহার দেখিয়া প্রসন্নকুমার বড় প্রীত হন। কিন্তু সুবিধা সত্ত্বেও শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণদেবকে দর্শন করিয়া নিজ জীবন ধন্য করিতে পারেন নাই বলিয়া তাঁহাদিগের সমক্ষে সর্ব্বদা দুঃখ প্রকাশ করিতেন।

স্বামীজি প্রসন্নকুমারকে সান্ত্বনা দিয়া বলিয়াছিলেন, "আপনি ঠাকুরকে চিন্তা করিবেন, তিনি আপনার অভাব পূর্ণ করিবেন।" সেই সময় এক রাত্রিতে প্রসন্নকুমার স্বপ্ন দেখিলেন,—ঠাকুর সর্ব্বাঙ্গে ময়লা মাখিয়া নাচিতে নাচিতে তাঁহার নিকট আসিয়া বলিলেন, "আমায় কোলে কর।" তদীয় দেহ ময়লাযুক্ত দেখিয়া প্রসন্নকুমার তাঁহাকে কোলে করিতে পারিলেন না, ঠাকুরও অন্তর্হিত হইলেন। ইহা শুনিয়া স্বামীজি তাঁহাকে বলিয়াছিলেন, "আপনার ঠাকুরের ঘরে আসিতে এখনও বিলম্ব আছে।"

এই সময় প্রতাপচন্দ্রের স্ত্রী, ত্রৈলোক্যনাথের স্ত্রী, শীতলের মাতা এবং স্ত্রী, সতীশচন্দ্রের স্ত্রী ও দুই শ্যালিকা—একটী কালীনাথের স্ত্রী, অপরটী এটর্ণি প্যারীচরণ হালদারের স্ত্রী—কিরণ মা প্রভৃতি অনেক স্ত্রীভক্ত দেবেন্দ্রনাথের নিকট আসিতে লাগিলেন। ইঁহারা সকলেই দেবেন্দ্রনাথের কৃপায় শ্রীশ্রীঠাকুরের পরম ভক্ত হইয়াছেন।

প্রথম প্রথম ভক্তগণ বিনায়াসে সত্বর ভগবান্-লাভের জন্য ব্যস্ত হইলে, দেবেন্দ্রনাথ বলিতেন, "ব্যস্ত হইও না, কালে সব হইবে। জ্ঞানলাভ সময়সাপেক্ষ, অপেক্ষা কর—বিশ্বাস কর, সময়ে সব বুঝিতে পারিবে। নগদা মুটে হইও না। অল্পে অল্পে যেমন বাসনাক্ষয় হইবে, তোমরাও ধীরে ধীরে গন্তব্য স্থানে উপস্থিত হইবে। একদিনে ব্যাস-বশিষ্ঠ হইবার আশা করিও না।"

মীরাট ক্যাণ্টনমেণ্ট হাঁসপাতালের জনৈক ইংরাজ ডাক্তার ক্যাপ্টেন ম্যান্‌ডিস্ এই সময় দেবেন্দ্রনাথকে দেখিতে আসিয়া, তাঁহার মুখ-নিঃসৃত অমিয় উপদেশাবলী শ্রবণে মুগ্ধ হন। দেবেন্দ্রনাথ ভাল ইংরাজী বলিতে পারিতেন না, কিন্তু ইংরেজটী তাঁহার সেই ভাষা হইতেই ভাব গ্রহণ করিয়া প্রীতিলাভ করিতেন। ক্যাপ্টেনসাহেব তাঁহাকে অতিশয়

শ্রদ্ধাভক্তি, এমন কি, গুরুর ন্যায় মান্য করিতেন। ইঁনি একদিন দেবেন্দ্রনাথকে কিছু অর্থ-সাহায্য করিতে চাহিলে দেবেন্দ্রনাথ বলিয়াছিলেন, "আমার কোন অভাব নাই, তোমার আধ্যাত্মিক জীবন উন্নত হইলে আমি বিশেষ সুখী হইব।"

হৃষিকেশ গমন।

এইরূপে মীরাটে আনন্দের হাট জমিয়া উঠিলে, দেবেন্দ্রনাথ কয়েক দিনের জন্য হরিদ্বার, হৃষীকেশ ও লছমন্‌ঝোলা প্রভৃতি স্থান বেড়াইয়া পুনরায় মীরাটে আসেন। কুমুদ ও বরেন্দ্র এ যাত্রায় তাঁহার সাথী ছিলেন। লছমন্‌ঝোলার লোহার পুলের উপর হইতে হিমালয়ের দৃশ্য দেখিয়া দেবেন্দ্রনাথ মুগ্ধ হন। মীরাট ও কলিকাতায় আসিয়া সকলকে একবার করিয়া হিমালয় দর্শন করিতে বলেন। তিনি বলিতেন, "হিমালয়ের সুমহান্ ভাব দর্শন করিলে হৃদয়ের প্রশস্ততা অনেক বাড়িয়া যায়।" পুরীর অপার জলধি এবং হিমালয়ের এই বিশাল উত্তুঙ্গ দৃশ্য তাঁহাকে এত বিমুগ্ধ করিয়াছিল যে, পরে সমাগত ভক্তমণ্ডলীকে উক্ত দুইটী স্থান দর্শন করিবার জন্য বারংবার অনুরোধ করিতেন। পুলের উপর হইতে বঁদ্রিনারায়ণ উদ্দেশ্যে প্রণাম করিয়া তিনি হিমালয়ের নিকট চির-বিদায় গ্রহণ করিলেন।

সুদূর মীরাটে দেবেন্দ্রনাথ প্রায় পাঁচ মাসকাল অতিবাহিত করেন। তথায় শ্রীশ্রীঠাকুরের নাম প্রচার করিয়া তিনি ১৯০৮ সালের জানুয়ারী মাসে কলিকাতায় প্রত্যাবর্ত্তন করেন। স্থানপরিবর্ত্তনজনিত তাঁহার স্বাস্থ্যের অনেক উন্নতি হইয়াছিল।

"ভগবান লাভ হইলে সব বদলাইয়া যায়।"

এই সময় হইতে তাঁহার মূর্ত্তি কমনীয় হইতে কমনীয়তর হইয়াছিল। এবং বর্ণ আরো উজ্জ্বল হওয়াতে তাঁহাকে একজন জ্যোতির্ম্ময়

পুরুষ বলিয়া বোধ হইত। তিনি বলিতেন, "ভগবানলাভ হইলে সব বদলাইয়া যায়, এমন কি চেহারা, চাউনি, চলন সব বদলাইয়া যায়।" তিনি মীরাট হইতে যাত্রা করিবার সময় যে স্থানে বসিয়া ভগবৎ-প্রসঙ্গে আলাপ করিতেন, সেই স্থানটীতে মস্তক স্পর্শ করিয়া প্রণাম করিয়াছিলেন।

কলিকাতায় আসিয়া তিনি জমিদার মহেন্দ্র বাবুর এষ্টেটের কর্ম্মে আর যোগদান করেন নাই। এখন হইতে ভক্তগণই তাঁহার যাবতীয় ব্যয়ভার বহন করিতে লাগিলেন। দেবেন্দ্রনাথ বলিতেন, "যতদিন আমি চাকরী করিতাম, তত দিন কোনমতে কায়-ক্লেশে দিন কাটিত। যখন চাকরী ছাড়িয়া সম্পূর্ণ তাঁহার উপর নির্ভর করিলাম, ঠাকুরও তখন থেকে আমার সমস্ত ভার গ্রহণ করিলেন।" আপন জীবনের এই দৃষ্টান্ত উল্লেখ করিয়া তিনি সমাগত ভক্তবৃন্দকে সকল বিষয়ে ভগবানের উপর নির্ভর করিতে শিক্ষা দিতেন।
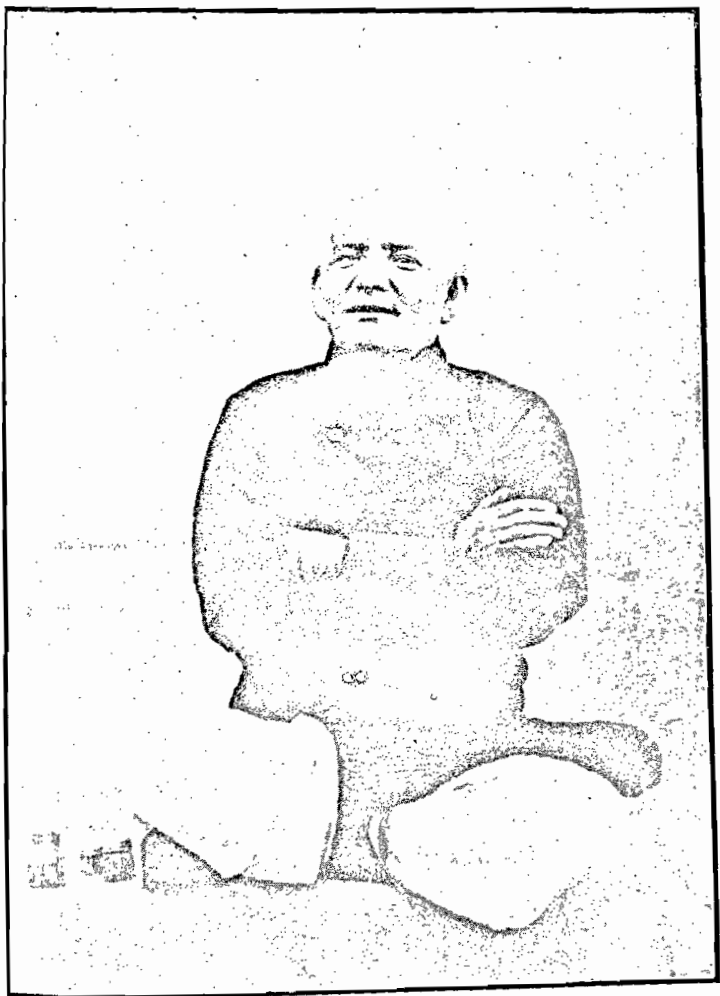
মীরাটে—দেবেন্দ্রনাথ

ষড়্বিংশ পরিচ্ছেদ

দ্বিতীয়বার মীরাট-গমন।

(১৯০৮—০৯)

অনেক দিনের পর দেবেন্দ্রনাথ কলিকাতায় ফিরিয়া আসিয়াছেন সংবাদ পাইয়া, ভক্তগণ একে একে ছুটিয়া আসিয়া মিলিত হইতে লাগিলেন। আবার অর্চ্চনালয়ে আনন্দের হাট বসিয়া গেল। প্রাতঃকাল হইতে রাত্রি দুই প্রহর পর্য্যন্ত ভক্তসমাগম, ভগবৎকথা, আলোচনা, সঙ্গীত ইত্যাদি নানা ভাবে দিন কাটিতে লাগিল। দেবেন্দ্রনাথের তদানীন্তন অবস্থা দেখিয়া গিরিশ বাবুর কনিষ্ঠ ভ্রাতা অতুলবাবু, যিনি দেবেন্দ্রনাথকে ইটালীতে কর্ম্ম করিতে প্রেরণ করেন, একদিন বলিয়াছিলেন, "দেবেন বাবু ইটালীতে পা পূজিতে যাইয়া, ঠাকুরের গুণে পা পূজাইলেন।"

দেবেন্দ্রনাথের স্বাস্থ্য অল্পদিন পরেই আবার অবনতির দিকে যাইতে লাগিল। মীরাটের ভক্তগণের বিশেষ আগ্রহে ১৯০৮ সালের মে মাসে উৎসবের পর পুনরায় তিনি বায়ুপরিবর্ত্তনের জন্য মীরাট গমন করেন। তাঁহার সঙ্গী ছিলেন তাঁহার ভ্রাতৃজায়া ও কৃষ্ণকুমার। প্রথমে ক্যাণ্টনমেণ্টে মছলীবাজারস্থ শীতলচন্দ্রের বাড়ীর পার্শ্বে তাঁহার থাকিবার জন্য একটী বাড়ী ভাড়া করিয়া রাখা হয়। দেবেন্দ্রনাথ তথায় গিয়া উঠেন। পরে ভবানীপুরের হেম রায় যাইয়া উপস্থিত হন। কিছুকাল তথায় থাকিবার পর দেবেন্দ্রনাথের ভ্রাতৃজায়া কোন বিশেষ কারণে হেম রায়কে সঙ্গে করিয়া ইটালী চলিয়া আসেন।

ইহার পরেই দেবেন্দ্রনাথ ঐ বাড়ী ত্যাগ করিয়া বরেন্দ্রনাথের বাসায় আসিয়া বাস করিতে থাকেন।

পূর্ব্বোক্ত প্রসন্নকুমার দেবেন্দ্রনাথের আর্থিক অবস্থা জ্ঞাত হইয়া তাঁহার সেবার জন্য এক সহস্র মুদ্রা দিতে চাহিলে, তিনি তাঁহাকে নিরস্ত করিয়া বলেন, "আমার ঠাকুর রয়েছেন, আমার অর্থের জন্য কোন চিন্তা নাই।"

নলিনীকান্তের আগমন।

এই সালের অক্টোবর মাসে শ্রীযুত নলিনীকান্ত সেনগুপ্ত সস্ত্রীক দেবেন্দ্রনাথের নিকট মীরাটে আগমন করেন। তিনি তখন বীরভূম জেলার হেতমপুর রাজ-কলেজে গণিতের অধ্যাপকের কাজ করিতেন। ইতঃপূর্ব্বে তিনি মীরাট-প্রবাসী তাঁহার আত্মীয় প্রতাপচন্দ্রের নিকট হইতে পত্রে দেবেন্দ্রনাথের আগমনের কথা অবগত হন। নলিনীকান্ত এই সময়ে সংসারে তাঁহার একমাত্র আদরের কন্যাটীকে হারাইয়া শোকে মুহ্যমান ছিলেন। দেবেন্দ্রনাথের নিকট ঠাকুরের কথা শ্রবণ করিয়া তিনি শান্তিলাভ করেন এবং সস্ত্রীক দেবেন্দ্রনাথের কৃপা প্রাপ্ত হন। অল্পদিন পরে তিনি পুনরায় কার্য্যস্থলে চলিয়া যান। দেবেন্দ্রনাথ নলিনীকান্তকে বড় ভালবাসিতেন।

এবারেও দেবেন্দ্রনাথ পূর্ব্বের ন্যায় ঈশ্বরীয় প্রসঙ্গে নিযুক্ত থাকিতেন এবং যাহাতে ভক্তগণের মন সকল অনর্থের মূল ভোগবাসনা হইতে নিরস্ত হইয়া মঙ্গলময়ের পথে চালিত হয়, তদ্বিষয়ে সর্ব্বক্ষণ যত্নবান্ হইতেন। তাঁহাদের সংসার যাত্রা সুশৃঙ্খলরূপে পরিচালন বিষয়েও সর্ব্বদা উপদেশ দিতেন। দেবেন্দ্রনাথের ভালবাসার গুণে সকলেরই প্রাণ সরস হইয়া উঠিল এবং পরস্পরের ভিতর একটা প্রেম-প্রীতি ও আত্মীয়তার জমাট বাঁধিয়া গেল।

স্ত্রী-ভক্তগণ ইচ্ছা করিলেই তাঁহার নিকট আসিতে পারিতেন না দেখিয়া, তিনি স্বয়ং মধ্যে মধ্যে যাইয়া তাঁহাদিগকে দর্শন দিতেন। তাঁহার মধুময় আশার বাণী শ্রবণ করিয়া সকলে সংসারক্লেশ ভুলিয়া অপার আনন্দ লাভ করিতে লাগিলেন।

দেবেন্দ্রনাথের ডবল নিউমোনিয়া রোগ।

পূর্ব্বোক্ত শীতলচন্দ্রের মাতা দেবেন্দ্রনাথকে অতিশয় শ্রদ্ধা-ভক্তি করিতেন। তিনি সরলতার প্রতিমূর্ত্তি ছিলেন। উক্ত সালের ডিসেম্বর মাসে শীতলের মাতা অসুস্থা হইয়া পড়েন। মাতার অসুখের জন্য দেবেন্দ্রনাথ শীতলচন্দ্রকে অফিসে ছুটী লইতে নিষেধ করিয়া, প্রত্যহ তাঁহাকে দেখিতে যাইতেন এবং পাঁচ ছয় ঘণ্টা করিয়া বৃদ্ধার নিকট উপস্থিত থাকিয়া শীতলের অনুপস্থিতিসময়ে নিজে তাঁহার সমস্ত তত্ত্বাবধান করিতেন। এইরূপে মীরাটের দারুণ শীতে প্রত্যহ বাহিরে যাতায়াত করিয়া ঠাণ্ডা লাগিয়া তাঁহারও জ্বর হয়। জ্বর ক্রমে বাড়িতে লাগিল এবং তিনিও শয্যাগত হইয়া পড়িলেন।

সতীশচন্দ্রের অনুরোধে ডাক্তার ত্রৈলোক্যনাথ একদিন তাঁহাকে পরীক্ষা করিয়া বলিলেন, নিউমোনিয়ার সূত্রপাত হইয়াছে। বরেন্দ্রের বাটীতে তাঁহার সেবা-শুশ্রূষা ও তত্ত্বাবধানের অসুবিধা হইবে মনে করিয়া প্রসন্নকুমার দেবেন্দ্রনাথকে আপন বাটীতে লইয়া আসিলেন। ক্রমে ব্যাধি ডবল নিউমোনিয়ায় পরিণত হইল; ভক্তগণ সকলেই অতিশয় চিন্তিত হইয়া পড়িলেন।

কলিকাতা হইতে কৃষ্ণকুমার অসুখের সংবাদ শুনিয়া হঠাৎ কাহাকেও কিছু না বলিয়া তথায় যাইয়া উপস্থিত হইলেন। সতীশচন্দ্র ও তাঁহার স্ত্রী, কৃষ্ণকুমার, শ্রীযুত হরিচরণ ঘোষ

(প্রসন্ন বাবুর কম্পাউণ্ডার) এবং বরেন্দ্রের কনিষ্ঠ ভ্রাতা শ্রীযুত জ্ঞানেন্দ্রনাথ প্রভৃতি দিনরাত্রি পরিচর্য্যায় নিযুক্ত রহিলেন। প্রসন্নকুমার অকাতরে অর্থব্যয় ও নিয়ত পর্য্যবেক্ষণ করিতে লাগিলেন। বিচক্ষণ ডাক্তার ত্রৈলোক্যনাথ প্রাণপণে তাঁহার চিকিৎসা করিতে লাগিলেন। দেবেন্দ্রনাথের অবস্থা ক্রমশঃই অত্যন্ত খারাপ হইতে লাগিল। কৃষ্ণকুমার প্রভৃতিকে উদ্বিগ্ন দেখিয়া একদিন তিনি বলিয়াছিলেন, "ওরে, আমি এখন মরবো না, আমার কাজ এখনও বাকী আছে।"

"এবার রোগ রোগী দুই কাবার হবে।"

শীতলচন্দ্রের মাতা কিছুদিন পরে দেহত্যাগ করেন, ঐ দিন দেবেন্দ্রনাথের ব্যাধি চরম অবস্থা প্রাপ্ত হয়; সমস্ত শরীর শীতল, হাতের নাড়ীর স্পন্দন পাওয়া গেল না। শ্বাস দ্রুত বহিতে থাকে ও অনবরত তিনি প্রলাপ বকিতে থাকেন। ডাক্তার ত্রৈলোক্যনাথ তাঁহার অন্তিমকাল উপস্থিত জানিয়া অশ্রুপূর্ণ-লোচনে রোগীর নিকট হইতে চলিয়া গেলেন। খানিক পরে সেখানকার প্রসিদ্ধ ডাক্তার জহরুদ্দিনকে এই মুমূর্ষ রোগী দেখাইবার জন্য তিনি লইয়া আসেন। হাতের নাড়ী না পাওয়ায় জহরুদ্দিন গলার নাড়ী টিপিয়া দেখিলেন। দেবেন্দ্রনাথ তাহাতে বলিলেন, "এবার রোগ রোগী দুই কাবার হবে"।

ইহাতে জহরুদ্দিন আশ্চর্য্যান্বিত হইয়া বলেন, "এ কি ব্যাপার, এমত অবস্থায়ও রহস্য—এ রকম রোগী ত আমি কখনও দেখি নাই"!

তখন দেবেন্দ্রনাথের অবস্থা দেখিয়া বেশ বুঝা যাইত যে, তাঁহার স্থূল দেহ হইতে তিনি সম্পূর্ণ পৃথক্ হইয়া অবস্থিতি করিতেছিলেন; তাঁহার দেহটাই কেবল রোগ ভোগ করিতেছে, আর তিনি যেন সদা আনন্দময় ও পূর্ণ-চৈতন্যরূপে বিরাজ করিতেছেন।

এ দিকে সতীশচন্দ্র, তাঁহার স্ত্রী, কৃষ্ণকুমার ও হরিচরণ তাঁহাকে অনবরত সেক্-তাপ দ্বারা প্রাণপণে সেবা করিতে লাগিলেন। যখন সকলেই নিরাশ হইলেন, তখন হঠাৎ দেবেন্দ্রনাথ সতীশচন্দ্রকে বলিলেন, "সতীশ, আমাকে এক পান মকরধ্বজ দাও, উহা পেটরার ভিতর আছে। আদার রস ও মধু দিয়া আমাকে খাওয়াইয়া দাও।" সতীশচন্দ্র তৎক্ষণাৎ ত্রৈলোক্য বাবুর নিকট গিয়া জিজ্ঞাসা করায় তিনি উত্তরে বলিলেন, "তোমাদের যাহা ইচ্ছা হয় দিতে পার।"

মকরধ্বজ সেবন ও আরোগ্য লাভ।

সতীশচন্দ্র অবিলম্বে মকরধ্বজ ঐ অনুপানসহ সেবন করাইলেন। আশ্চর্য্যের বিষয়, কিছুক্ষণ পরেই তাঁহার অবস্থার পরিবর্ত্তন ঘটিল; নাড়ী আসিল, শরীরের তাপ বৃদ্ধি পাইল এবং অবস্থার উন্নতি হইতে লাগিল। তখন হইতে তিনি ক্রমশঃ আরোগ্যলাভ করিতে লাগিলেন। ত্রৈলোক্য ডাক্তার এই ব্যাপার দেখিয়া বলিয়াছিলেন, "জীবনে এমন রোগী কখনও দেখি নাই, ইঁহার সবই অলৌকিক—সবই ইঁহাতে সম্ভব!"

এই অসুখের সময় মীরাটের ভক্তগণ দেবেন্দ্রনাথের অনেক অলৌকিক ঘটনার উল্লেখ করিয়া থাকেন। ঘটনাগুলি সত্য হইলেও আমরা পাঠক-পাঠিকাগণের ধৈর্য্যচ্যুতির আশঙ্কায় তাহা বিবৃত করিতে নিরস্ত থাকিলাম। আরোগ্যলাভের পর দেবেন্দ্রনাথ বলিয়াছিলেন, "মীরাটের ভক্তগণের এরূপ সেবা না পাইলে আমি রক্ষা পাইতাম না।"

এই অসুখের পর দেবেন্দ্রনাথের শ্রবণশক্তির অনেক হ্রাস হইয়া যায়। তাহাতে তিনি জগন্মাতাকে সম্বোধন করিয়া বলিয়া-

ছিলেন, "মা, আমি তোর কথা শুনবো, আমাকে যেন কালা করিয়া রাখিস্ না। যদি কালা করিয়া রাখিস্, তবে গঙ্গায় প্রাণবিসর্জ্জন দিব।" যাহা হউক, কানে কিছুদিন ব্যাটারী ব্যবহারের পর তাঁহার শ্রবণশক্তি পুনরায় ফিরিয়া আসিয়াছিল। এই সময় কলিকাতা হইতে জানকীনাথ ও তদীয় সহধর্ম্মিণী আসিয়া দেবেন্দ্রনাথের শরণাগত হন।

মীরাটে অর্চ্চনালয়ের শাখা।

আরোগ্যলাভের পর প্রায় তিন মাসকাল দেবেন্দ্রনাথ মীরাটে ছিলেন। তাঁহার আগমনের পর মীরাটে শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ-অর্চ্চনালয়ের একটী শাখা স্থাপিত হয়। মীরাটের ভক্তগণ অন্যত্র চলিয়া গেলে উহা দিল্লীতে স্থানান্তরিত হয়। তাঁহার আদেশমত মীরাট হইতে ভক্তগণ লোকের নিকট ভিক্ষা করিয়া মাসিক ১৫৲ টাকা হিসাবে স্বামী অখণ্ডানন্দকে পূর্ব্বোল্লেখিত মুর্শিদাবাদস্থিত অনাথ-আশ্রমের সাহায্যকল্পে অনেক বৎসর পর্য্যন্ত প্রেরণ করিয়াছেন।

কলিকাতা প্রত্যাবর্ত্তন।

১৯০৯ সালের ৯ই মার্চ্চ তারিখে প্রসন্নকুমার দেবেন্দ্রনাথকে একখানি রিজার্ভ গাড়ীতে করিয়া কলিকাতায় লইয়া আসিলেন। এপ্রিল মাসে শ্রীশ্রীঠাকুরের উৎসব; তখন তাঁহার উপস্থিত থাকার বিশেষ প্রয়োজন। উৎসবে দরিদ্র-নারায়ণগণের সেবা দর্শন তাঁহার বড় আদরের বস্তু ছিল। দেবেন্দ্রনাথের সহিত শীতবস্ত্র প্রভৃতি যে সমুদয় জিনিষ আসিয়াছিল তাহা তিনি অল্প দিন মধ্যেই বিতরণ করিয়া দিলেন।

কলিকাতা প্রত্যাবর্ত্তন করিবার পর শ্রীযুত রাধাবিনোদ ঘোষাল, শচীন্দ্রনাথ দাস, মণিমোহন চট্টোপাধ্যায় এবং সস্ত্রীক শরচ্চন্দ্র ঘোষ

প্রভৃতি আসিয়া দেবেন্দ্রনাথের আশ্রয় গ্রহণ করেন। রাধাবিনোদের সহিত শ্রীযুত বাঞ্ছা ও নিধি বলিয়া উড়িষ্যা দেশবাসী দুটী ভক্তও আগমন করেন।

দেবেন্দ্রনাথ কলিকাতায় ফিরিয়া আসিলেন বটে, কিন্তু পূর্ব্বস্বাস্থ্য আর ফিরিয়া পাইলেন না। ডবল নিউমোনিয়ায় ভুগিয়া ফুস্‌ফুস্‌ দুর্ব্বল হইয়া গিয়াছিল। তাহার উপর আবার সাইটিকা নামক বাতের ব্যথা মাঝে মাঝে তাঁহাকে বড় কষ্ট দিত। এই ব্যথা প্রায় তিন বৎসর পূর্ব্বে সামান্যভাবে দেখা দিয়াছিল।

নবম উৎসব।

যথা নিয়ম গুডফ্রাইডের ছুটীতে উৎসব আরম্ভ হইল। প্রতি বৎসর উৎসবে দরিদ্র-নারায়ণের সেবাকার্য্য সম্পন্ন না হওয়া পর্য্যন্ত দেবেন্দ্রনাথ উপবাসী থাকিতেন। এই অসুস্থ শরীর লইয়াও তিনি ঐ ব্রত পালন পূর্ব্বক মহোৎসাহের সহিত উৎসবকার্য্য সমাধা করেন। উৎসবে শ্রীশ্রীগৌরীমাতা, শ্রীমৎ স্বামী শিবানন্দ, সারদানন্দ ও প্রেমানন্দ প্রভৃতি সন্ন্যাসিগণ ও ভক্তপ্রবর শ্রীযুত গিরিশচন্দ্র ঘোষ, মহেন্দ্রনাথ গুপ্ত, মহেন্দ্রনাথ দত্ত প্রভৃতি যোগদান করিয়াছিলেন। দরিদ্র-নারায়ণগণের সেবা হইয়া গেলে তিনি প্রসাদ গ্রহণ করেন।

এই সময় শ্রীযুত রাজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, জীবনকৃষ্ণ বসু, গোপালকৃষ্ণ ও হরেকৃষ্ণ সাহা, হরিপদ নাথ, মন্মথনাথ শীল প্রভৃতি আসিয়া দেবেন্দ্রনাথের আশ্রয়লাভ করেন।

"এখানে এলে গেলেই হয়ে যাবে।"

তিনি সংসারী লোকের দুঃখ সম্যকরূপে বুঝিতেন বলিয়া, যে সকল ভক্ত অতি কষ্টেসৃষ্টে সংসার চালাইতেন, তাঁহাদের কাহাকেও কোনরূপ

সাধন-ভজনের জন্য বিশেষ করিয়া উপদেশ দিতেন না। একদিন একটী ভক্ত এই সম্বন্ধে তাঁহার নিকট কথা তুলিলে তাহার উত্তরে তিনি ভক্তটীকে বলিয়াছিলেন, "আহা, উহারা মাথার ঘাম পায় ফেলিয়া দু' টাকা রোজগার করিয়া পরিবারবর্গের ভরণ-পোষণ করে; সংসারের অর্থসংগ্রহ করিতে উহাদের কত কষ্ট হয়। সকাল থেকে সন্ধ্যা পর্য্যন্ত অফিস করিয়া আর কখন সময় পাইবে যে, প্রত্যহ নিয়মমত ধ্যান-জপ করিবে? অর্থ-উপার্জ্জন করিতে কি উহাদের কম সাধনা করিতে হয়? তার পর যদি বলি, প্রত্যহ এক ঘণ্টা দেড় ঘণ্টা জপ ধ্যান করিতে, তাহা হইলে ওরা তা পারবে কেন? আহা, ওদের কিছু করতে হবে না। দয়াময় ঠাকুরের নামের গুণে ওদের এখানে এলে গেলেই হয়ে যাবে।"

সপ্তবিংশ পরিচ্ছেদ

ভবানীপুরে অবস্থান।

(১৯০৯)

পূর্ব্বের ন্যায় দেবেন্দ্রনাথের স্বাস্থ্য আর এখন নাই। ফুস্‌ফুস্‌ দুর্ব্বল হওয়াতে অনেক সময়, বিশেষতঃ বর্ষা ও শীতকালে সর্ব্বদাই শ্বাস-প্রশ্বাসের কষ্ট হইত। ইহার উপর সামান্য অনিয়ম হইলেই জ্বর দেখা দিত। এই অসুস্থ শরীরেও তিনি ভগবৎপ্রসঙ্গ করিয়া ভক্ত-গণের আনন্দবর্দ্ধন করিতেন। যতক্ষণ ঈশ্বরীয় প্রসঙ্গে থাকিতেন, ততক্ষণ তাঁহার শরীরে কোনরূপ অসুখ আছে, ইহা একেবারেই অনুভূত হইত না। কিন্তু যেমন ঈশ্বরীয় প্রসঙ্গ হইতে বিরত হইতেন, অমনি কোথা হইতে নানাপ্রকার ব্যাধির লক্ষণ ও আক্ষেপসকল আসিয়া উপস্থিত হইত।

হরিগোপাল-ভবনে অবস্থান।

ইটালীতে যে বাড়ীতে দেবেন্দ্রনাথ বাস করিতেন, বর্ষাকালে সে বাড়ী তাঁহার স্বাস্থ্যের পক্ষে নিতান্ত অনুপযোগী ছিল। কারণ, উহা একতলা, ঘরগুলি স্যাঁৎস্যাঁতে, বর্ষাকালে আরও ভিজিয়া অধিক স্যাঁৎস্যাঁতে হইয়া উঠিত; বিশেষ করিয়া বায়ুসঞ্চালনেরও অভাব ছিল। তদুপরি সকাল বিকাল চারিদিকের ধূঁয়া ঘরবাড়ী একেবারে অতিষ্ঠ অন্ধকার করিয়া ফেলিত। সুস্থ লোকের পক্ষেই এরূপ অবস্থায় শ্বাসপ্রশ্বাসের কষ্ট হইত, তাঁহার ত কথাই নাই। বাড়ীটীও নিতান্ত ছোট। এজন্য বর্ষাকালে হরিগোপালের ভবানীপুরস্থ, ৩নং গোপাল

ব্যানার্জ্জির ষ্ট্রীট, বাটীতে থাকিবার বন্দোবস্ত করিয়া ভক্তগণ তাঁহাকে ১৯০৯ সালের জুন মাসে তথায় লইয়া গেলেন। হরিগোপালের বাটীর দক্ষিণ দিকে 'হরিশপার্ক'; বাটীটী দোতলা ও বেশ প্রশস্ত, বিশুদ্ধ বায়ুসেবনে তাঁহার উপকার হইবার সম্ভাবনা আছে বলিয়া দেবেন্দ্রনাথও তথায় আসিতে সম্মত হইলেন। এ বাটীতে পূর্ব্বে তিনি একবার আসিয়াছিলেন, তখন হরিগোপাল সবেমাত্র তাঁহার নিকট যাতায়াত করিতেছিলেন। হরিগোপালের স্ত্রী ও ভগিনী দেবেন্দ্র-নাথকে গুরুজ্ঞানে ভক্তি-শ্রদ্ধা করিতেন।

ভক্ত-সমাগম।

দেবেন্দ্রনাথের শুভাগমনে হরিগোপাল-ভবনে ইটালীর ন্যায় নিত্য আনন্দের হাট বসিত। সকাল হইতে রাত্রি দশ ঘটিকা পর্য্যন্ত লোকসমাগমের বিরাম থাকিত না। কখনও ভগবৎপ্রসঙ্গে, কখনও বা কীর্ত্তনে সময় কাটিয়া যাইত। অল্পদিনমধ্যেই এই বাটীতে একজন বড় সাধু আসিয়াছে বলিয়া চতুর্দ্দিকে রটিয়া গেল। অনেক ভাবের অনেক লোক আসিতে লাগিল। কেহ কেহ মনের সন্দেহ মিটাইবার জন্য দেবেন্দ্রনাথের নিকট আসিত, কিন্তু তাঁহাকে প্রশ্ন করিবার অগ্রেই তিনি প্রসঙ্গস্থলে তাহাদের সন্দেহের মীমাংসা করিয়া দিতেন। এজন্য অনেকেই তাঁহাকে অন্তরের কথা জানিতে পারেন বলিয়া মনে করিত।

একদিন শিবনারায়ণ স্বামীর আশ্রিতা একটী ভক্তিমতী বর্ষীয়সী বিধবা রমণী উক্ত স্বামীজির নিকট হইতে বহুদিন দীক্ষা গ্রহণ করিয়াও এখন পর্য্যন্ত ভগবানের নামে কোনরূপ আনন্দ লাভ করিতে পারেন নাই বলিয়া আক্ষেপ করিতে লাগিলেন। ভক্তিমতী

রমণীর আক্ষেপ শ্রবণে দেবেন্দ্রনাথের প্রাণ কাঁদিয়া উঠিল। তিনি শ্রীশ্রীঠাকুরকে স্মরণ করিতে করিতে ভাবস্থ হইলেন এবং উক্ত অবস্থায় ঐ স্ত্রীলোকটীর মস্তকে পাদস্পর্শ করিলেন। ইহাতে স্ত্রীলোকটী "বাবা, তুমি আমাকে এ কি দেখালে ?" এই কথা বলিতে বলিতে আনন্দে ক্রন্দন করিতে লাগিলেন। পরে প্রকৃতিস্থ হইয়া দেবেন্দ্রনাথকে প্রণাম করিয়া সন্তুষ্ট-চিত্তে প্রস্থান করিলেন। তদবধি তিনি দেবেন্দ্রনাথের একখানি প্রতিকৃতি নিজের নিকট সযত্নে রাখিয়াছিলেন এবং সন্ন্যাসিনীবেশে অপর এক সন্ন্যাসিনীর আশ্রমে বাস করিতে লাগিলেন।

শ্রীযুত চারুচন্দ্র ঘোষ নামক জনৈক যুবক এই সময় দেবেন্দ্রনাথের নিকট আসেন। তিনি তখন সবে ওকালতী করিতে আরম্ভ করিয়াছেন। লজ্জাশীল যুবক চারুচন্দ্র দেবেন্দ্রনাথের নিকট আসিলেন বটে, কিন্তু সর্ব্বসমক্ষে আপনার মনোগত ভাব ব্যক্ত করিতে পারিলেন না। বাটী হইতে এক পত্র লিখিয়া দেবেন্দ্রনাথকে জিজ্ঞাসা করেন, "তাঁহার ভগবান্-লাভ হইয়াছে কি না ?" তিনি চারুচন্দ্রকে ডাকাইয়া বলিলেন, "দেখ, আমার ভগবান্-লাভ হয় নাই, এ কথা বলিতে পারি না, আর ভগবান্-লাভ হয়েছে, এ কথাও বলিতে পারি না।" ইহার পর এই সম্বন্ধে তাঁহার সহিত অনেক কথা হয়। চারুচন্দ্র তাঁহাকে দেখিয়া এবং তাঁহার বাক্যে মুগ্ধ হইয়া তাঁহার নিকট যাতায়াত আরম্ভ করিলেন। পরে তাঁহার কৃপাপ্রাপ্ত হন।

এই সময়ে শ্রীযুত প্রবোধচন্দ্র রায় চৌধুরী, হারাণচন্দ্র ঘোষ, হরিচরণ ভট্টাচার্য্য, আদীশ্বর ভট্টাচার্য্য, জ্যোতীশচন্দ্র রায়, অবিনাশচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় প্রভৃতি আসিয়া তাঁহার কৃপা প্রাপ্ত হন।

উক্ত হরিচরণ কালী-উপাসক ছিলেন। তিনি দেবেন্দ্রনাথকে একদিন বলিলেন, "মশাই, প্রত্যহ কালীপূজা করি, কিন্তু মায়ের কোন সাড়া পাই না কেন?"

তদুত্তরে দেবেন্দ্রনাথ বলেন, "মাকে তুমি নাড় না, তাই মাও সাড়া দেন না, তাঁকে নাড়লেই—ব্যাকুল হয়ে কাঁদ্‌লেই তিনি সাড়া দেবেন।"

বুধীর মা বলিয়া জনৈকা ভক্তিমতী বৃদ্ধা স্ত্রীলোক সুশীলচন্দ্রের সহিত দেবেন্দ্রনাথকে দর্শন করিতে আসেন। তিনি দেবেন্দ্রনাথকে দেখিয়া ও তাঁহার কথায় আকৃষ্ট হইয়া তাঁহার পা জড়াইয়া ধরিয়া কাঁদিতে থাকেন। দেবেন্দ্রনাথও তাঁহার ব্যাকুলতা ও ভক্তি দেখিয়া সমাধিস্থ হন এবং পরে তাঁহাকে কৃপা করেন।

ইহার পর শ্রীযুত রাজকুমার মুখোপাধ্যায় (রাজু মামা) কানাইলাল রায় প্রভৃতি আসিয়া দেবেন্দ্রনাথের আশ্রয় লাভ করেন। এই সময়ে বহু স্ত্রীলোকেরও সমাগম হইত। তাঁহাদের মধ্যে অনেক অনাথা দরিদ্র বিধবা রমণীও ছিলেন। দয়ার আধার দেবেন্দ্রনাথ কাহাকেও উপেক্ষা করিতেন না, সকলকেই সাদরে গ্রহণ করিতেন। তাঁহাদের দুঃখে দুঃখিত হইয়া তিনি সদুপদেশ ও অর্থাদির দ্বারা অনেক সময় সাহায্য করিতেন।

আমরা এখানে দেবেন্দ্রনাথের দয়ার একটীমাত্র দৃষ্টান্ত উল্লেখ করিতেছি। একদিন সকালবেলা বাড়ীর হিন্দুস্থানী পরিচারিকা তাহার শিশু সন্তানটীকে চৌবাচ্চার পার্শ্বে ছিন্ন মলিন বস্ত্রের উপর শুয়াইয়া কাজ করিতেছিল। দেবেন্দ্রনাথ ইহা দেখিয়া ব্যথিত হইলেন. পরে অনুসন্ধানে জানিলেন যে, উহার জ্বর হওয়ায় তাহাকে ঐরূপ অবস্থায় রাখিয়া উহার মাতা কার্য্য করিতেছে। দেবেন্দ্রনাথ আর সুস্থির থাকিতে পারিলেন না; তৎক্ষণাৎ বসন্তকুমারকে দিয়া বালকটীর চিকিৎসা,

পথ্য ও পরিষ্কার বস্ত্রের ব্যবস্থা করিয়া দিলেন। যত দিন না বালকটী আরোগ্য লাভ করে, তত দিন তাহার তত্ত্বাবধান করিয়াছিলেন।

'একটী ভাব আশ্রয় ক'রে অগ্রসর হউন'।

কখন্ কি ভাবের লোক দেবেন্দ্রনাথের নিকট আসিবে, তাহা তিনি অগ্রেই জানিতে পারিতেন। জিজ্ঞাসু কিংবা মুমুক্ষু ব্যক্তির পক্ষে তাঁহার দ্বার অবারিত ছিল। কিন্তু কেহ নিজের সাধুতা দেখাইতে আসিলে তিনি প্রায়ই তাঁহার সহিত দেখা করিতেন না। এক সময়ে একটী ভদ্রলোক উপর্য্যুপরি কয়েক দিন তাঁহাকে দেখিতে আসিয়া তাঁহার দর্শন না পাইয়া ফিরিয়া যান। পুনরায় আর একদিন আসিলে, একজন ভক্ত যাইয়া বাটীর ভিতরস্থিত দেবেন্দ্রনাথকে বলিলেন, "মহাশয়, একটী লোক কয়েক দিন আসিয়া ফিরিয়া গিয়াছেন। আজ আপনি দেখা না দিলে তাঁর বড় কষ্ট হবে, আপনি একবার চলুন।" এখানে বলা বাহুল্য যে, দেবেন্দ্রনাথ ইচ্ছা করিয়াই এই কয়েক দিবস লোকটীর সহিত দেখা করেন নাই।

আজ ভক্তের কথা শুনিয়া বলিলেন, "আমি যাইয়া কি করিব? উনি অনেক স্থান ঘুরিয়াছেন, এখানে নিজের বিদ্যার পরিচয় দিতে আসিয়াছেন।" ভক্তটী বিস্মিত হইয়া ভাবিলেন, "ইনি পূর্ব্বে দেখেন নাই, তবে আগন্তুককে জানিলেন কিরূপে?" যাহা হউক, ভক্তের অনুরোধে দেবেন্দ্রনাথ বাহিরে আসিয়া লোকটীর সহিত কথাবার্ত্তা আরম্ভ করিলেন। আগন্তুক তাঁহার কথায় তাদৃশ মনোযোগ না দিয়া নিজের পাণ্ডিত্যের কথাই বলিতে আরম্ভ করিলেন। তিনি বলিলেন, "মহাশয়, আমি ভাল ভাল লোকের নিকট গিয়াছি। আমার আত্মসাক্ষাৎকার হইয়াছে।"

তদুত্তরে দেবেন্দ্রনাথ বলিলেন, "দেখুন, গর্ভিণীর গর্ভ হইলে সে কখনও কি ব'লে বেড়ায়? লোকে লক্ষণ দেখে বলে, সে মুচকি হাসে। ভাল মন্দ বিবেচনা করিয়া কার্য্য করিবেন, আত্মসাক্ষাৎকার হইলে সাধকের সমাধিলাভ হয়, এইরূপ উচাটন ভাব থাকে না। আপনার কি তা হয়েছে? আর আত্মপ্রবঞ্চনা কর্‌বেন না; একটী ভাব আশ্রয় ক'রে সরল বিশ্বাসের সহিত অগ্রসর হউন—মঙ্গল হবে। শুধু বই পড়লে ত হয় না, উপদেশগুলি নিজ জীবনে প্রতিফলিত করতে চেষ্টা করুন।" অতঃপর আগন্তুক প্রস্থান করিলেন, আর কোন দিন তিনি আসেন নাই।

নাগমহাশয়ের কথা বলিতে বলিতে সমাধি।

পূর্ব্ববঙ্গগৌরব সাধু নাগমহাশয়ের পরম ভক্ত শ্রীযুত হরপ্রসন্ন মজুমদার মহাশয় তাঁহার স্ত্রী এবং পুত্র শ্রীমান্ নীরদরঞ্জনকে লইয়া এই সময় একদিন দেবেন্দ্রনাথকে দর্শন করিতে আসেন। বাটীর ভিতর হরপ্রসন্ন বাবুর স্ত্রীর সহিত নাগমহাশয়ের বিষয় কথা বলিতে বলিতে দেবেন্দ্রনাথ অশ্রু বিসর্জ্জন করিতে লাগিলেন এবং অল্পক্ষণ পরে হঠাৎ সমাধিস্থ হইয়া গেলেন,—দৃষ্টি স্থির, সমস্ত দেহ কাষ্ঠবৎ কঠিন! হরপ্রসন্ন বাবুর স্ত্রী পূর্ব্বে এরূপ ভাব কখনও দেখেন নাই, তাই অত্যন্ত ব্যস্ত ও ভীতা হইয়া, কখন বাতাস, কখন বা গায়ে হাত বুলাইতে লাগিলেন। ইহার কিছুক্ষণ পরে প্রকৃতিস্থ হইয়া দেবেন্দ্রনাথ বাহিরের ঘরে আসিয়া বসিলেন।

নীরদরঞ্জনের গান।

বাহিরে কীর্ত্তন হইতেছিল। নীরদরঞ্জন সুগায়ক শুনিয়া, তাঁহাকে দেবেন্দ্রনাথ গান গাহিতে বলিলেন। বালক নীরদ গান ধরিল :—

"আমি ত তোমারে চাহিনে জীবনে,
তুমি অভাগারে চেয়েছ।
আমি না চাহিতে হৃদয়-মাঝারে,
সেধে এসে দেখা দিয়েছ॥"

গান শুনিয়া দেবেন্দ্রনাথ হাউ হাউ করিয়া কাঁদিতে লাগিলেন, এবং নীরদকে টানিয়া কোলে বসাইলেন। গৃহস্থিত ভক্তমণ্ডলী সকলেই উচ্চৈঃস্বরে কাঁদিতে লাগিলেন। এই আনন্দের ক্রন্দনপ্রবাহ অনেকক্ষণ চলিতে লাগিল। অনেকে গড়াগড়ি যাইতে লাগিলেন। এই অপূর্ব্ব দৃশ্য যাঁহারা দেখিয়াছেন, তাঁহারা কখনও ভুলিতে পারেন নাই।

"ঈশ্বর সাকারও বটে, নিরাকারও বটে।"

ইহার পর একদিন একটী ভদ্রলোক দেবেন্দ্রনাথকে দেখিতে আসিয়া জিজ্ঞাসা করেন, "মহাশয়! ঈশ্বর সাকার কি নিরাকার?"

তদুত্তরে দেবেন্দ্রনাথও জিজ্ঞাসা করেন, "আগে বলুন, আপনি সাকার কি নিরাকার?"

ইহাতে তিনি অনেক ভাবিয়া চিন্তিয়া বলেন, "আজ্ঞে, সাকার নিরাকার দুই।"

দেবেন্দ্রনাথ উত্তর করিলেন, "ঈশ্বরও সাকার নিরাকার দুই; তিনি সাকারও বটে, নিরাকারও বটে। ভক্তিতে তিনি সাকার, জ্ঞানেতে সমদর্শন হইলে তিনি নিরাকার।"

দেবেন্দ্রনাথের উত্তর শুনিয়া ভদ্রলোকটী স্থির হইয়া ভাবিতে লাগিলেন এবং বলিলেন, "আমার বহুকালের সংশয় আজ ভঞ্জন হইল।"

এই সময় মীরাট হইতে শীতলচন্দ্র, প্রতাপচন্দ্র এবং হেতমপুর হইতে নলিনীকান্ত ও ঐ কলেজের বিজ্ঞানের অধ্যাপক শ্রীযুত উপেন্দ্রনাথ ঘোষ

দেবেন্দ্রনাথকে দেখিতে আসিয়াছিলেন। উপেন্দ্রনাথকে তিনি একদিন বিশেষভাবে কৃপা করিয়াছিলেন। ঢাকা হইতে সস্ত্রীক হরেন্দ্রকুমার এখানে আসেন। হরেন্দ্রকুমারের স্ত্রী দেবেন্দ্রনাথের কৃপা লাভ করেন।

ভক্তগণের গৃহে পদার্পণ

এই সময় দেবেন্দ্রনাথ কিছুদিন নিত্য প্রাতে গঙ্গাস্নান করিতেন এবং বৈকালে বেড়াইতেন। কোন কোন দিন ভক্তগণ তাঁহাকে আপন বাটীতে লইয়া যাইয়া গৃহ পবিত্র করিতেন। একদিন তিনি হেম রায়ের বাটী গিয়াছিলেন, তথা হইতে পশুপতি বিশেষ আগ্রহ করিয়া তাঁহাকে নিজ বাটীতে লইয়া যান এবং তাঁহার বৃদ্ধ পিতা ও পরিবারবর্গকে তাঁহার পাদপদ্মে সমর্পণ করেন। তাঁহারা সকলেই দেবেন্দ্রনাথের কথা শুনিয়া শান্তিলাভ করেন এবং তাঁহার কৃপাপ্রাপ্ত হইয়া ধন্য হইয়াছেন।

আর একদিন রাজুমামার বাড়ী গিয়াছিলেন। রাজুমামা কুলীন ব্রাহ্মণ, দুই বিবাহ। উভয় পত্নীর অনেকগুলি সন্তান। তাহার উপর উপার্জ্জন অতি সামান্য। সংসারে নিত্যই কলহ ও অশান্তি বিরাজমান। দেবেন্দ্রনাথ তাঁহার গৃহে পদার্পণ কবিবামাত্রই এক গৃহিণী আসিয়া তাঁহার নিকট স্বামীর বিরুদ্ধে নানারূপ অভিযোগ করিতে আরম্ভ করিলেন।

দেবেন্দ্রনাথ স্থির হইয়া সকল কথা শুনিলেন। পরে বলিলেন, "খুব দুঃখের কথাই ত বটে, কিন্তু মা, তোমার কপাল ত তোমার সঙ্গেই নিয়ে এসেছ। আপন ভাগ্যের ফলে যে এমনটা ঘটেছে, তা একবারও কেন ভাব না? রাজুর ত অন্য কোন দোষ নাই, প্রাণপণে তোমাদিগকে সুখী কর্‌তে চেষ্টা করছে—তা তোমাদের ভাগ্যে এর

বেশী জুটবে না, তার সে কি করবে বল ?” ইত্যাদি কথা গৃহিণীর দুঃখে দুঃখিত হইয়া, এমন স্নেহপূর্ণভাবে দেবেন্দ্রনাথ বলিতে লাগিলেন যে, রমণীর প্রাণ বিগলিত হইল। আপন কর্ম্মফল ভোগের জন্য স্বামীকে বৃথা গঞ্জনা করিয়াছেন বলিয়া তিনি দুঃখিত হইলেন। তদবধি তাঁহার স্বভাবের পরিবর্ত্তন হয়।

রাজুমামা লেখাপড়া জানিতেন না বলিলেই হয়, কিন্তু তিনি সংস্বভাব ও বিচারশীল লোক ছিলেন। সর্ব্বকার্য্যেই নিত্যানিত্য বিচারবুদ্ধি পরিচালনা করিতেন। সংসারের দারুণ ক্লেশ ও ভীষণ দারিদ্র্যে নিষ্পেষিত হইয়াও তিনি নিত্যবস্তুর সন্ধান করিতে কখনও ভোলেন নাই। এই নিমিত্ত দেবেন্দ্রনাথ তাঁহাকে অতিশয় আদর করিতেন ও ভালবাসিতেন। তাঁহার আশ্রয় লাভ করিয়া রাজু মামা যে কি শান্তি লাভ করিয়াছিলেন, তাহা তিনি মুখে ব্যক্ত করিতে পারিতেন না।

দেবেন্দ্রনাথ সমাজে নিতান্ত হীন ও পরিত্যক্ত ব্যক্তির মধ্যেও গুণ দেখিতে পাইতেন এবং তাহারই নিমিত্ত তাঁহাকে আদর করিতেন। তিনি ভাল বলিয়াই লোকের ভাল করিতে চেষ্টা করিতেন। তাঁহার নিকট কাহাকেও কখনও উপেক্ষিত হইতে আমরা দেখি নাই, বা তাঁহার মুখে কখনও পরনিন্দা কেহ শ্রবণ করে নাই।

দেবেন্দ্রনাথ যখন যাঁহার সহিত কথা বলিতেন, তখন তাঁহারই মত হইয়া যাইতেন। বৃদ্ধ, যুবা, বালক, স্ত্রী, পুরুষ, বিদ্বান্, মূর্খ, ধনী, দরিদ্র, সুখী, দুঃখী প্রভৃতি সকলেরই মত আপনাকে মুহূর্ত্তের মধ্যে পরিবর্ত্তিত করিয়া তাঁহাদের ভাবানুযায়ী কথা বলিতেন। তিনি সকলেরই ভাব রক্ষা করিতেন এবং যাহাতে তাঁহারা আপন আপন ভাবে উন্নতি লাভ করিতে পারে সেইরূপ উপদেশ দিতেন।

ভক্তগণের বাটী যাইয়া সকল দিকেই দেবেন্দ্রনাথের দৃষ্টি আকর্ষণ করিত। তাঁহার আলাপ ব্যবহারে সকলেরই মনে হইত, যেন বাড়ীর মুরুব্বি ও মালিক বহুদিন পরে বাড়ী আসিয়াছেন। তাঁহাদের গৃহে যেখানে ত্রুটী দেখিতেন, তাহা তাঁহাকে বলিয়া সংশোধন করিয়া দিতেন। বাটী পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন ও গৃহের জিনিষ সুশৃঙ্খলামত রাখিতে বলিতেন। আরও বলিতেন, "নিজের পায়খানাও নিজেকেই পরিষ্কার করিতে হয়, নিজে না পারিলেই অন্য লোকের সাহায্য আবশ্যক হয়"।

হেতমপুর যাইবার প্রস্তাব।

ভক্তগণ যে উদ্দেশ্যে তাঁহাকে ভবানীপুর আনয়ন করেন, তাঁহাদের সে উদ্দেশ্য সফল হইল না। মধ্যে মধ্যে দেবেন্দ্রনাথের অসুখ খুব বাড়িতে লাগিল। হোমিওপ্যাথিক মতে চিকিৎসা হইতেছিল। ডাক্তার শরচ্চন্দ্র ঘোষ এম, ডি, মহাশয় তাঁহাকে যত্ন সহকারে দেখিতেন। তিনি দেবেন্দ্রনাথকে দেখিয়া ও তাঁহার কথা শুনিয়া মুগ্ধ হইতেন। কখনও তাঁহার নিকট হইতে দর্শনী গ্রহণ করিতেন না। এখানে কোন ফল না পাওয়ায় ভক্তগণ তাঁহাকে অন্য কোন স্বাস্থ্যকর স্থানে লইয়া যাইবার পরামর্শ করিতে লাগিলেন। নলিনীকান্ত, হেতমপুরে লইয়া যাইবার প্রস্তাব করায় অনেকেই তাঁহার মতে মত দিলেন। ভাদ্র মাস ভবানীপুরে থাকিয়া আশ্বিন মাসে হেতমপুরে যাত্রা করা স্থির হইল। কিন্তু সহসা এক বাধা উপস্থিত হওয়ায় তিনি আশ্বিন মাসে হেতমপুর যাইতে পারিলেন না। অগত্যা পুনরায় অর্চ্চনালয়ে প্রত্যাগমন করিলেন।

হেতমপুর নলিনীকান্তের নিকট যাইতে প্রতিশ্রুত ছিলেন বলিয়া, শারদীয়া পুজান্তে শুক্লা ত্রয়োদশী তিথিতে তথায় যাইবেন স্থির করিলেন।

যাত্রার পূর্ব্বে তিনি বাগবাজারে শ্রীশ্রীমাতাঠাকুরাণীকে দর্শন করিতে গমন করেন ও তাঁহার নিকট হেতমপুর যাইবার অনুমতি প্রার্থনা করেন। শ্রীশ্রীমা অনুমতি দিয়া বলিয়াছিলেন,—"দেবেনের দেব-শরীর, ইহাতে কি কোন অসুখ হ'তে পারে? তবে পাঁচ জনকে নিয়ে থাক্‌তে হয় ব'লে কষ্ট পেতে হয়।"

অষ্টাবিংশ পরিচ্ছেদ

হেতমপুর-গমন।

(১৯০৯—১০)

১৯০৯ সালের অক্টোবর মাসে শুক্লা ত্রয়োদশী তিথিতে দেবেন্দ্রনাথ কৃষ্ণকুমার ও প্রবোধচন্দ্রকে সঙ্গে লইয়া হেতমপুর যাত্রা করিলেন। ইহার প্রায় সাত মাস পূর্ব্বে শ্রীযুত প্রবোধচন্দ্র রায় নলিনীকান্তের অনুরোধে দেবেন্দ্রনাথের নিকট আসেন ও তাঁহার কৃপা প্রাপ্ত হন। হেতমপুর ষ্টেশন হইতে তিন মাইল দূরে অবস্থিত সাঁইথিয়া ষ্টেশনে যথাসময়ে আসিয়া নলিনীকান্ত দেবেন্দ্রনাথকে সঙ্গে করিয়া লইয়া যান। ষ্টেশনে রেল-লাইনের উপর পুল পার হইতে দেবেন্দ্রনাথের বড় কষ্ট হইয়াছিল। রাত্রি দশ ঘটিকার সময় সকলে বাটী পৌছিলেন।

দেবেন্দ্রনাথ আসিয়াছেন জানিয়া তথাকার কলেজের ছাত্র শ্রীযুত রামকানাই রাণা, অনাথনাথ চট্টোপাধ্যায়, হরিহর বন্দ্যোপাধ্যায়, চন্দ্র-শেখর দত্ত প্রভৃতি ধর্ম্ম-পিপাসু ছাত্রগণ তাঁহার নিকট আসিয়া জুটিলেন। ইঁহারা সকলেই তাঁর কৃপা লাভ করিয়াছেন।

প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্য-সম্ভোগ।

হেতমপুরের প্রাকৃতিক দৃশ্য দেখিয়া সৌন্দর্য্যের উপাসক দেবেন্দ্রনাথ বড়ই মুগ্ধ হইয়াছিলেন। স্থানটী তাঁহার নিকট ঋষি-পল্লীর ন্যায় বোধ হইত। এ সম্বন্ধে তিনি এক পত্রে লিখিয়াছিলেন—"হেতমপুর

স্থানটী বেশ নির্জ্জন ও শান্তিপ্রদ এবং কবিতাপ্রিয় লোকের পক্ষে বড়ই প্রীতিকর, এখানকার জলবায়ু মন্দ নহে।"

কিছু দিন অবস্থানের পর দেবেন্দ্রনাথ প্রাতঃকালে ও সন্ধ্যার সময় মুক্ত প্রান্তরে ভ্রমণ করিতে আরম্ভ করেন। ভ্রমণ করিতে বাহির হইলে ভক্তগণ তাহার সহিত মিলিত হইতেন। ভ্রমণকালে কখনও নয়ন-তৃপ্তিকর প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্যের মধুর বর্ণনায়, কখনও বা তত্রত্য কঙ্করবিশিষ্ট মৃত্তিকাভ্যন্তর হইতে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অভ্র-খণ্ড এবং মৃত্তিকার লৌহ ও প্রস্তর প্রভৃতি নানারূপে পরিণত পদার্থ সকলের আহরণ করিয়া, লীলাময়ীর বিচিত্র সৃষ্টি-কৌশলের ব্যাখ্যায় সকলকে স্তম্ভিত ও আনন্দে মত্ত করিয়া তুলিতেন! সন্ধ্যার প্রাক্‌কালে শ্যামায়মান আম্র-বনরাজীর উপান্তে উপবেশন করিয়া সকলে নীরবে নির্জ্জনতার মধ্যে বিশ্বপতির বিরাট লীলানাট্যের পটপরিবর্ত্তনের গাম্ভীর্য্য অনুভব করিতেন।

৺শ্যামাপূজার দিন ভাবসমাধি।

এই ভাবে প্রায় একপক্ষ কাল গত হইলে ৺শ্যামাপূজার ছুটীতে কলিকাতা হইতে মণিমোহন, সুশীলচন্দ্র ও ধীরেন্দ্রনাথ দেবেন্দ্রনাথকে দেখিতে আসিলেন। ৺শ্যামাপূজার দিন রাত্রে ভক্তগণ মিলিত হইয়া তাঁহাকে কিছু না বলিয়া সহসা একত্রে তাঁহার পাদপদ্মে পুষ্পাঞ্জলি অর্পণ করেন। ইহাতে দেবেন্দ্রনাথ "মা আনন্দময়ী, মা আনন্দময়ী" বলিতে বলিতে ভাবস্থ হইয়া পড়েন। ভাব-সমাধি অবস্থায় অনেকক্ষণ অতিবাহিত হয়।

একই ঈশ্বরের বিভিন্ন নাম।

ইহার পর কলেজ খুলিলে উপেন্দ্রনাথ আসিয়া জুটিলেন। হেতমপুর-নিবাসী শ্রীযুক্ত মহেন্দ্রনাথ মজুমদার প্রায়ই দেবেন্দ্রনাথের নিকট

আসিতেন। ইঁনি বৈষ্ণব-ভাবাপন্ন; কালী, কৃষ্ণ ও শিব ইত্যাদিতে বিশেষ ভেদবুদ্ধি রাখিতেন। দেবেন্দ্রনাথের সঙ্গ ও উপদেশ লাভ করিয়া বুঝিতে পারিলেন যে, ঐ সকল একই ঈশ্বরের বিভিন্ন নাম মাত্র। তাঁহার বহুকালের অজ্ঞান-অন্ধকার বিদূরিত হওয়ায় দেবেন্দ্রনাথকে তিনি বিশেষভাবে ভক্তি ও শ্রদ্ধা করিতে আরম্ভ করেন। দেবেন্দ্রনাথের একখানি প্রতিকৃতি মহেন্দ্রনাথ আপন পূজার ঘরে রাখিয়াছিলেন।

প্রতিমা-পূজা সম্বন্ধে তর্ক।

এই সময় রাজ-কলেজের প্রধান অধ্যক্ষ শ্রীযুত অতুলচন্দ্র সেন মহাশয় দেবেন্দ্রনাথের নিকট আগমন করেন। ইঁনি ব্রাহ্মধর্ম্মাবলম্বী এবং প্রতিমাপূজার বিশেষ বিরোধী। দেবেন্দ্রনাথের নিকট আসিয়া তিনি প্রায়ই নানারূপ তর্ক জাল বিস্তার আরম্ভ করিতেন। প্রথম প্রথম দেবেন্দ্রনাথ তাঁহাকে বিশেষ কিছু বলিতেন না। একদিন বৈকালে তিনি "প্রতিমা-পূজা মিথ্যা পূজা" ইত্যাদি অনেক কথা বলেন। দেবেন্দ্রনাথ তাঁহাকে যত বুঝাইতে চেষ্টা করেন, তিনি ততই আপন গোঁ ধরিয়া কেবল তর্ক "করেন। সন্ধ্যার সময় তিনি গৃহে চলিয়া যান।

দেবেন্দ্রনাথ অধিক রাত্রি পর্য্যন্ত শয্যার উপর বসিয়া আপন মনে কি চিন্তা করেন আর প্রবোধচন্দ্রকে বলেন,—"হাঁরে প্রবোধ, এরা কিরূপ বিদ্বান্ রে? এই সামান্য কথাটা বোঝে না? ভূগোল, জ্যামিতি, বিজ্ঞান, লজিক্, সব বিদ্যার বেলায় একটা প্রতীক খাড়া ক'রে বিষয়গুলি বুঝিয়া লয়, আর ব্রহ্মবিদ্যার বেলাই যত আপত্তি! অদ্ভুত এদের শিক্ষা! এদের কি রকম বুদ্ধি রে?" এইভাবে অনেক কথা বলিতে থাকেন।

ইহার কিছু দিন পর হইতে অতুল বাবুর পূর্ব্ব-ভাবের পরিবর্ত্তন ঘটে; তর্ক-বিচার ছাড়িয়া দিয়া দেবেন্দ্রনাথকে অন্তরের সহিত শ্রদ্ধা-ভক্তি করিতে আরম্ভ করেন। দেবেন্দ্রনাথ কলিকাতা আসিলে তিনি তাঁহাকে দেখিতে আসেন।

পুণ্ডরীকাক্ষের স্মরণে সমস্ত পবিত্র।

হেতম্‌পুরের চতুষ্পাঠীর পণ্ডিত মহাশয় অত্যন্ত কঠোর-প্রকৃতির লোক ছিলেন। তিনি প্রায়ই দেবেন্দ্রনাথের সহিত ঈশ্বরীয় প্রসঙ্গে আলাপ করিতে আসিতেন। একদিন কথাবার্ত্তার পর তাঁহার অত্যন্ত পিপাসা পায়। তাঁহাকে জল দিতে যাইলে তিনি বলিলেন, "এ বাটীর জল খাইব না। এ বাটীতে একজন বিলাত-ফেরত বাস করিতেন। এখানকার এক হাত পরিমিত মাটি উঠাইয়া ফেলিলে, তবে বাটী পবিত্র হইবে। এ বাটীর জল অস্পৃশ্য।"

ইহাতে দেবেন্দ্রনাথ তাঁহাকে বলিয়াছিলেন, "পণ্ডিত মহাশয়! যদি হিন্দুশাস্ত্র মানেন ও ঈশ্বরে বিশ্বাস করেন, তবে এ কথার অর্থ কি বল্‌তে পারেন?—

অপবিত্রঃ পবিত্রো বা সর্ব্বাবস্থাং গতোঽপি বা।
যঃ স্মরেৎ পুণ্ডরীকাক্ষং সঃ বাহ্যাভ্যন্তর শুচিঃ॥

পুণ্ডরীকাক্ষকে স্মরণ করিয়া সমস্ত পবিত্র করিয়া লইলেই ত হয়। এখনও আপনি মাটির শুচি-অশুচি লইয়া পড়িয়া রহিয়াছেন? অন্তর কিসে পবিত্র হয় তা দেখছেন না!" ইত্যাদি কথায় নানারূপে বুঝাইবার পর পণ্ডিত মহাশয় অশ্রুবিসর্জ্জন করিতে লাগিলেন। ইতিপূর্ব্বে পণ্ডিত মহাশয়ের চক্ষুতে কেহ কখনও জল দেখে নাই।

কেন্দুবিল্বের মোহান্তজীর আগমন।

জয়দেব গোস্বামীর সাধনা-স্থল কেন্দুবিল্বগ্রাম হইতে সেখানকার মোহান্তজী দেবেন্দ্রনাথকে একবার দেখিতে আসিয়াছিলেন। দেবেন্দ্রনাথের সহিত আলাপ করিয়া তিনি এতদূর সন্তুষ্ট হইয়াছিলেন যে, তাঁহাকে কেন্দুবিল্বগ্রামে লইয়া যাইবার জন্য অনেক চেষ্টা করিয়াছিলেন। কিন্তু শরীর অসুস্থ থাকায় দেবেন্দ্রনাথ তথায় যাইতে সমর্থ হন নাই।

প্রসন্নকুমার মৃত্যু-শয্যায়।

প্রতিদিন প্রাতে ও সায়াহ্নে বিস্তীর্ণ মাঠে ভ্রমণ করিয়া দেবেন্দ্রনাথ আপনাকে কথঞ্চিৎ সুস্থ বোধ করিতে লাগিলেন। এক একদিন দুই মাইল পর্য্যন্ত ভ্রমণ করিতেন। মুক্ত বায়ু-সেবনে দিন দিন শরীরের উন্নতি হইতেছিল। কিন্তু সহসা এক অপ্রিয় ঘটনায় সমস্ত ওলট্-পালট্ হইয়া গেল। মীরাট হইতে সংবাদ আসিল, প্রসন্নকুমার কঠিন প্লেগ রোগে আক্রান্ত হইয়াছেন, জীবনের আশা অতি অল্প। প্রসন্নকুমারের বড় ইচ্ছা যে, দেহত্যাগের পূর্ব্বে একবার গুরুদেবকে দর্শন করেন। রোগ-শয্যায় শয়ান প্রসন্নকুমার স্বীয় অভিপ্রায় পত্রদ্বারা জ্ঞাপন করিলেন। প্রসন্নকুমার যাহাতে মৃত্যু-শয্যায় থাকিয়াও শান্তি লাভ করিতে পারেন, দেবেন্দ্রনাথ এরূপ ভাবে প্রত্যুত্তরে এক লিপি লিখিলেন।

মৃত্যু-শয্যায় প্রসন্নকুমারের মন যেমন চঞ্চল হইতে লাগিল, দেবেন্দ্রনাথও তাঁহাকে দেখিতে যাইবার জন্য ব্যাকুল হইলেন। তিনি বলিলেন, "যদি কাহারও পিতা মৃত্যুশয্যায় পুত্রকে স্মরণ করেন, পুত্র পিতৃসন্নিধানে না যাইয়া কি থাকিতে পারে?" কিন্তু

শীতের সময় কেহই তাঁহাকে সুদূর প্রদেশে লইয়া যাইতে সাহসী হইলেন না। বিশেষতঃ প্রসন্নকুমারের অসুখের সংবাদ শ্রবণের পর হইতেই তাঁহারও শরীর অসুস্থ হইতে লাগিল।

'আমার সর্ব্বতীর্থ শ্রীগুরুর পাদমূলে।'

প্রসন্নকুমারের জীবনের আশা নাই দেখিয়া তদীয় আত্মীয়-স্বজন তাঁহাকে মীরাটের বত্রিশ মাইল দূরবর্ত্তী গড়মুক্তেশ্বরে গঙ্গাতীরে লইয়া গেলেন। তৎকালে প্রসন্নকুমার বলিয়াছিলেন, "তোমরা আমাকে যেখানে ইচ্ছা লইয়া যাইতে পার, তাহাতে আমার কোন আপত্তি নাই; আমার সর্ব্বতীর্থ শ্রীগুরুর পাদমূলে।"

কিছু দিন পরে সংবাদ আসিল, প্রসন্নকুমার ইহধাম হইতে চির-বিদায় গ্রহণ করিয়াছেন। এ সংবাদ দেবেন্দ্রনাথকে কেহই জানাইলেন না; কিন্তু আশ্চর্য্যের বিষয়, দেবেন্দ্রনাথও সেই দিন হইতে আর একবারও প্রসন্নকুমারের সংবাদ জিজ্ঞাসা করিলেন না। ইহার পর তাঁহারও শরীর ক্রমে ক্রমে আবার সুস্থ হইতে লাগিল। তিন চারি দিন পরে জিজ্ঞাসা করিলেন, "তোমরা মীরাটের কোন সংবাদ পেয়েছ কি?"

তাহাতে নলিনীকান্ত উত্তর করিলেন, "পেয়েছি বটে, কিন্তু অশুভ সংবাদ বলিয়া আপনাকে জানান হয় নাই।"

দেবেন্দ্রনাথ বলিলেন, "তোমরা ভুল বুঝিয়াছ, কাহারও অসুখ হইলে আমার ভাবনা হয়, কিন্তু যদি মৃত্যু ঘটে, তাহা হইলে আমার ভাবনা বন্ধ হয়।"

প্রসন্নকুমার অন্তিমসময়ে "তুমি এসেছ, তুমি এসেছ, গুরু সত্য" —এই বাক্য উচ্চারণ করিয়া দেহত্যাগ করিয়াছিলেন। তাঁহার

ভ্রাতা ডাক্তার ত্রৈলোক্যনাথ বলিয়াছিলেন, প্রসন্নকুমার শেষ মুহূর্ত্তে শ্রীগুরুর দর্শন পাইয়াছিলেন।”

প্রসন্নকুমারের গুরুভক্তি অপূর্ব্ব! তাঁহার মন-প্রাণ সর্ব্বস্ব তিনি শ্রীগুরুর পাদপদ্মে সমর্পণ করিয়াছিলেন। তিনি মুর্শিদাবাদ অনাথ-আশ্রমের জন্য মাসে মাসে টাকা পাঠাইয়া সাহায্য করিতেন। তাঁহার বড় ইচ্ছা ছিল, মীরাটে শ্রীশ্রীঠাকুরের একটী মন্দির নির্ম্মাণ করেন। সহসা তাঁহার মৃত্যু ঘটাতে সে সঙ্কল্প তিনি কার্য্যে পরিণত করিয়া যাইতে পারেন নাই।

দেবেন্দ্রনাথ পৌষমাস পর্য্যন্ত হেতমপুর ছিলেন। তাঁহার অবস্থান-কালে স্থানটী আনন্দধামে পরিণত হইয়াছিল। তাঁহাকে পাইয়া তত্রত্য ভক্তগণের আনন্দের সীমা ছিল না। হাজারীবাগ হইতে একটী ভক্তিমতী বিধবা রমণী হেতমপুর আসিয়া তাঁহার আশ্রয় গ্রহণ করেন। দেবেন্দ্রনাথ প্রথমে ভালবাসিয়া সকলকে আপনার করিয়া লইতেন, পরে মিষ্টবাক্যে সংসারের অনিত্যতা বুঝাইয়া দিয়া আনন্দের রাজ্যে প্রবেশের পথ দেখাইয়া দিতেন। তিনি প্রায় কাহাকেও সাধনার বাঁধাবাঁধি নিয়ম করিয়া দিতেন না। আশ্রিতগণ অপূর্ব্ব ভালবাসায় আকৃষ্ট হইয়া দেবেন্দ্রনাথের কথামত কার্য্য করিতে প্রয়াস পাইতেন।

কলিকাতায় প্রত্যাবর্ত্তন ও দেবেন্দ্রনাথের জন্মোৎসব।

এই ভাবে হেতমপুরে প্রায় তিন মাসকাল অবস্থানের পর ১৩১৬ সালের ২৪শে পৌষ, ইং ১৯১০ সালের ৮ই জানুয়ারী দেবেন্দ্রনাথ কলিকাতা প্রত্যাবর্ত্তন করেন। এই মাসে তাঁহার জন্মতিথি উপলক্ষে ভক্তগণ উৎসব করিবার মানসে তাঁহাকে কলিকাতায় আনাইলেন। নলিনীকান্ত তাঁহাকে অর্চ্চনালয়ে লইয়া আসিয়াছিলেন।

ঊনত্রিংশ পরিচ্ছেদ

ঢাকা, বেঙ্গরাগ্রামে গমন।

(১৯১০)

হেতমপুর হইতে কলিকাতায় প্রত্যাবর্ত্তন করিয়া দিন কতক দেবেন্দ্রনাথ সুস্থ ছিলেন। পরে এক এক করিয়া আবার সকল অসুখই দেখা দিল। কবিরাজী চিকিৎসার জন্য শ্রীযুত মহানন্দ সেন কবিরাজ মহাশয়কে ডাকা হইল। তিনি তাঁহার কথা শ্রবণে প্রীত হইয়া পারিশ্রমিক না লইয়া চিকিৎসা করিতে লাগিলেন। প্রথম প্রথম কবিরাজী ঔষধ সেবনে বেশ ফল দেখা গেল, কিন্তু উপকার বেশী দিন স্থায়ী হইল না। এই অসুস্থ শরীর লইয়া দেবেন্দ্র-নাথ সমাগত ব্যক্তিগণের সহিত ভগবৎপ্রসঙ্গে দিন কাটাইতে লাগিলেন। এই সময় নূতন নূতন ভক্ত আসিয়া জুটিতে লাগিল। শ্রীযুত বেণীমাধব দত্ত ও নীরেন্দ্রপ্রসাদ ঘোষ প্রভৃতি আসিয়া দেবেন্দ্রনাথের আশ্রয় লাভ করেন। বৃদ্ধ বেণীমাধব বহুদিন যাবৎ যথা নিয়মে নিত্য গঙ্গাস্নান করিয়া সদ্‌গুরুলাভের জন্য গঙ্গার নিকট প্রার্থনা জানাইয়াছিলেন। বেণীমাধবের অটল বিশ্বাস, গুরুভক্তি ও কোমল হৃদয় দেবেন্দ্রনাথের উদাহরণ বিশেষ ছিল।

দশম উৎসব।

দেবেন্দ্রনাথ এইরূপে চৈত্রমাস পর্য্যন্ত স্থানীয় ভক্তগণের সহিত কাটাইলেন। পরে ১৩১৭ সালের ৪ঠা বৈশাখ শ্রীশ্রীঠাকুরের বাৎসরিক

মহোৎসব উপলক্ষে দূরদেশ হইতে ভক্তগণ অর্চ্চনালয়ে আসিতে লাগিলেন। ঢাকা হইতে সস্ত্রীক হরেন্দ্রকুমার আসিলেন। তাঁহার সহিত তদীয় আত্মীয় শ্রীযুত সুধেন্দুমোহন ঘোষ ও তাঁহার স্ত্রী এবং হরেন্দ্রকুমারের মধ্যমা ভগ্নী ও তাঁহার পতি শ্রীযুত বরদাকান্ত চৌধুরী আসিয়া দেবেন্দ্রনাথের আশ্রয় লাভ করেন। যথাপূর্ব্ব মহানন্দে সমারোহের সহিত মহোৎসব সম্পন্ন হইল। উৎসবের পর অনেকেই চলিয়া গেলেন; কেবলমাত্র সস্ত্রীক হরেন্দ্রকুমার রহিলেন। তাঁহার বড় ইচ্ছা, দেবেন্দ্রনাথকে একবার তাঁহাদের ঢাকা, বেঙ্গরা গ্রামের বাটীতে লইয়া গিয়া বাটী পবিত্র করেন। অনেক দিন পূর্ব্ব হইতে হরেন্দ্রকুমার দেবেন্দ্রনাথের নিকট আপন বাসনা জানাইয়া আসিতেছেন। দেবেন্দ্রনাথও যাইবেন বলিয়াছিলেন; কিন্তু নানা কারণে এত কাল সুযোগ ঘটিয়া উঠে নাই। এবারে তিনি স্বয়ংই একদিন হরেন্দ্রকুমারকে ডাকিয়া বলিলেন, "আমি তোমাদের বাটী যাইব, তুমি সমস্ত বন্দোবস্ত কর।" হরেন্দ্রকুমার যেন হাতে স্বর্গ পাইলেন। তাঁহার বহুদিনের আশা পূর্ণ হইতে চলিয়াছে দেখিয়া, তিনি দেশে তারে সংবাদ প্রেরণ করিলেন। তত্রত্য ভক্তগণ এই সংবাদ পাইয়া আনন্দিত হইলেন এবং নারায়ণগঞ্জ হইতে যানের বিশেষ বন্দোবস্ত করিয়া রাখিলেন।

বেঙ্গরাগ্রামে উপনীত।

শুভদিনে দেবেন্দ্রনাথ কৃষ্ণকুমারকে সঙ্গে লইয়া হরেন্দ্রকুমারের সহিত বৈশাখের শেষভাগে ঢাকা যাত্রা করিলেন। দ্বিপ্রহরে নারায়ণগঞ্জে পৌঁছিয়া দেখিলেন, অনেক লোক তাঁহার অভ্যর্থনার জন্য সমাগত। নারায়ণগঞ্জ হইতে গাড়ী ও নৌকাযোগে হরেন্দ্রকুমারের বাটী

যথাসময়ে উপনীত হইলেন। দেবেন্দ্রনাথের আগমনবার্ত্তা শুনিয়া নানা স্থান হইতে ভক্তগণ সর্ব্বকার্য্য পরিত্যাগপূর্ব্বক তথায় সমাগত হইতে লাগিলেন। তাঁহার উপদেশ-শ্রবণ অপেক্ষা তাঁহার দর্শন ও সঙ্গলাভই যেন তাঁহাদের অধিক প্রিয়তর বোধ হইতে লাগিল।

দূর-দূরান্তর হইতে জনসমাগম।

দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের অন্তরঙ্গ ভক্ত; তাঁহাকে দর্শন করিলে শ্রীশ্রীঠাকুরকেই দর্শন করা হইবে, ইহা মনে করিয়া দূর-দূরান্তর হইতে প্রাতঃকাল হইতে রাত্রি দ্বিপ্রহর পর্য্যন্ত জনসমাগম হইতে লাগিল। কোথাও সঙ্গীতধ্বনি, কোথাও ভোজনের পূর্ব্ব-কোলাহল, কোথাও বা ভক্তগণের আনন্দোচ্ছ্বাস—এই ভাবে হরেন্দ্রের সুপ্রশস্থ বাটীখানি প্রতিদিন মুখরিত থাকিত। প্রত্যেকের প্রণাম ও সম্ভাষণে ক্রমশঃ এমন অবস্থা হইয়া উঠিল যে, দেবেন্দ্রনাথ আর বিশ্রামের অবসর পান না।

এই সময় সস্ত্রীক শ্রীযুত জ্ঞানচন্দ্র বিশ্বাস, জ্ঞানচন্দ্র দত্ত ও হরেন্দ্র-কুমারের বড় ভগ্নীপতি শ্রীযুত অবিনাশচন্দ্র ঘোষ প্রমুখ কতিপয় ভক্ত দেবেন্দ্রনাথের আশ্রয় গ্রহণ করেন। হরেন্দ্রকুমারের জ্যেষ্ঠা ভগ্নী, কনিষ্ঠ ভ্রাতা হেমচন্দ্রের স্ত্রী এবং বহু রমণী দেবেন্দ্রনাথের শ্রীচরণে আত্মসমর্পণ করেন। হরেন্দ্রকুমারের পরিবারবর্গ সকলেই শ্রীশ্রীঠাকুরের পরম ভক্ত। তাঁহার পিতা শ্রীযুত কৈলাসচন্দ্র নাগ প্রায় এক বৎসর পূর্ব্বে অর্চ্চনালয়ে আসিয়া দেবেন্দ্রনাথকে দর্শন করেন। দেবেন্দ্রনাথের সঙ্গলাভ করিয়া কৈলাসচন্দ্রের জীবনের বিশেষ পরিবর্ত্তন ঘটে। শেষ জীবন ঈশ্বর চিন্তায় তিনি অতিবাহিত করেন। হরেন্দ্রের মাতা ভালবাসা ও সরলতার প্রতিমূর্ত্তি। দেবেন্দ্রনাথকে গৃহে পাইয়া তাঁহাদের

আনন্দের আর সীমা রহিল না। কলিকাতা আসিয়া এই বৃদ্ধা জননীর গুণকীর্ত্তন দেবেন্দ্রনাথের মুখে ধরিত না।

দেবেন্দ্রনাথের রূপ-জ্যোতির পূর্ণ বিকাশ।

এই সময় দেবেন্দ্রনাথের বেঞ্জরাগ্রামে আগমনের সংবাদ শুনিয়া প্রাণেশকুমার তথায় যাইয়া এই পূর্ণানন্দের মেলা দর্শন করেন। দেবেন্দ্রনাথের রূপজ্যোতিঃ এখানে পূর্ণ বিকাশ পাইয়াছিল; যেমন স্থবর্ণ-বর্ণ দেহকান্তিচ্ছটা, তেমন আনন্দে উৎফুল্ল মুখকমল, তদুপরি তাম্বুলরাগে রঞ্জিত ওষ্ঠলালিমার ভঙ্গিমা এবং তাহা হইতে অমিয়মাখা সহাস্য বাক্যলহরী দর্শকের নিকট এক অপূর্ব্ব শোভা ধারণ করিয়াছিল। কেহ বৃদ্ধদেহের রূপলাবণ্য নয়ন ভরিয়া দেখিতেছে, কেহ কর্ণ পূরিয়া রহস্যপূর্ণ বাক্যামৃত পান করিতেছে—এ দৃশ্য ভাষায় অবর্ণনীয়!

"ভালবাসাই ঈশ্বরের স্বরূপ।"

একদিন সায়াহ্নে হরেন্দ্রকুমারের বহির্বাটীর চত্বারে দেবেন্দ্রনাথ একখানা চেয়ারে উপবেশন করিয়া নস্য লইতেছেন, সম্মুখের বেঞ্চের উপর গ্রামবাসী দুই তিনটী ভদ্রলোক বসিয়া আছেন, চতুর্দ্দিকে অনেক লোক দণ্ডায়মান। তাঁহার আগমনে ঐ বাটীর সকলের প্রেমানন্দে মত্ততার বিষয় উল্লেখ করায়, দেবেন্দ্রনাথ বলিতে লাগিলেন,—"ভালবাসা reciprocal (পরস্পরসাপেক্ষ)। আমি ভালবাসিলে তুমিও না ভালবাসিয়া থাকিতে পার না। আর কি জান? যাঁহাকে ভালবাসি, তাঁহার বাড়ীর বিড়ালটাও ভালবাসি। বেছে গুছে ভালবাসা হয় না। ভালবাসায় mathematics (গণিত)

আছে; যাঁহাকে ভালবাসি, তাঁহার গুরু-ইষ্টকেও তাঁরই মত শ্রদ্ধা করি—তাঁহার স্নেহপাত্রও আমার স্নেহপাত্র—তাঁহার আপন জন আমারও আপন জন হয়। এই ভালবাসা Humanityর (মানবজাতির) উপর পড়িলে হিন্দু বল, মুসলমান বল, খৃষ্টিয়ান বল, সকল জাতির সকল ধর্ম্মের উপাস্যই নিজের উপাস্য হয়; বিদ্বেষভাব আর থাকিতে পারে না। সকলই আপনার হইয়া যায়। এই ভালবাসাই যদি বুকে না আসল, তবে ধর্ম্ম-কর্ম্ম কিসের? ভালবাসাই ঈশ্বরের স্বরূপ!" প্রেমবিগলিত স্বরে দেবেন্দ্রনাথ এই ভাবে ভালবাসার কথা বলিতে লাগিলেন; শ্রোতৃবর্গ হৃদয় ভরিয়া ঈশ্বরের স্বরূপ ভালবাসা একবার জীবনে আস্বাদন করিয়া লইলেন।

দেবেন্দ্রনাথ যে গৃহে রাত্রিতে শয়ন করিতেন, তাহার পার্শ্বের গৃহে হরেন্দ্র ও প্রাণেশকুমার শয়ন করিতেন। একদিন রাত্রি দ্বিপ্রহরের পর তাঁহার গৃহমধ্যে কি একটা শব্দ শুনিতে পাইয়া, তাঁহারা উভয়ে ঐ গৃহে প্রবেশ করিলেন। প্রবেশ করিয়া দেখেন, দেবেন্দ্রনাথ শুভ্র শয্যার উপর একা বসিয়া রহিয়াছেন, কৃষ্ণ-কুমার পাশের খাটের উপর নিদ্রাভিভূত। ঘর নিবিড় অন্ধকার। মশারির ভিতর দেবেন্দ্রনাথের দেহের আভায় তাঁহাকে ও তাঁহার শয্যাখানি বেশ সুস্পষ্ট দেখা যাইতেছিল। এই দেহদ্যুতি দর্শক-দ্বয়ের চক্ষে এখনও ভাসমান রহিয়াছে।

এই সময় হইতে ঈশ্বরীয় প্রসঙ্গ আরম্ভ হইলেই দেবেন্দ্রনাথের শরীর হইতে একটা বিশেষ আভা বিকাশ পাইতে দেখা যাইত। অন্য সময়ে হাঁপানি প্রভৃতি রোগের যন্ত্রণায় মলিন ও মুহ্যমান অবস্থায় থাকিতেন। শেষ জীবনে সহসা দেবেন্দ্রনাথের এই শারীরিক পরিবর্ত্তন দেখিয়া অনেকেই আশ্চর্য্যান্বিত হইতেন।

দেবেন্দ্রনাথের বিদায়-গ্রহণ।

দেবেন্দ্রনাথের শরীর একে সুস্থ নহে, তাহার উপর অত লোক-সমাগমের ফলে প্রায় প্রত্যহই একটা না একটা রোগের উপসর্গ দেখা দিত। সহসা অসুখ বৃদ্ধি হইলে হরেন্দ্র নিতান্ত বিব্রত হইবেন মনে করিয়া, দেবেন্দ্রনাথ তাঁহার বাটীতে অধিক দিন থাকা যুক্তিযুক্ত মনে করিলেন না।

কলিকাতায় ফিরিবার দিন স্থির হইল। কলিকাতা যাইবার দিন স্থির হইয়াছে শুনিয়া সকলেই ম্রিয়মাণ হইলেন। এমন আনন্দের হাট পরিত্যাগ করিয়া সংসারের কোলাহলে পুনরায় প্রবেশ করিতে কাহারও ইচ্ছা হইতেছে না। কিন্তু উপায় নাই, দেবেন্দ্রনাথ ত চিরদিন তাঁহাদের নিকট থাকিতে পারিবেন না, ইহা ভাবিয়া অনিচ্ছাসত্ত্বেও সকলেই আপন আপন মনকে সান্ত্বনা দিতে লাগিলেন। হরেন্দ্রের জ্যেষ্ঠা ভগিনী ভয়ানক ক্রন্দন জুড়িয়া দিলেন, তদ্দর্শনে অনেকেই প্রকাশ্যে ও গোপনে ক্রন্দন আরম্ভ করিলেন। কিন্তু আশ্চর্য্যের বিষয়, কোমলহৃদয় দেবেন্দ্রনাথ সুমিষ্ট ভাষায় সকলকে প্রবোধ দিতে লাগিলেন এবং অবিচলিতভাবে চলিয়া আসিবার জন্য দৃঢ়সঙ্কল্প হইলেন। একদিনও আর বিলম্ব করিলেন না; মাত্র দশ দিনকাল তথায় অবস্থান করিয়া প্রাতে কলিকাতাভিমুখে যাত্রা করিলেন।

দেবেন্দ্রনাথ যখন হরেন্দ্রকুমারের বাটী পাল্কী আরোহণে পরিত্যাগ করেন, তখন দলে দলে স্ত্রী-পুরুষ বাষ্পরুদ্ধকণ্ঠে চক্ষু মুছিতে মুছিতে তাঁহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ চলিতে লাগিলেন। তদ্দর্শনে দেবেন্দ্রনাথ পল্লীবাসী সকলকে বাটী ফিরিয়া যাইতে অনুরোধ করিলেন। নিষেধ-

বাক্য বিফল হইল—কেহই ঘরে ফিরিলেন না। ভদ্রঘরের লজ্জাশীলা কুলকামিনীগণ মুখাবরণ উন্মোচন করিয়া অশ্রুপূর্ণলোচনে তাঁহাকে দেখিতে দেখিতে অনেক দূর পর্য্যন্ত চলিতে লাগিলেন। 'আর দেবেন্দ্রনাথকে এ জীবনে দেখিতে পাইব কি না জানি না; যতক্ষণ দেখা যায় ততক্ষণ প্রাণ ভরিয়া দেখিয়া লই'—এই মনোভাব প্রবল হওয়াতে আপন মর্য্যাদা ভুলিয়া গিয়া তাঁহারা যে অনেক দূর সদর রাস্তায় আসিয়া পড়িয়াছেন, তাহা জানিতে পারিলেন না। বাটীর পুরুষদেরও ঐরূপ সমান অবস্থা।

পাল্কী দ্রুত চলিতে লাগিল। অনুগামিগণ পশ্চাতে রহিলেন। যতক্ষণ পাল্কী দেখা যাইতে লাগিল, ততক্ষণ স্ত্রী-পুরুষ কেহই ফিরিল না। পরে পাল্কী অদৃশ্য হইলে সকলে বিষণ্ণবদনে স্ব স্ব গৃহে ফিরিয়া আসিলেন। এখন তাঁহার স্মৃতি তাঁহাদের একমাত্র সম্বল হইল। দেবেন্দ্রনাথের নয়নানন্দদায়ক কমনীয় দেবদেহ, সুন্দর হাসি হাসি মুখের সরল অমায়িক মিষ্ট কথা, ভালবাসাপূর্ণ হৃদয়খানি ও তাঁহার বালকসুলভ ব্যবহার এখন সকলের অলৌকিক স্বপ্ন-স্মৃতির বিষয় মাত্রে পর্য্যবসিত হইল। ক্রমাগত কয়েক দিন পর্য্যন্ত দেবেন্দ্রনাথের বিষয় আলোচনা ব্যতীত তাঁহাদের অন্য কোন কর্ম্মেই রুচি ছিল না।

দেবেন্দ্রনাথ কলিকাতায় আসিয়া পূর্ব্ববঙ্গবাসীর ভক্তি, বিশ্বাস ও সরলতা দেখিয়া বলিয়াছিলেন, "নাগ মহাশয়ের আগমনে দেখিলাম, বাস্তবিকই পূর্ব্ববঙ্গ ধন্য হইয়াছে।"

ত্রিংশ পরিচ্ছেদ

মধুপুরে গমন।

ঢাকা হইতে জ্যৈষ্ঠ মাসে দেবেন্দ্রনাথ অৰ্চ্চনালয়ে ফিরিয়া আসিলেন। আষাঢ় মাসের রথযাত্রার দিবস খুলনা হইতে শ্রীযুত উপেন্দ্রনাথ রায় নামক একটী ব্রাহ্মণ যুবক দেবেন্দ্রনাথের নিকট আসিয়া তাঁহার আশ্রয় গ্রহণ করেন।

ঠাকুরবাড়ীর জন্য জমি ক্রয়ের চেষ্টা।

সম্মুখে বর্ষাকাল; বর্ষায় তাঁহার শরীর অসুস্থ হইয়া পড়ে, বিশেষতঃ অৰ্চ্চনালয়ের বাটীতে স্বভাবতঃই বর্ষাকালে অসুখ বৃদ্ধি পায়। এই অবস্থা দেখিয়া দেবেন্দ্রনাথের আশ্রিতা পূর্ব্বোক্ত কিরণ মা তাঁহার বাসের জন্য একখানা নূতন বাটী প্রস্তুত করিয়া দিতে চাহিলেন। দেবেন্দ্রনাথ শুধু নিজের সুখের জন্য অপর বাড়ী ভাড়া করিয়াও তথায় থাকিতে চাহিলে থাকিতে পারিতেন, কিন্তু ঠাকুরবাড়ী ছাড়িয়া অন্য বাড়ীতে থাকিতে আদৌ স্বীকৃত হইলেন না। তিনি বলিলেন, “যদি তোমরা ঠাকুরকে বাদ দিয়া শুধু আমার জন্যই বাড়ী করতে চাও, তবে সেই সঙ্গে আমাকেও বাদ দাও। ঠাকুরবাড়ী পরিত্যাগ করিয়া অন্য স্থানে বাস আমার দ্বারা হইবে না।” সুতরাং নিকটবর্ত্তী স্থানে ঠাকুরবাড়ী ও তৎসঙ্গে তাঁহার বাসের উপযোগী বাড়ীর অন্বেষণ চলিতে লাগিল। কিন্তু তদুপযোগী বাটী না পাওয়ায়, জমি ক্রয় করিয়া আবশ্যকমত ঘর নির্ম্মাণ করিয়া লইবার চেষ্টা হইতে লাগিল।

'আমার মন কি শেষে বাড়ীর উপর পড়িয়া থাকিবে?'

অবশেষে নিকটে একটী স্থান মনোনীত করিয়া ক্রয় করিবার জন্য বায়না দেওয়া হইল। কিরণ মার স্বামী এটর্ণী প্যারীচরণ হালদার চারি সহস্র মুদ্রা দিতে চাহিলেন। জমি ক্রয় করিবার বন্দোবস্ত সমস্ত ঠিক হইলে, কোন বিশেষ কারণে দেবেন্দ্রনাথ উক্ত জমি ক্রয় করিতে স্বীকৃত হইলেন না। পূর্ব্বে বায়নার যে টাকা দেওয়া হইয়াছিল, তাহা ফেরত লওয়া হইল। তিনি বলিলেন, "বাড়ী বাড়ী করিয়া আমার মন কি শেষে বাড়ীর উপর পড়িয়া থাকিবে? আমার বাড়ীতে প্রয়োজন নাই। ঠাকুরের যাহা ইচ্ছা, তাহাই হইবে। আমি ঠাকুরের কার্য্যে Devine hand (ঈশ্বরের হাত) দেখিতে পাইতেছি। ও স্থান লওয়া হইবে না।" বাটী প্রস্তুত হইবার সংবাদ শুনিয়া মীরাট ও কলিকাতার ভক্তগণ যে কয়েক শত টাকা দিয়াছিলেন, তাহাও তাঁহাদিগকে দেবেন্দ্রনাথের আদেশানুসারে ফেরৎ দেওয়া হয়।

তাঁহার সংকল্প শুনিয়া প্যারীবাবু আক্ষেপ করিয়া বলিয়াছিলেন, "আমি ভুল করিয়াছি। যদি জমির বায়না আমার নামে করিতাম, তাহা হইলে কেহ বায়না রদ করিতে পারিত না। পরে বাড়ী প্রস্তুত করিয়া তাঁহাকে দিলেই ভাল হইত।" বাটী হইল না দেখিয়া তিনি টাকা লইবার জন্য দেবেন্দ্রনাথকে অনুরোধ করিতে লাগিলেন, কিন্তু তিনি কিছুতেই টাকা গ্রহণ করিলেন না।

দেবেন্দ্রনাথ বলিয়াছিলেন, "এই (বর্ত্তমান অর্চ্চনালয়) বাটীতে কত ঠাকুরের নাম, কত মহাপুরুষের আগমন হইয়াছে, এ বাটী এখন তীর্থস্থান হইয়া গিয়াছে।" এই নিমিত্ত দেবেন্দ্রনাথ অন্য চেষ্টা ছাড়িয়া দিয়া এই বাটীতেই থাকিতে লাগিলেন।

হেম রায়ের বাটীতে উৎসব।

আষাঢ় মাসের শেষভাগে একদিন দেবেন্দ্রনাথ নিজেই ভবানীপুরে হেম রায়ের বাটীতে ভক্তগণের সমাগমের ইচ্ছা প্রকাশ করিলেন। পরবর্ত্তী রবিবার উৎসবের দিন স্থির হইল। প্রাতঃকালে অর্চ্চনালয় হইতে তিনি তথায় গমন করিলেন। সেখানে পুরুষ ও স্ত্রী ভক্তগণ প্রভাত হইতেই সমাগত হইতে আরম্ভ করিয়াছিলেন। ছোট বাড়ী* ভক্তে পরিপূর্ণ; তিনি ভক্তগণের সহিত নানারূপ কথাবার্ত্তা কহিতেছেন, সকলেই আনন্দে বিভোর; দ্বিপ্রহরে গান আরাত্রিক সহ ভোগরাগ হইল।

বৈকালে নূতন নূতন ভক্ত আসিতে লাগিলেন। বিক্রমপুর যোলঘর-নিবাসী শ্রীযুত রাজেন্দ্রকুমার চক্রবর্ত্তী, প্রাণেশকুমারের নিকট দেবেন্দ্রনাথের সংবাদ পাইয়া গ্রীষ্মাবকাশে দেবেন্দ্রনাথের দর্শনার্থ কলিকাতায় আসিয়াছিলেন। ঐ দিবস অর্চ্চনালয়ে যাইয়া তাঁহার দর্শন না পাইয়া হেম রায়ের বাটী যাইয়া উপস্থিত হন। দেবেন্দ্রনাথ নবাগত রাজেন্দ্রকুমারকে দেখিয়া বড়ই আহ্লাদিত হইলেন এবং অর্চ্চনালয়ে যাইয়া তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিতে বলিলেন। রাজেন্দ্রকুমার পরে অর্চ্চনালয়ে সস্ত্রীক গমন করিয়া শ্রীশ্রীঠাকুরের প্রসাদ গ্রহণ করেন এবং দেবেন্দ্রনাথকে গান করিয়া শুনান।

দেবেন্দ্রনাথ বিভিন্ন ভাবের ভক্ত একত্র সমাগত হইলেই মাঝে মাঝে তাঁহাদের পরস্পরের ভাব ব্যক্ত করিবার নিমিত্ত 'অমুকে এই বলে, তোমার মত কি?' এই বলিয়া তাঁহাদের মধ্যে তর্ক জুড়িয়া দিয়া তামাসা দেখিতেন। কখনও 'নিত্য আগে কি লীলা আগে,'

* ১৩নং জগদানন্দ মুখার্জ্জির লেন। এই বাটী এখন নূতন প্রস্তুত হইয়াছে এবং শ্রীশ্রীঠাকুরের নিত্য অর্চ্চনার স্থানে পরিণত হইয়াছে।

'সাকার সত্য, কি নিরাকার সত্য,' 'শ্রদ্ধা কাহাকে বলে'? ইত্যাদি নানারূপ প্রশ্ন নিজেই উত্থাপন করিয়া ভক্তগণের মধ্যে পরস্পর আলোচনা করিতে ও যুক্তিতর্ক সাহায্যে আপন আপন মত সমর্থন করিতে বলিতেন। তর্ক অনেক সময় তুমুল আকার ধারণ করিত। তিনি তখন মৃদু মৃদু হাসিতেন ও তাঁহাদের তর্কবিতর্ক শুনিতেন। মাঝে মাঝে পরাজিতপ্রায় পক্ষের যুক্তি যোগাইয়া দিয়া আবার বিচার জোর করিয়া দিতেন। অবশেষে দুই একটী সরল কথায় সমস্ত বিষয়ের সিদ্ধান্ত করিয়া সকলকে সন্তুষ্ট করিতেন!

হেম রায়ের বাটীতেও ঐ দিন বৈকালবেলায় রাজু মামা প্রভৃতি ভক্তগণ অনেকক্ষণ তর্ক-বিচার করিয়াছিলেন। রাত্রিতে অর্চ্চনালয়ে ফিরিয়া আসিয়া, দেবেন্দ্রনাথ ভক্তসম্মেলনীর ও তাঁহাদের আলোচিত বিষয় ও সিদ্ধান্তের পুনঃ পুনঃ উল্লেখ করিয়া বড়ই আনন্দ প্রকাশ করিয়াছিলেন। বলিয়াছিলেন, "তোমাদের আলোচনা শুনিয়া আমার অন্তরে যে আহ্লাদ হয়েছে, রাজ্যলাভ হইলেও এত সুখ হয় না।"

ইহার পর একদিন সন্ধ্যার প'র অর্চ্চনালয়ে ঠাকুরের আরাত্রিক সমাপনান্তে জনৈক ভক্ত কৃষ্ণবিষয়ক গান করিতে আরম্ভ করেন। এই গান শুনিতে শুনিতে দেবেন্দ্রনাথ ভাবস্থ হইয়া যান এবং হস্তদ্বয় উত্তোলন করিয়া "হা কৃষ্ণ, হা কৃষ্ণ" বলিতে থাকেন। এই ভাবে কিছুকাল অবস্থান করেন।

এইভাবে বর্ষাকাল কাটিয়া গেল, ক্রমে শারদীয়া পূজা আসিল। অসুস্থ শরীরে ভক্তগণসঙ্গে তাহা আনন্দে কাটাইয়া দিলেন। শারীরিক অবস্থা পূর্ব্ব হইতে ক্রমশঃই ক্ষীণ হইতে লাগিল, কোন খাদ্যদ্রব্যেই তাঁহার রুচি ছিল না। এই সময় একপ্রকার জোর করিয়াই তাঁহাকে

আহার করান হইত। বালককে যেমন বুঝাইয়া ভুলাইয়া আহার করাইতে হয়, তাঁহাকেও তেমনই করাইতে হইত।

মধুপুরে যাইবার প্রস্তাব।

পূর্ব্ব হইতে কবিরাজ মহানন্দ সেন দেবেন্দ্রনাথের চিকিৎসা করিতেছিলেন। তাঁহার ঔষধে প্রথম দুই এক দিন উপকার বোধ হইত, পরে আর হইত না। বিচক্ষণ কবিরাজ মহাশয় অতি যত্নের সহিত চিকিৎসা করিয়াও যখন ফলে কিছু দাঁড়াইতেছে না দেখিলেন, তখন তাঁহাকে স্থানপরিবর্ত্তন করিতে উপদেশ দিলেন। কবিরাজ মহাশয় নিকটবর্ত্তী স্থানের মধ্যে মধুপুর মনোনীত করিলেন।

অবিলম্বে চারুচন্দ্র মধুপুর গিয়া "নবীন কুটীর" নামক বাটী ভাড়া করিয়া আসিলেন। পরবর্ত্তী ১০ই অগ্রহায়ণ তারিখে চারুচন্দ্র ও কৃষ্ণকুমার দেবেন্দ্রনাথ ও তাঁহার ভ্রাতৃজায়াকে সঙ্গে লইয়া মধুপুর যাত্রা করিলেন। হেমচন্দ্র বসুর পুত্রকন্যাগণও তাঁহার সঙ্গে গিয়াছিলেন। মধুপুরের সকল বিষয়ের বন্দোবস্ত করিয়া দিয়া চারুচন্দ্র ও রমেন্দ্র কলিকাতায় ফিরিয়া আসিলেন। সেবাশুশ্রূষার জন্য কৃষ্ণকুমার প্রভৃতি রহিলেন। মধুপুরে লোকের বসতি অতি বিরল। পার্শ্বের বাটীতে হরিগোপালের শ্বশুর যাদব বাবু ছিলেন। এখানে কেবল তিনিই সকাল-সন্ধ্যা দেবেন্দ্রনাথকে দেখিয়া যাইতেন। ঐ সময় তাঁহার সহিত দেবেন্দ্রনাথের সামান্য কথাবার্ত্তা হইত। দেবেন্দ্রনাথের কথা শুনিয়া যাদব বাবুর মনের অনেক সন্দেহ তিরোহিত হইয়া যায় এবং ঠাকুরের উপর ভক্তি ও বিশ্বাস বদ্ধমূল হয়। তিনি বলিয়াছিলেন, "ঠাকুর বোধ হয় আমার সন্দেহ মিটাইবার জন্যই আপনাকে মধুপুর আনিয়াছেন।"

দেবেন্দ্রনাথের হঠাৎ অসুখ বৃদ্ধি।

একদিন হঠাৎ ঠাণ্ডা লাগিয়া দেবেন্দ্রনাথের অসুখ-বৃদ্ধি হয় এবং তারে এই সংবাদ পাইয়া নলিনীকান্ত, চারুচন্দ্র, বড় বাবু প্রভৃতি উদ্বিগ্ন-চিত্তে কলিকাতা হইতে মধুপুর রওনা হন। রাত্রি একটার সময় সকলে পৌঁছিয়া দেখিলেন, দেবেন্দ্রনাথ একটু ভাল আছেন এবং তাঁহাদের আগমন-প্রতীক্ষায় শয্যায় বসিয়া রহিয়াছেন। দেবেন্দ্রনাথের অসুখ তাঁহাদিগকে দেখিয়া যেন দূরীভূত হইয়া গেল এবং তিনি প্রফুল্লচিত্তে তাঁহাদিগের সহিত কথোপকথনে প্রবৃত্ত হইলেন। অসুখের সময় অনেক দিন রাত্রি জাগরণ করিয়া কৃষ্ণকুমার প্রভৃতি ভক্তগণ তাঁহার যথেষ্ট সেবা করিয়াছিলেন।

এই সময়ে হরিগোপাল তাঁহার স্ত্রী ও ভগ্নীসহ মধুপুরে আসিলেন। দেবেন্দ্রনাথ তাঁহাদিগকে পাইয়া আনন্দে উৎফুল্ল হইলেন।

ভক্ত-সমাগম।

ইহার পর শ্রীযুত হরিপদ শর্ম্মা নামক এক নূতন ভক্ত কাটরাজগড় হইতে দেবেন্দ্রনাথের নিকট আসিলেন। তাঁহাকে দেখিয়া দেবেন্দ্রনাথ বলিয়াছিলেন, "ইহার সবই প্রস্তুত, কেবলমাত্র একবার বলিয়া দেওয়া দরকার ছিল।" ইনি অনেকগুলি ঠাকুর ও স্বামীজির গ্রন্থ আনিয়া দেবেন্দ্রনাথের নিকট রাখিয়া বলিয়াছিলেন, "আজ হ'তে আমার গ্রন্থপাঠ শেষ হলো, ও সব পুস্তক আপনার কাছেই থাকুক।" ইহার পর তিনি অন্যত্র চলিয়া যান, পরে তাঁহার আর কোন সন্ধান পাওয়া যায় নাই।

কিছু দিন পরে মীরাট হইতে প্রতাপচন্দ্র, কলিকাতা হইতে রাজকুমার, শচীন্দ্রনাথ ও সুশীলচন্দ্র আসিলেন। দেবেন্দ্রনাথ প্রত্যহ

সন্ধ্যার পূর্ব্বে বাটীস্থ একটী কাঁটাল-বৃক্ষের নিম্নে বসিতেন এবং ভক্তগণসহ ভগবৎ-প্রসঙ্গে আলাপ ও পাঠাদি করিতেন। মধুপুরের বাটীটী যেন ঋষির আশ্রমে পরিণত হইল। তথায় গ্রামবাসী সাঁওতালগণ তাঁহাকে দর্শন করিতে প্রায়ই আসিত। তিনিও তাহাদিগকে মিষ্ট সম্ভাষণদ্বারা তুষ্ট করিতেন। তাহারা দেবেন্দ্রনাথের ভালবাসায় আকৃষ্ট হইয়া তাঁহাকে আপনাদের জন বলিয়া মনে করিত এবং তাহাদের গান ও নৃত্য দ্বারা তাঁহাকে তুষ্ট করিত। ক্রমে তিনি একটু সুস্থ হওয়ায় নলিনীকান্ত, কৃষ্ণকুমার, বড়বাবু, হেমবসুর পুত্রকন্যাগণ চলিয়া আসিলেন। এখন হরিগোপালের স্ত্রী ও ভগ্নী তাঁহার সেবার জন্য রহিলেন। কিছুদিন পরে বড় বাবু আবার একা মধুপুরে তাঁহার নিকট গমন করিলেন।

ইহার কয়েক দিন পরে দেবেন্দ্রনাথের ভ্রাতৃজায়ার পায়ে একটী কাঁটা ফুটিয়া সেই স্থানটী পাকিয়া উঠিল; অন্য দিকে দেবেন্দ্রনাথের সহসা ঠাণ্ডা লাগিয়া পুনরায় প্লুরিসী (pleurisy) হইবার উপক্রম হইল।

দেবেন্দ্রনাথ ও তাঁহার ভ্রাতৃজায়া উভয়ে বড় কষ্ট পাইতে লাগিলেন। বড় বাবু একাকী বড় বিব্রত হইয়া পড়িলেন। বাজার করা, ডাক্তার ডাকা, ঔষধ আনা সকলই তাঁহাকে একা করিতে হইত। কেহ কেহ দেবেন্দ্রনাথের ভ্রাতৃজায়ার পায়ে অস্ত্র করিতে হইবে বলিলেন। বিদেশে এরূপ অবস্থায় থাকা যুক্তিযুক্ত নয়, মনে করিয়া দেবেন্দ্রনাথ দুঃখ করিয়া বলিয়াছিলেন, "আমার ঘরভরা ছেলে মেয়ে থাকতে আমি বিদেশে কি শেষে লোকের অভাবে মারা যাব?" কথাগুলি বড় বাবুর প্রাণে এত লাগিয়াছিল যে, তৎক্ষণাৎ কলিকাতায় 'তার' পাঠাইলেন। ইটালী হইতে চারুচন্দ্র, রমেন্দ্র ও তাঁহার দিদি

মধুপুর রওনা হইলেন। ইঁহাদিগের পৌঁছিবার পূর্ব্বে হরিগোপালের ভগিনী প্রাণপণে তাঁহাদিগের সেবা করিয়াছিলেন। মধুপুরে পৌঁছিয়া সেবকদিগের মধ্যেও কেহ কেহ অসুস্থ হইয়া পড়িলেন। অগত্যা সকলেই সত্বর কলিকাতায় প্রত্যাবর্ত্তন করা সঙ্গত মনে করিলেন এবং দুই দিন পরেই গাড়ী রিজার্ভ করিয়া সকলে কলিকাতায় চলিয়া আসিলেন। এইরূপ নানা উদ্বেগের সহিত মধুপুরে দেবেন্দ্রনাথ প্রায় দুই মাসকাল কাটাইয়াছিলেন।

একত্রিংশ পরিচ্ছেদ

অর্চ্চনালয়ে অবস্থান।

(১৯১১)

অর্চ্চনালয়ে আসিয়া দেবেন্দ্রনাথের ভ্রাতৃজায়ার পা বিনা অস্ত্রে ভাল হইয়া গেল। নিজে কখন একটু ভাল থাকিতেন, কখনও অসুখের যন্ত্রণায় কষ্ট পাইতেন। এই ভাবে দেবেন্দ্রনাথের জীবনের অবশিষ্ট দিন অর্চ্চনালয়ে অবস্থান করিয়া কাটিতে লাগিল। শরীর সুস্থ রাখিবার জন্য অনেক প্রকার চেষ্টা হইতে লাগিল। হোমিওপ্যাথিক ডাক্তার বারিদবরণ বাবু দেখিলেন। কবিরাজ মহানন্দ সেন মহাশয় পূর্ব্ব হইতেই দেখিতেছিলেন। পরে একজন ইউনিপ্যাথিক ডাক্তারও দেখিলেন। ডাক্তার বি, সি, ঘোষও কিছু দিন দেখিলেন। প্রত্যেকের ঔষধেই প্রথম প্রথম দুই এক দিন একটু রোগের উপশম বোধ হয়, কিন্তু ফল স্থায়ী হয় না। অবশেষে, পূর্ব্বোক্ত জমিদার সুরেন্দ্র বাবুর হস্তে চিকিৎসার ভার ন্যস্ত হইল। দেবেন্দ্রনাথ সুরেন্দ্র বাবুকে বড় ভালবাসিতেন, সুরেন্দ্র বাবুও তাঁহাকে নিরতিশয় শ্রদ্ধা-ভক্তি করিতেন। ঔষধের গুণেই হউক, বা ভালবাসার গুণেই হউক, সুরেন্দ্র বাবুর ঔষধেই দেবেন্দ্রনাথ ভাল থাকিতেন।

এই সময় শ্রীযুত কুঞ্জবিহারী বসু, প্রমথনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় এবং ভূপেন্দ্রনাথ রায় দেবেন্দ্রনাথের আশ্রয়লাভ করেন।

দেবেন্দ্রনাথের প্রথম দর্শনের দিনই ভক্তগণ মনে করিতেন, যেন তিনি কত কালের আলাপী—জন্মজন্মান্তরের আপনার লোক; মাঝে যেন নিরুদ্দেশ হইয়া গিয়াছিলেন, আবার মিলন ঘটিল! তাঁহার

নিকট যতক্ষণ বসিয়া থাকা যাইত, ততক্ষণ বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের সমস্ত ব্যাপারই ভুল হইয়া যাইত—মনে কোন ভোগবাসনাই জাগিত না।

এইভাবে অভিভূত জনৈক ভক্ত একদিবস বাহিরে বসিয়া আপন মনে স্থির সিদ্ধান্ত করিলেন যে, তাঁহার আর কোনরূপ বাসনা-কামনা নাই। কিছুক্ষণ পরে নিকটে আসিলে, দেবেন্দ্রনাথ তাহাকে লক্ষ্য করিয়া বলিতে লাগিলেন, "এখানে অনেকেই মনে করেন, তিনি কামনা-শূন্য হইয়াছেন। কিন্তু দূরে গেলেই বোঝা যায়, কেমন গাঁটে গাঁটে কামনাগুলি ভোগের অবকাশ খুঁজছে। বাসনা কি অমনি যায়? তাঁকে লাভ করলে তবে বাসনা নির্ম্মূল হয়।" ভক্তটী লজ্জায় অধোবদন হইলেন। দেবেন্দ্রনাথ ভক্তগণের মনের ভাব বা তাঁহাদের গোপনে কৃত অকার্য্যাদি অনেক ব্যাপারের উল্লেখ করিয়া প্রায়ই তাঁহাদিগকে এইরূপে শিক্ষা দিতেন।

স্তোত্র রচনা।

এই সময়ে কিছু দিন দেবেন্দ্রনাথ শঙ্করাচার্য্যের গ্রন্থাবলী হইতে স্তোত্রাদি কৃষ্ণকুমারের দ্বারা পাঠ করাইয়া শুনিতেন। অসুস্থ শরীর লইয়াই দেবেন্দ্রনাথ এই সময়ে—

"ভবসাগর-তারণ কারণ হে,
রবি-নন্দন-বন্ধন খণ্ডন হে।
শরণাগত কিঙ্কর ভীত মনে,
গুরুদেব দয়া কর দীন জনে॥* ইত্যাদি

বিখ্যাত শ্রীগুরুস্তবাষ্টকটী রচনা করেন। ইহা অল্পদিনমধ্যেই মুখে মুখে সর্ব্বত্র প্রচারিত হইয়া যায়। স্তবটী কৃষ্ণকুমারের মধুর কণ্ঠে

---

* দেবগীতির ১ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য।

আবৃত্তি হইতে শুনিয়া স্বামী প্রেমানন্দ (বাবুরাম মহারাজ) অত্যন্ত প্রীত হইয়াছিলেন। স্বামী ব্রহ্মানন্দ (রাখাল মহারাজ) বলিয়াছিলেন, "দেবেন বাবু যে উচ্চ অবস্থায় অবস্থান করিয়া এই স্তোত্রটী লিখিয়াছেন, তাহা অনেকেরই দুর্ল্লভ।" স্বামী তুরিয়ানন্দ (হরি মহারাজ) অতি গম্ভীরভাবে উক্ত স্তোত্রটীর মধ্যস্থিত "মহিমা তব গোচর শুদ্ধ মনে," এই পদটী বার বার উচ্চারণ করিয়া আনন্দে বিভোর হইতেন। বর্ত্তমান সময়ে এই স্তোত্রটী ভারতের নানা সম্প্রদায়ের দেবালয়মধ্যে ও বহু বিদ্যালয়ে প্রত্যহ পঠিত হইয়া থাকে। অর্চ্চনালয়ে সন্ধ্যারাত্রিকের পর সমবেত ভক্তগণ কর্ত্তৃক ইহা নিত্য গীত হইয়া থাকে।

ইহার কিছু দিন পর দেবেন্দ্রনাথ—

"মহাযোগযোগে মহাদেব রাজে।
শশিখণ্ড ভালে কিবা শুভ্র সাজে॥"* ইত্যাদি

শ্রীমহাদেবাষ্টক রচনা করেন।

স্বামী ব্রহ্মানন্দ প্রভৃতির আগমন।

চৈত্র মাসের শেষ ভাগে এক দিবস নিজ হইতেই পূজ্যপাদ স্বামী ব্রহ্মানন্দ মহারাজ স্বামী তুরিয়ানন্দ, প্রেমানন্দ ও হরিহরানন্দ সমভিব্যাহারে দেবেন্দ্রনাথকে দেখিতে অর্চ্চনালয়ে আগমন করেন। দেবেন্দ্রনাথ তাঁহাদিগকে পাইয়া আনন্দে বিহ্বল হইয়া পড়েন এবং তাঁহাদের প্রীত্যর্থে নানারূপ খাদ্য প্রস্তুত করাইয়া তাঁহাদিগকে ভোজন করান। মহারাজগণ দেবেন্দ্রনাথের সহিত মধুর আলাপনে সমস্ত দিন অর্চ্চনালয়ে অতিবাহিত করেন। সন্ধ্যার পূর্ব্বে সুরেন বাবু তাঁহাদের একখানি ফটো তুলিয়াছিলেন।

---

* দেবগীতি ৬৫ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য।

দেবেন্দ্রনাথ স্বামী হরিহরানন্দ

স্বামী ব্রহ্মানন্দ

স্বামী তুরীয়ানন্দ স্বামী প্রেমানন্দ

ইঁহাদের সম্মিলন এক অপূর্ব্ব মনোহর দৃশ্য! নিজেদের অন্তরে যে আনন্দ তরঙ্গায়িত হইতেছিল, তাহা তাঁহারা কোনরূপে ব্যক্ত করিতে পারিতেছিলেন না। পরস্পর পরস্পরকে প্রণাম ও আলিঙ্গন, শ্রদ্ধা প্রদর্শন ও সাদর সম্ভাষণ করিয়া কিছুতেই যেন আশা মিটিতেছিল না।

স্বামী ব্রহ্মানন্দজীকে দেবেন্দ্রনাথ শ্রীশ্রীঠাকুরের তুল্য জ্ঞান করিতেন। তিনি বলিতেন, "ঠাকুর আমাকে দেখাইয়া দিয়াছেন, তিনি ও রাখাল মহারাজ এক।" ঠাকুরের সহিত প্রথম-মিলন-দিবসেই বাবুরাম মহারাজের সহিত দেবেন্দ্রনাথের পরিচয় হয়। উভয়েই সমগুণান্বিত কোমলপ্রাণ ছিলেন। এই নিমিত্ত উভয়ের মিলন ও প্রেম-প্রীতিব্যবহার সর্ব্বদাই মধুর-ভাবে দৃষ্ট হইত। সৌম্যমূর্ত্তি হরি মহারাজকে তিনি ঋষিজ্ঞানে সম্মান প্রদর্শন করিতেন। মঠের সন্ন্যাসী গুরুভ্রাতৃগণকে দেবেন্দ্রনাথ জ্যেষ্ঠ সহোদর জ্ঞান করিতেন। তাঁহার নিকট কেহ সন্ন্যাস প্রার্থনা করিলে, তিনি তাঁহাকে বলিয়াছিলেন,—"ঠাকুর আমায় সন্ন্যাস দেন নাই। যদি সন্ন্যাস লইবার বাসনা হইয়া থাকে, তবে মঠে যাও। সেখানে আমার বড় ভাইয়েরা আছেন—তাঁহারা ত্যাগীর শিরোমণি, তাঁহাদের নিকট যাও।"

ভক্তগণের নিকট প্রেমভাণ্ডার উন্মুক্ত।

দেবেন্দ্রনাথ জীবনের শেষ কয়েক মাস ভক্তগণের নিকট তাঁহার প্রেম-ভাণ্ডার একেবারে উন্মুক্ত করিয়া দিয়াছিলেন। তাঁহাদিগকে সর্ব্বদাই অভয় দিতেন এবং নানা প্রকারে উৎসাহিত করিতেন, আর বলিতেন, "দেখ্, তোরা ঠাকুরের ঘরের লোক, তোদের ভাবনা কিসের? তা না হলে এই ত এত বড় কলিকাতা সহর, আর সব লোক তো ঠাকুরের কথা শুন্‌তে আসে না, তোরাই বা আসিস্

কেন ? তোদের সঙ্গে আমার একটা বিশেষ সম্বন্ধ আছে কি না, তাই তোদের এখানে আস্‌তে হয়েছে।”

“ঠাকুরের ঘরের উল্টো চাবী।”

সাধন-ভজন সম্বন্ধে জনৈক ভক্ত একদিন জিজ্ঞাসা করিলে দেবেন্দ্রনাথ বলিয়াছিলেন, “দেখ্‌, ঠাকুরের ঘরের উল্টো চাবী। এই কর্‌লে তাঁকে পাওয়া যায়, আর এই করলে তাঁকে পাওয়া যায় না, এমন কোন বাঁধাবাঁধি নিয়ম নাই। শুধু সাধন-ভজন কর্‌লেই কি তাঁকে পাওয়া যায় রে ? তিনি কি শাক মাছ যে, দাম দিয়ে কিনবি ? তপস্যার বলে তাঁকে পাইতে যাওয়া ঠিক কামারের ঘরে স্থঁচ বিক্রী কর্‌তে যাওয়ার মত। তিনি ইচ্ছাময়, নিজের ইচ্ছা হলেই তিনি ধরা দেন। তবে তাঁর কৃপা লাভের জন্য একটু কিছু করতে হয়,—ভাবের ঘরে চুরি না করে, খেতে, শুতে, উঠ্‌তে, বস্‌তে তাঁর স্মরণ-মনন কর্‌তে হয়,—তাঁর নামে প'ড়ে থাক্‌তে হয়, তাতে যদি তাঁর দয়া হয়। তাঁর দয়া হইলে কর্ম্ম-পাশ খণ্ডন হয়। কুষ্ঠির ফল আর তখন মিলে না।”

“ভগবান-লাভ ত হয়েই আছে।”

আর একদিন একটী ভক্ত “মশাই, ভগবান্‌কে কি সত্য সত্যই দর্শন করা যায় ?” ইত্যাদি জিজ্ঞাসা করিলে, উত্তরে দেবেন্দ্রনাথ বলেন, “তাঁকে দেখ্‌তে চাইলেই দেখা যায়। তিনি যে খুব আপনার লোক—তিনি ত তোমাদের সঙ্গে সঙ্গেই রয়েছেন, নিয়তই সকলের অন্তরে বিরাজমান! কিন্তু তোমরা তাঁর দিক হইতে মুখ ফিরিয়ে রয়েছ, তাই দেখ্‌তে পাও না। আন্তরিকভাবে ডাক্‌লেই তিনি দেখা দিবেন। তাঁকে খুব আপনার জন জ্ঞানে কাতর হয়ে ডাক দিকি, কেমন তাঁর দেখা না পাও ?”

আবার একদিন আপনা হইতেই বলিতে লাগিলেন, "ভগবান্-লাভ, ভগবান্-লাভ করিস্, ভগবান্-লাভ ত হয়েই আছে রে! তবে কি জানিস্, জিনিষটে উপলব্ধি করতে হবে।

"মা ত প্রচুর পরিমাণে উপাদেয় খাদ্য হাঁড়িভোরে শিকেয় তুলে রেখেছেন। এখন তোরা খেলায় এত মেতে আছিস্ যে, দিলেও খাবি না। তোদের বেশ একটু ক্ষিদে পাক্, হাঁড়ির নীচে এসে, হাঁড়ি ধরবার জন্য যখন একটু লাফাবি ঝাঁপাবি, তখন মা এসে হাঁড়িটী নামাইয়া তোদের ইচ্ছামত পেট ভরে খাওয়াবেন।

'এত দুঃখ-কষ্ট হয় কেন ?'

"তোদের এত দুঃখ-কষ্ট হয় কেন ? বলবি, লোকে এক গুণ খেটে দশ গুণ পায়, আর তোরা দশ গুণ খেটে এক গুণও পাস্ না; তা হলে কি করে তাঁকে দয়াময় বলা যায় ? এর মানে কি জানিস্ ? তোরা যে স্রোতের উল্টো দিকে যাচ্ছিস্। জগৎ-সংসারটা সব কামিনীকাঞ্চনের একটানা স্রোতে ভেসে চলেছে, তোরা তার উল্টা স্রোতে চলেছিস্। কাজেই তোদের কষ্ট হবে না ? বহু জন্মের পুঞ্জীকৃত কর্ম্মফল এই জন্মে হিসেব নিকেশ করে যেতে হবে। কাজেই তোদের দুর্গতি হবে না ত হবে কার ? আর সকলে গোঁজামিল দিয়ে Compromise (আপোষ) করে ওতেই থাকে, দুঃখ কষ্ট তত বোঝে না।

'হতাশ হবার কিছুই নাই।'

"Struggling is the beauty of life (সংগ্রামেই জীবনের মাধুর্য্য)। Struggle (জীবনের সংগ্রাম) শেষ হলে ত জীবনের সৌন্দর্য্যই চলে গেল। Struggle (সংগ্রাম) করতে করতে একবার

এগুবে, একবার পিছোবে—এই করেই ক্রমে উন্নতি হবে। জগতের কোন গতিই সোজা নয়; তরঙ্গ গতিতে সব চলে—মন নেমে গেলে হতাশ হবার কিছুই নাই, আবার উঠ্‌তেই হবে। হতাশের চাইতে অনিষ্টকারী আর কিছু নাই। সমুদ্রে বালিকণার ন্যায় এ জগতের শোক, দুঃখ প্রভৃতি সকল ভাবই কিছু না কিছু দিয়ে মনকে দৃঢ় করে দেয়। হতাশ কিছুই দেয় না, অধিকন্তু মনের বল হরণ করিয়া লইয়া যায়।"

দেবেন্দ্রনাথ দীক্ষাদানের পক্ষপাতী ছিলেন না।

দেবেন্দ্রনাথ দীক্ষাদানের বড় পক্ষপাতী ছিলেন না। তিনি বলিতেন, "ওরে, যদি ওঁ ক্লীং ইত্যাদি কানে না শুনিলে তাঁকে পাওয়া না যায়, এমন একটা বদ্ধমূল সংস্কার থাকে, তা হলে ওটা (মন্ত্রটা) নেওয়াই ভাল। ভগবান্ কি সাপ যে তাঁকে মন্ত্র পড়ে বশ করবি? দীক্ষা মানে একটি শক্তিদান; তা সে কানে কানেও দেওয়া যায়, চোখে চোখেও দেওয়া যায়, মনে মনেও দেওয়া যায়, স্পর্শ করেও দেওয়া যায়, আবার চিঠিতে চিঠিতেও দেওয়া যায়। সেই শক্তির বলে তাঁর প্রতি আন্তরিক ভালবাসা আসলেই তাঁকে লাভ করা যায়। আর যদি ভগবানকে প্রাণভরে ভালবেসে—সরলভাবে ডেকেও না পাওয়া যায়, তবে তেমন ভগবানের দরকার কি?"

যোগযাগের পক্ষপাতী ছিলেন না।

দেবেন্দ্রনাথ যোগযাগের পক্ষপাতী ছিলেন না। তিনি বলিতেন, "যতক্ষণ যোগের অবস্থায় থাকা যায় ততক্ষণ আনন্দ বোধ হয় বটে, কিন্তু পরে যে কে সেই মানুষ। ভক্তিভাবে তাঁর সহিত একটা সম্বন্ধ স্থাপন ক'রে থাকতে পারলেই ভরপূর হয়ে থাকা যায়;—এটা

কি কম বড় সাধনা বা তপস্যা যে, উঠ্‌তে, বস্‌তে, খেতে, শুতে—সমস্ত কাজের ভিতর তাঁর স্মরণ মনন করা?" এই বলিয়া গিরিশ বাবুর শেষ জীবনের কথা উল্লেখ করিতেন।

ধ্যানের দ্বারা মনের একাগ্রতা বর্দ্ধিত হয়।

ধ্যানের সম্বন্ধে দেবেন্দ্রনাথ বলিতেন, "যেমন প্রিয়জনের সমীপে অবস্থান করিতে ও তাহাকে সর্ব্বদা দর্শন করিতে ভাল লাগে, তেমনি নিজ ইষ্টের নিকট অবস্থান ও তাঁহাকে দর্শন করিতে চেষ্টা করাই ধ্যান। এই ধ্যানের দ্বারা মনের একাগ্রতা বর্দ্ধিত হয়। মনের একাগ্রতা ভিন্ন কোন মহৎ কার্য্যই সংসাধিত হয় না।"

কর্ম্মে মনোনিবেশ মন আয়ত্তের সুলভ উপায়।

মনের এই একাগ্রতা সম্বন্ধে তিনি জনৈক ভক্তকে লিখিয়াছিলেন, "তোমাদের কতবার বলিয়াছি, স্মরণ থাকিতে পারে যে, যখন যে কোন কার্য্য করিবে, তাহাতেই মনোনিবেশ করিতে চেষ্টা করিবে। মনকে আয়ত্ত করিতে হইলে ইহাই সুলভ উপায়। মন আয়ত্ত না হইলে সাধন-ভজন কিছুই হয় না।"

কাজ-কর্ম্মের ঔদাস্যে দেবেন্দ্রনাথ অসন্তুষ্ট।

দেবেন্দ্রনাথ ভক্তগণকে সর্ব্বদা সত্যনিষ্ঠ হইয়া কর্ত্তব্য পালন করিতে বলিতেন। তাঁহাদের কাজকর্ম্মে ঔদাস্য দেখিলে তিনি অতিশয় অসন্তুষ্ট হইতেন। একটী যুবককে লিখিয়াছিলেন, "* * বিশেষতঃ চাকুরি করিয়া যাহাকে জীবন যাপন করিতে হইবে, তাহার তাহাতে ঔদাস্য করায় পাপের সঞ্চার হয়। আমাদের গ্রাসাচ্ছাদন শ্রমায়ত্ত। পরিশ্রম না করিলে অন্নকষ্ট অনিবার্য্য। ইহা জ্ঞানে চাকুরিতে কখনই

অযত্ন বা ঔদাস্য করিবে না। কার্য্যের ফল কখনও বিফল হয় না; সময়ে উন্নতি লাভ করিতে পারিবে। * *।"

'চৈতন্য আসিলে কিছুতেই ভুল হয় না।'

আর একস্থানে বলিয়াছেন, "যে যে কাজ করে, তাহা যদি সম্পূর্ণ মন দিয়া সম্পাদিত হয়, তাহা হইলে তাহা হইতেই তাহার অন্তরের চেতনা জাগিয়া উঠে। চৈতন্য আসিলে কিছুতেই ভুল হয় না। সূঁচটী পর্য্যন্ত কোথায় পড়িয়া আছে, তাহাও মনে ভাসিতে থাকে। তমোগুণের আধিক্যেই ভুল ঘটে। চৈতন্যযুক্ত ব্যক্তির দ্বারা জগতের সর্ব্বদাই কল্যাণ সাধিত হইয়া থাকে। কারণ, তাঁহাদের অন্তরমুখী দৃষ্টিতে যাবতীয় ইষ্টানিষ্ট-ঘটনাই প্রতিভাত হয়, অনিষ্ট হইতে যাহাতে লোকে রক্ষা পায়, তদ্বিষয়ে উঁহাদের চেষ্টা স্বতঃই নিয়োজিত হইয়া থাকে।" এ বিষয়ে দেবেন্দ্রনাথ স্বামীজির কথা উল্লেখ করিয়া বলিতেন, "একদিন স্বামীজি আমাকে বলিয়াছিলেন, 'বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের সুদূর প্রান্তে কোথায় ভাল মন্দ কি হচ্ছে, সবই যেন মনে ভাসছে'।"

দেবেন্দ্রনাথ-লিখিত এইরূপ নানা উপদেশপূর্ণ সংগৃহীত পত্রাবলী হইতে কতিপয় পত্র বা পত্রাংশ পরবর্ত্তী পরিচ্ছেদে প্রদত্ত হইল।

দ্বাত্রিংশ পরিচ্ছেদ

পত্রাবলী।

(১)

শ্রীশ্রীগুরু পদভরসা

তারিখ
২১শে বৈশাখ,
১৩১৫ সাল।

স্নেহাস্পদ !

তোমার পত্র-প্রাপ্তে পরমানন্দ লাভ করিলাম। তুমি আমাকে কেন ভোল নাই, জানি না; কিন্তু ভুলিবার কথা। তোমার ন্যায় মহা প্রশস্ত হৃদয়ে এ প্রেম-দৈন্যের ক্ষুদ্র ভালবাসা স্থান পাইবে, ইহা ধারণা করিতে পারি না। যাহা হউক, বৎস, আমি আজীবন ভালবাসিতে চাই, ভালবাসায় কাহাকেও বাঁধিতে চাই না। বাঁধিতে গেলে বাঁধিবার ফিকিরে থাকিব, ভালবাসিব কখন্?

তুমি লিখিয়াছ, 'আমার ভালবাসায় বাঁধা পড়িয়াছ।' বৎস, আমি তোমার হাড়-মাসের খাঁচাকে ভালবাসি নাই, যাহাতে দাতা গ্রহীতা উভয়েই বস্তুতঃ বাঁধা পড়ে, আর চিরজীবন দুঃখ পায়। আমি যাহাকে ভালবাসিয়াছি, ভালবাসাতেই তার সত্তা ও সুখ; সুন্দরকে ভালবাসিলে অভাব হইতে পারে, সৌন্দর্য্যকে ভালবাসিলে অভাব নাই।

ভালবাসিতে কুণ্ঠিত হইও না,—আধারকে নয়, আধেয়কে। ভালবাসায় ডুবিয়া যাও; শুধু মানুষ কেন, স্থাবর, জঙ্গম, কীট, পতঙ্গ কেহ যেন তোমার ভালবাসায় বঞ্চিত না থাকে। এরূপ প্রেম-চর্চ্চায় জীবনকে নিয়োগ কর। এমন স্পর্শমণি আর পাইবে না, যাহাতে ছোঁয়াইবে, তাহাই সোনা হইবে।

ভয় করিও না, ভালবাসায় বদ্ধ হয় না—জীবন্মুক্ত হইয়া যায়। তবে সতর্ক হইতে হয়—মুক্তা ফেলিয়া কৌটায় মজিয়া না পড়ি! কেবল সুন্দরকে ভালবাসিলে চলিবে না। নব-বিকশিত-পল্লব শোভিত নিকুঞ্জে ভৃঙ্গের গুঞ্জন ও ঘোর তমসাবৃত নৈশাকাশে নিবিড়-মেঘ-নিঃসৃত হৃদয়-বিকম্পিতকারী বজ্র-নির্ঘোষ—এ উভয়েই প্রেমের গুল্ম স্ফুরণ হইলেই, তবে ভালবাসায় পূর্ণতা আসিবে।

আর্য্যঋষিদিগের ভাব-সিন্ধু-মথিত মহাকালীর প্রতিমূর্ত্তির দিকে একবার চাহিয়া দেখ, দেখিতে পাইবে, মার দুই হস্তে বরাভয়—দুই হস্তে অসি মুণ্ড! কিন্তু "মা"। ইতর ভাষায় বলে শুধু, "সিন্নি খাইলে চলিবে না, কোঁত্‌কাও খাইতে হইবে।" তবে পূর্ণ মানব হয়।

ভালবাসিতে যাইয়া দুঃখের ভয় করিও না। দুঃখই ভালবাসার সুখ। সুখের জন্যে যে ভালবাসে, সে ভালবাসা জানে না। আদর্শের অভাব নাই, অভ্যাসে অসম্ভব কিছুই নহে। হতাশ হইব কেন?

তুমি মহাভারত পড়িতেছ, ইহা খুব ভালই হইয়াছে। তাহাতে নানারূপ চরিত্রের সমাবেশ আছে, পড়িয়া আমাকে বলিও, বেদান্ত-প্রণেতা ব্যাস অদ্বৈত-বাদী হইয়া মহাভারত প্রণয়ন করিয়া, কিরূপে তাহার সামঞ্জস্য রক্ষা করিয়াছেন।

* * * মীরাটে গিয়াছে, আমার বড় ইচ্ছা, তোমরা উভয়ে লিপিসূত্রে আবদ্ধ হইয়া আলাপ কর।

এখানকার ভক্তেরা সকলেই ভাল আছে। * * * কেবল একটী ভক্ত বসন্ত রোগে কলেবর ত্যাগ করিয়াছেন। যদি স্মরণ থাকে, বুঝিতে পারিবে, বৃদ্ধ "লাহিড়ী" মহাশয়। তাঁহার মৃত্যু আশ্চর্য্যজনক, জানিতে ইচ্ছা হয় তো লিখিও, পত্রান্তরে লিখিব।

ও দেশে যাইবার ইচ্ছা খুব আছে, কিন্তু ঘটিয়া উঠিতেছে না কেন, জানি না। দেখা যাউক কি হয়!

তোমার দাদা ও শশী বাবু মধ্যে মধ্যে আসেন, সকলে ভাল আছেন। ইতি—

দাস—

শ্রীদেবেন—

(২)

১৪ই শ্রাবণ, ১৩১৪ সাল।

* * * * *

তোমার উপাসনা ভাল লাগে না, সে তো ভাল কথা। উপাসনার প্রয়োজন, যাবৎ আনন্দ না হয়। ফল হইলে ফুল আপনিই ঝ'রে পড়ে। পরমহংসদেব বলিতেন—যে পর্য্যন্ত সুবাতাস না পাওয়া যায়, সে পর্য্যন্ত দাঁড় বাইতে হয়; সুবাতাস হইলে দাঁড় ছেড়ে দিয়ে পাল তুলে গান গায় আর তামাক খায়। অনেকের উপাসনা করা একটা রোগ, ও যেন করতেই হবে। বারোয়ারী-পাণ্ডার ঝাড় খাটাতে, আলো জ্বালাতে, বিছানা করতে, গোল থামাতেই সময় গেল;

যাত্রা শোনা আর হোল না! লোককে জিজ্ঞাসা করে, "হাঁগা, কেমন গাইলে, কি পালা গাইলে?"

(৩)

Ramkrishna Mission.
20, Pudda Pukur Lane. Calcutta.
১৪-৯-১৯০৭

প্রিয়——

তোমার এবারের প্রথম পত্রে আলোচিত বিষয়গুলি সম্বন্ধে আমার ধারণা আমি তোমাকে এ পর্য্যন্ত লিখি নাই বলিয়া, তোমার মুখখানা একটু ভার ভার হইয়াছে দেখিতেছি। অগত্যা সর্ব্বকর্ম্ম ফেলিয়া তোমার ১১ই ভাদ্র তারিখের পত্রের উত্তর লিখিতে বসিতে হইতেছে।

প্রথম কথা—নৈরাশ্যের নিবিড় অন্ধকার, আশার ক্ষীণ আলোক রেখা, পরক্ষণেই আবার ঘনান্ধতমসা, "তুমি যে তিমিরে সেই তিমিরে!" এমনটা কেন হয়? যদি অন্ধকারের গূঢ়তম প্রদেশে আলোকরেখা আসিয়া পড়ে, তবে সে রশ্মিতে অন্ধকার একবারে দূরীভূত হয় না কেন? সেই রশ্মির রজত রেখা ক্ষণপ্রভার ন্যায় অপসৃত হইয়া যায় কেন? আবার সূচীভেদ্য অন্ধকারের রাজত্ব কেন? এ সকলের একমাত্র উত্তর,—মানুষ মায়া পরিবৃত, চৈতন্য শুধু মায়া পরিবৃত নহে; মায়া তাহার হাড়ে হাড়ে, অস্থি মজ্জায়, আশে পাশে, চারিদিকে!

এই মায়া-কুজ্ঝটিকারূপ আবরণের ভিতরেই তাহার খেলাধূলা। এই মায়ার স্বধর্ম্ম মানুষকে বহির্মুখ করিয়া তোলা। যখন অন্তর্নিহিত

চৈতন্যের বা শক্তির গুণে মানুষ অন্তর্মুখী হইয়া আপনার স্বরূপ খোঁজে, তখন এই মায়া জালের ভিতর দিয়া তাহার আত্মদৃষ্টি হয়, পরমার্থ জ্ঞানের ক্ষীণ রেখা তাহার অন্তর্নেত্রের সম্মুখ দিয়া চলিয়া যায়। পরক্ষণেই আবার মায়া মোহ, আবার ঘোর অন্ধকার! সাধকের এই প্রথম অবস্থা। ইহাতে নিরাশ হইবার বা হাল ছাড়িয়া দিবার কোন কথা নাই।

তোমাকে ত অনেক বার বলিয়াছি ঃ—"হরিসে লাগি রহ ত ভাই, তেরা বনত, বনত বনি যাই।" তুমি কেবল তাঁহাকে ডাকিয়া যাও, তাঁহাকে সর্ব্বদা ভাবিতে চেষ্টা কর, সব ঠিক্ হইয়া যাইবে। নৈরাশ্যের ছায়াকে কাছে আসিতে দিও না।

তোমার দ্বিতীয় কথা সংশয় ও বিস্ময় লইয়া। সংশয়ে দুঃখ, কিন্তু সংশয় ভঞ্জন মহাসুখের কারণ।

জগতে সন্দেহের প্রয়োজনীয়তাও খুব বেশী। সন্দেহ না থাকিলে লোকে অনুসন্ধিৎসু হইত না। বৈজ্ঞানিক তত্ত্বই বল, দার্শনিক তত্ত্বই বল, আর আধ্যাত্মিক তত্ত্বই বল, সমস্তই গুহায় নিহিত থাকিত। কেহ টানিয়া বাহির করিত না, জগতের সুখ পনের আনা কমিয়া যাইত। সংশয়ের উদ্রেক হইলেই তাহা সরল প্রাণে মিটাইবার চেষ্টা করিবে। মিথ্যা সন্দেহকে পুরিয়া রাখিয়া বা তাহার উপর কতকগুলা আবর্জ্জনা চাপা দিয়া আপনাকে ভুলাইয়া রাখিও না।

যদি নিজে সংশয় না মিটাইতে পার, যাঁহারা তোমার সন্দেহের বস্তু লইয়া অনেক দিন নাড়া চাড়া করিয়া মীমাংসায় উপনীত হইয়াছেন, সাদা প্রাণে, ব্যাকুল হইয়া তাঁহাদের স্মরণ লও, তাঁহাদের কথায় নির্ভর কর, বিশ্বাস করিতে শিখ। এই তোমার গুরুকরণ।

তোমার তৃতীয় প্রস্তাবে, "আনন্দ, প্রেম ও সৌন্দর্য্য এই তিনের অবতারণা। তুমি লিখেছ, "এক আসিয়া খেলা আরম্ভ করিলে অপর দুইটী আসিয়া মিলিত হয়।" কথাটা ঠিক নহে। তিনেরই একসঙ্গে দৃষ্টি, একসঙ্গে পরিপুষ্টি। তিনেরই সত্ত্বা তোমার মনে, বাহিরে আর কোথাও নহে। বহির্জগতের দুই একটী কারণ তোমার অন্তরের প্রস্রবণ খুলিয়া দেয় মাত্র। তুমি যাহা সুন্দর দেখ তাহা হয়ত অপরের কাছে কুৎসিত; তুমি যাহার চরণে প্রেম ঢালিয়া দাও অপরের কাছে তাহা হেয়। সেই জন্য বলি বাহিরের সৌন্দর্য্য লইয়া থাকিও না। বহির্জগতের সৌন্দর্য্য তোমার সৌন্দর্য্যানুভূতির উদ্দীপক হউক। সচরাচর লোকের হইয়াও থাকে, তাহাতে ক্ষতি নাই, কিন্তু সে সৌন্দর্য্যে আবদ্ধ থাকিও না। ক্রমে দেখিবে সবই সুন্দর; সবই তাঁহার সৃষ্টি; সবই যে তিনি। ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ বলিয়াছেন :—

যত্র যত্র মনো যাতি তত্র তত্র পরং পদম্।
তত্র তত্র পরং ব্রহ্ম সর্ব্বত্র সমবস্থিতম্॥

আনন্দের পরাকাষ্ঠা ভগবৎ জ্ঞান জানিও। প্রহ্লাদ বলিয়াছেন :—

'কেবলানুভবানন্দস্বরূপঃ পরমেশ্বরঃ।'

তুমি কেমন আছ, কবে এখানে আসিবে লিখিও।

দাস—

শ্রীদেবেন্দ্র—

(৪)

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ শ্রীচরণ ভরসা

আষাঢ় ১৩১৪

—, ২৫-৭-১৯০৭

তোমার পত্র পাইয়া পরমানন্দ লাভ করিলাম।* * নবাগত জনৈক পণ্ডিত দর্শন শাস্ত্রে Doctor উপাধিধারী উচ্চপদস্থ লোকের উপদেশ-শ্রবণে যাহা যাহা লিখিয়াছ জ্ঞাত হইলাম। তাঁহার ন্যায় পণ্ডিতের মতসম্বন্ধে আমার মত মূর্খের মতামত চাওয়া, কেবল আমার প্রতি তোমাদের ভালবাসার পরিচয় ব্যক্ত হইয়াছে মাত্র। "অদ্বৈত জ্ঞান হইলে ভক্তি থাকিবে না বলিয়া অদ্বৈত জ্ঞান হইতে পারে না।" এ বড় ভয়ানক মীমাংসা। বক্তা কি ভাবে এ কথা বলেন—জানিনা। অবশ্য ভক্ত সোঽহং-ভাব ভালবাসিতে না পারেন, তা' বলিয়া মহান্ সত্য লোপ হইবে কি করিয়া? অনন্তে অনন্ত ভাবের সামঞ্জস্য রহিয়াছে, তাহার মধ্যে কোন একটী ভাব তোমার ভাল লাগিল, বেশ কথা, তুমি তাহা লইয়া সম্ভোগ কর, কিন্তু তোমার এ কথা বলিবার কি right (অধিকার) আছে, যে অন্য ভাবগুলি কিছুই নহে। ভেদজ্ঞান আত্মার নাই, তাহা মনের ধর্ম্ম। মন জড়, স্বপ্রকাশ নহে। মন স্বয়ং কোন বিষয় উপলব্ধি করিতে পারে না। আত্মা স্বপ্রকাশ, সুতরাং জ্ঞানস্বরূপ, আত্মার আলোক পাইয়া মন ভেদাভেদ সুখদুঃখ অনুভব করিয়া থাকে।

যখন আমরা আত্মায় পৌঁছিব, তখন মনের ব্যাপার থাকিবে না। ভেদাভেদ, সুখদুঃখ সকলি চলিয়া যাইবে, আর তখনই আমরা নিত্যানন্দ লাভ করিতে সমর্থ হইব—তখনই সত্যস্বরূপ, জ্ঞানস্বরূপ, আনন্দস্বরূপ হইয়া যাইব।

প্রশ্ন হইল—ভাল কথা, সেই আত্মস্বরূপ লাভের উপায় কি? তাহার পরেই উপায় নির্ণীত হইল, "জ্ঞান, ভক্তি ও যোগ দ্বারায় ইহার লাভ হইতে পারে।" জ্ঞানে সদ্ অসৎ বিচার, ত্যাগ, ইন্দ্রিয়সংযম প্রভৃতি আবশ্যক। জ্ঞানী তদনুষ্ঠানে প্রবৃত্ত হইলেন; শেষে দেখিলেন, আমি—দেহ নহি, মন নহি—দেশ-কালের অতীত।

ভক্ত দেখিলেন, অত হাঙ্গামা কে করে? আমি—রূপ ও নাম ভিন্ন কোন বস্তুর সত্তাই বুঝিতে পারি না, আমার ভিতরে যত feelings (ভাব) আছে, তাহার মধ্যে ভালবাসা আমার বড় ভাল লাগে; আমি ভালবাসিয়াই তাহা লাভ করিব। কিন্তু ভাল কাহাকে বাসি? —রূপ চাই, নাম চাই; সে তাহার মত একটী ideal (আদর্শ) রূপের সৃষ্টি করিয়া, তাঁহাকে ভালবাসিতে লাগিল। সে তন্ময় হইয়া গেল, তখন তাঁহার সুখ-দুঃখ, ভেদাভেদ জ্ঞান প্রভৃতিও চলিয়া গেল।

যোগী স্থূল ও সূক্ষ্ম দেহ বিশ্লেষণ করিয়া আত্মাকে খুঁজিতে লাগিলেন। আত্মাকে পাইয়া তাঁহার ভেদাভেদ সুখ-দুঃখ তিরোহিত হইয়া গেল। চরমে সকলেই কৃতার্থ হইলেন। মতামতে দোষারোপ করা সাধনার খুব নিম্নাবস্থাতেই হইয়া থাকে। কেন্দ্র হইতে যত দূরে থাকিবে পরস্পরে তত পৃথক বোধ হইবে; কেন্দ্রের যত নিকটে যাইবে ততই একত্ব বোধ হইবে।

তবে এক কথা এই, "অহং ব্রহ্ম" এ কথায় অনেকে ভয় পাইয়া থাকেন যে, তাহা হইলে পাপকর্ম্মানুষ্ঠানে অনুষ্ঠানকারী ত দায়িত্বের হাত এড়াইলেন। ইহা সম্পূর্ণ ভুল, যেহেতু ব্রহ্মত্ব লাভ না করিয়া যে উহা মুখে মাত্র বলিবে, সে দায়িত্ব হইতে কিছুতেই নিষ্কৃতি পাইবে না। ভণ্ডের ভয়ে সত্যকে পরিগ্রহ না করা অতিশয় নীচাশয়ের পরিচয়।

দ্বৈতবাদী বলেন, "আমি ভালবাসিয়া ঈশ্বরকে লাভ করিব"। কিন্তু জিজ্ঞাস্য এই যে, ভালবাসিতে বাসিতে যে বস্তুকে ভালবাসি তাঁহার সারূপ্য আমাতে আইসে কি না? তাহাতে আমাতে একত্ব হয় কি না? তাহা যদি হয়, তবে "অহং ব্রহ্ম" এ কথায় অত শিহরিয়া উঠিবার হেতু কি? পরমহংসদেব বলিতেন, "সমাধি হ'লে রূপটুপ উড়ে যায়, তখন আর ঈশ্বরকে ব্যক্তি (Personal God) বলে বোধ হয় না, কি তিনি—মুখে বলা যায় না। কে বলবে? যিনি বলিবেন তিনিই নাই! তিনি আমি আর খুঁজে পাব না। তখন ব্রহ্ম, নির্গুণ (The Absolute), তখন তিনি কেবল-বোধে বোধ হন। মনবুদ্ধিদ্বারা তাঁ'কে ধরা যায় না।"

আর এক কথা, প্রেমের উজ্জ্বলতর আদর্শ বৃন্দাবনের গোপাঙ্গনাগণ; যখন তাঁহারা কৃষ্ণবিরহে অতিশয় ব্যথিতা হইলেন, তখন কৃষ্ণচিন্তায় এতদূর অভিভূত ও তন্ময় হইলেন যে, তাঁহারা "এই যে কৃষ্ণ" বলিয়া প্রত্যেকে আপনাকে অনুভব করিতে লাগিলেন।

আর একটী উদাহরণ:—রামচন্দ্র হনুমানকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন, "হনুমান! তুমি আমাকে কি ভাবে উপাসনা কর?"

হনুমান বলিলেন, "প্রভু! যখন আমি দেহাত্ম-বুদ্ধিতে উপাসনা করি, তখন আমি দেখি—তুমি প্রভু, আমি দাস। যখন আমি জীবাত্ম-বুদ্ধিতে উপাসনা করি, তখন আমি দেখি—তুমি পূর্ণ, আমি অংশ। যখন আমি আত্মজ্ঞানে উপাসনা করি, তখন দেখি—তুমিই আমি, আমিই তুমি।"

সর্ষপাকার একটী ক্ষুদ্র বটবীজের মধ্যে ক্রোশব্যাপী অসংখ্য শাখাপ্রশাখা ও পল্লবাদিযুক্ত বটবৃক্ষ রহিয়াছে—একথা সহসা লোকের প্রত্যয় হয় না। কিন্তু যখনই ঐ বীজ বৃক্ষরূপে পরিণত হয়, তখন

অপ্রত্যয়ের কারণ থাকে না। মানুষ সর্ব্বশক্তিমান্, তাহাতে যে অনন্ত শক্তি রহিয়াছে, এ কথা সে প্রথমে কখনই বিশ্বাস করিতে পারে না; মানুষ দেখে, আমি সসীম এবং দুর্ব্বল। বাস্তবিকই সে দেখে, তাহার বুদ্ধি, চিন্তা, জ্ঞান, সমস্তই সীমাবদ্ধ। তাহাকে সহস্রবার বলিলেও সে যে অনন্ত, সর্ব্বশক্তিমান্, সর্ব্বজ্ঞ—এ কথা তাহার ধারণাই হইবে না।

আমার মনে হয়, তাই ব্রহ্মজ্ঞ ঋষিরা দ্বৈতবাদের অবতারণা করিয়াছেন। তাঁহারা ঈশ্বর নাম দিয়া প্রাগুক্ত attribute (গুণ) গুলি দিয়া মানুষের নিকট একটী আদর্শ সৃষ্টি করিয়া দিয়াছেন। মানুষ ঐ মেঘপটলারূঢ় আদর্শ পুরুষে ঐ সকল attribute (গুণ) স্বীকার করিয়া লইতে কুণ্ঠিত হইল না। তাহার সমস্ত সুখ-দুঃখের বার্ত্তা ঐ আদর্শ পুরুষকে জানাইয়া, তাঁহাকে উপাসনা করিতে ও প্রেম-ভক্তি দিতে শিক্ষা করিতে লাগিল। লাভ হইল এই,—আদর্শে যতই তাহার চিত্ত ঘনীভূত হইতে লাগিল, ততই তাহার অন্তরে পূর্ব্বাশ্রিত ঐ সমস্ত attribute (গুণ) গুলির বিকাশ আরম্ভ হইল। শেষে সে এমন এক অবস্থায় উপনীত হয় যে, তাহার আদর্শ-পুরুষ ও তাহাতে সে কোন পার্থক্য দেখে না।

অদ্বৈতবাদী বলেন, "ব্রহ্ম সত্য, জগৎ মিথ্যা।" কিন্তু, এ কথা উপলব্ধি করিতে হইলে "নেতি, নেতি" করিয়া জগৎ ছাড়িয়া এমন এক স্থানে তিনি উপনীত হন যে, তখন তিনি বুঝিতে পারেন—একেরই বহু; তখন তিনি বহুকে একই দেখেন।

পরমহংসদেব বলিতেন, "অনুলোম" আর "বিলোম"। তিনি বলিতেন, "সাগর যখন স্থির তখন তাহাকে ব্রহ্ম বলি, আর যখন তরঙ্গ-সমাকুল, তখন তাহাকে ঈশ্বর বা শক্তি বলিয়া জানি। একই বস্তু, সগুণ আর নির্গুণ।"

কিন্তু, যখন রজ্জুতে সর্পভ্রম হয়, তখন তাহা রজ্জু বলিয়া কখনই প্রতীতি হয় না। আবার রজ্জুবোধ হইলে, সর্পভ্রম থাকিতে পারে না। যখন আমাদের জগদ্‌বোধ রহিয়াছে, তখন পরব্রহ্মের ধারণা কি প্রকারে হইতে পারে? যত ক্ষণ তুমি-আমি-বোধ আছে, ততক্ষণ "অহং ব্রহ্ম" বলা শোভা পায় না। বরঞ্চ, "নাহং নাহং, তুঁহু তুঁহু" এই এক কথায় অভীষ্টলাভের সদুপায় আছে বলিয়া আমার ধারণা।

—র আমার সম্বন্ধে যে ধারণা, তাহা তোমার লইবার আবশ্যক নাই। তাহাকে তাহার ভাবে থাকিতে দাও, তুমি তোমার ভাবে অবস্থিতি কর, ইহাতে সুফল হইবে। কাহারও ভাব নষ্ট করা অতীব গর্হিত কার্য্য বলিয়া জানিবে। কিন্তু, আধুনিক ব্রাহ্মদিগের এই রোগটী বড় প্রবল আছে। তাঁহারা বলেন, "লোকের ভুল সংশোধন করিয়া দেওয়া কর্ত্তব্য।" এ কথা সত্য বটে, কিন্তু তিনি যাহা করেন বা জানেন, অপরে তাহা না করিলে তিনি মনে করেন ভুল। বাস্তবিক এইটীই মহা ভুল। যে যাহা করে, তাহার তাহাতে একটী প্রত্যয় বা বিশ্বাস আছে, যাহা তুমি দিতে পারিবে না, অথচ নষ্ট করিতে পারিবে।

উদাহরণস্বরূপ বলিতেছি; এক ব্যক্তির ধারণা, 'বিল্ববৃক্ষ পূজা করিলে আমার সদ্গতি লাভ হইবে।' তুমি তাহাকে বলিলে, "এ কি করিতেছ? এ ত কুসংস্কার! গাছ পূজা করিলে কখন কি উচ্চগতি লাভ হয়?" সে বেচারা মহা ফাঁপরে পড়িল। সে তোমার নিরাকার উপাসনা কিছুই বুঝিতে পারিল না। এ স্থলে তাহার যে একটু সদ্ভাব অনুষ্ঠিত হইতেছিল, তুমি তাহাকে তাহা হইতে বঞ্চিত করিলে। তাহাকে ঈশ্বর উদ্দেশে গাছ পূজা করিতে দাও। কোন না,

কোন সময়ে ভগবান্ তাহার ভ্রম সংশোধন করিয়া দিবেন। তিনি ভুল না বুঝাইলে মানুষে ভুল সংশোধন করিতে পারে না। তাহা যদি হইত, তাহা হইলে সমস্ত জেলখানা আজ শূন্য দেখিতাম। ইহাই আমার ধারণা। মানুষ আদর্শ ব্যতীত উন্নত হইতে পারে না। এই কারণে, আমাদের প্রাচীন ঋষিরা গুরুকরণপ্রথা প্রবর্ত্তিত করিয়াছেন, এবং গুরুকে ঈশ্বর বলিয়া ধারণা করিতে শিক্ষা দিয়াছেন। যেহেতু গুরুকে মানুষ বলিয়া ধারণা থাকিলে তাহার উন্নতি কি হইবে? এই নিমিত্ত আদর্শ অবশ্য খুব উচ্চভাবের হওয়া চাই। তাই বলি, কাহারও ভাবে হস্তক্ষেপ করা উচিত নয়। কোন মহাত্মা বলিয়াছেন, "যেমন ভাব, তেমন লাভ, মূল সে প্রত্যয়।"

তুমি মহাভারত পড়িয়া অদ্বৈত ও দ্বৈতের সামঞ্জস্যের বিষয় যাহা লিখিয়াছ, তাহা পাঠে অতীব সন্তুষ্ট হইলাম। যাবৎ দ্বৈত-জ্ঞান আছে, তাবৎ তাহাকে কোথায় ফেলিয়া দিব? মহাভারতে ঐ উভয়বিধ মতেরই সমর্থন রহিয়াছে।

লাহিড়ী মহাশয়ের মৃত্যুসম্বন্ধে ঘটনা এই,—মৃত্যুর তিন দিবস পূর্ব্বে সন্ধ্যার সময় এক গাছি বেল-ফুলের মালা এবং কিছু খাবার আনিয়া আমার গলায় মালাটী পরাইয়া, ঐ খাবারগুলি খাইতে তিনি আগ্রহের সহিত অনুরোধ করেন। আমি তাঁহার অভিমতানুযায়ী খাইয়া বলিলাম, "লাহিড়ী মহাশয়, আজ এ কি ভাব?"

প্রত্যুত্তরে বলিলেন, "অন্যান্য সকলে আপনাকে কত সেবা করে, আমি সেরূপ কিছুই পারি না।" তৎপরে বাটী গিয়া একটী বৃহৎ কলিকায় তাওয়া দিয়া তামাক সাজিয়া আনিয়া খাইতে অনুরোধ করিলেন। তাহাও খাওয়া হইল, এ কথাগুলি লেখার তাৎপর্য্য এই

যে, তাঁহার স্বভাবে এ গুলি আশ্চর্য্য বলিয়া লইতে হয়। পরে দুই দিবস মিশনে আসেন নাই।

আমি তাঁহার তত্ত্ব লইতে কোন এক ব্যক্তিকে বলিলাম, এবং তাহার কিছুক্ষণ পরে, তাঁহাকে যে ডাক্তার দেখিতে ছিলেন, তাঁহার বাচনিক শুনিলাম যে, লাহিড়ী মহাশয়ের ১০৬ ডিগ্রি জ্বর হইয়া অচৈতন্য আছেন। দেখিতে গেলাম। গিয়া দেখিলাম—জীবনের আশা অত্যল্প। বসন্ত হইয়া লাট খাইয়া গিয়াছে, আমি বুঝিলাম—মুমূর্ষু কাল উপস্থিত। তৎকালোচিৎ ব্যবস্থা করিয়া দিয়া আমি বাটী আসিলাম। তাহার পরেই তাঁহাকে গৃহ হইতে বাহিরে আনা হইল। সেই সময় সেই দিবস মেঘাচ্ছন্ন হইয়া একটু বাতাস হয়। ঐ বাতাসে কোথা হইতে একটী ফুল তাঁহার বক্ষঃস্থলে যেমন পড়িল, অমনি প্রাণবায়ু বহির্গত হইল।

* * * তাহাকে তুমি মধ্যে মধ্যে পত্র লিখিও। আমার শরীর ভাল নাই। অম্লের পীড়ায় সময়ে সময়ে বড় কষ্ট পাই।

তোমাদের ওপ্রদেশে যাইবার ইচ্ছা এখনও আছে, ঘটিবে কিনা জানি না। এখানকার ভক্তেরা সকলেই ভাল আছেন। * * * *

'দাস' লিখিয়াছি কেন, জিজ্ঞাসা করিয়াছ। ঈশ্বরকে ছাড়িয়া অন্য পরিচয় দিতে ইচ্ছা হয় না। তিনি প্রভু, আমি দাস। আমার প্রভুই নররূপে বিহার করিতেছেন। আমি ভৃত্য, সুতরাং ভৃত্যের পরিচয় দাস ব্যতীত আর কি হইবে? পত্রোত্তরে সন্তুষ্ট করিবে।

দাস—

শ্রীদেবেন্দ্র—

ত্রয়স্ত্রিংশ পরিচ্ছেদ

পত্রাবলী (সম্পূর্ণ)।

(৫)

প্রিয়—

* * * আমরা ভগবানকে পাইব কি? তিনি আমাদের পাইয়া বসিয়াছেন। এ রহস্য একবার চিন্তা করিয়া দেখিবে। ঈশ্বরলাভ যদি না হইয়া থাকে, জীব বাঁচিয়া আছে কিরূপে? তবে যেমন হরিণ নিজ অঙ্গে মৃগনাভি সত্ত্বেও গন্ধ পাইয়া ছুটাছুটি করে, অজ্ঞান-বশতঃ জীবও ইতস্ততঃ সেইরূপ অন্বেষণ করিয়া থাকে। * * তবে সম্ভোগ হওয়ার পক্ষে যে বাধা, তাহার অভাব হইলেই সম্ভোগ হইবে। বাধা "কৃতকর্ম্ম"। প্রারব্ধক্ষয় না হইলে তাহা হয় না। তুমি যদি ঈশ্বরসম্ভোগে বিহ্বল হইয়া থাক, তবে কর্ম্ম করিবে কে?

তোমরা আমার হৃদয় অধিকার করিয়াছ, ভুলিব কি করিয়া? সে আশঙ্কা করিও না। তুমি কোন বিষয়ে ক্ষুণ্ণ বা ক্ষুব্ধ হইবে না। আমার কোন শক্তি না থাকিলেও আমাকে যিনি আশ্রয় দিয়াছেন, তাঁহার শক্তির স্পর্দ্ধা খুব রাখি। তাঁহার কৃপা যদি কিছুমাত্র লাভ করিয়া থাকি, তবে তাহা তোমাদের উপর সম্পূর্ণরূপে বিতরিত হইয়াছে ও হইবে। আমার নিজের ভক্তি মুক্তি বা পরিত্রাণার্থ তাহার এক কণাও আমি রাখিব না, ইহা নিশ্চয় জানিবে। আমি শত শত জন্ম লইলেও, সে নিমিত্ত ক্ষোভ করিব না, ইহা বিলক্ষণ জানিবে। প্রভুর কৃপায় বুঝিয়াছি, স্বার্থত্যাগই মনুষ্যজীবনের একমাত্র উদ্দেশ্য। আমি নরকে গেলে যদি একজন মাত্রও পরিত্রাণ পায়, এই মুহূর্ত্তে আমি প্রস্তুত আছি। জীবন থাকিবে না, তাহার

মমতা করিয়া কি করিব? এই নশ্বর জীবনে যদি অন্যের কোন কার্য্য হয়, তাহা ত মঙ্গল। আমি দেখিতে চাই, তুমি ভগবৎ-প্রসঙ্গে—ভগবদানন্দে জীবন যাপন করিতেছ। গত জীবন স্মরণ করিও না, তাহার আন্দোলনে চিত্ত অপ্রফুল্ল হইবে। নূতন জীবন লাভ করিয়াছ, ঈশ্বরানন্দ উপভোগ কর।

"ভাবিলে ভাবের উদয় হয়।
যেমন ভাব, তেমন লাভ,
মূল সে প্রত্যয়।"—

প্রভু এই গান সর্ব্বদা গাইতেন।

"আনন্দে আনন্দময়ীরে হৃদয়ে কর স্থাপনা।
জ্ঞানাগ্নি জ্বালিয়া কেন ব্রহ্মময়ীর রূপ দেখ না॥"

রামপ্রসাদ গাইয়াছেন।

প্রভুর পাদপদ্ম স্মরণ করিয়া, পরিশেষে আশীর্ব্বাদ করিতেছি: পরমানন্দ লাভ হউক। আর কি লিখিব? * * * *

---

(৬)

৺মহাসপ্তমী—
ইটালী, রামকৃষ্ণ মিশন।

* * * অমানুষীক ত্যাগে অমানুষীক লাভ। সাম্রাজ্য পরিত্যাগে দ্বারের ভিখারী হওয়া বেশী কথা নহে। স্বর্গললনা-সৌন্দর্য্য-সমন্বিতা অশেষগুণান্বিতা পত্নীপরিবর্জ্জনে সংসারে নগণ্য হওয়া বড় বেশী কথা নহে। যেই মহাত্মা আপন self (আত্মাভিমানকে) sacrifice (বলি) করিতে সক্ষম হবেন, তিনিই অমানুষিক লাভের প্রকৃত অধিকারী! জগতে অনেকেই অনেক বিষয়ে sacrifice

(ত্যাগ) করিতেছেন দেখিতে পাওয়া যায় সত্য ; কিন্তু "আমার" বলিতে তাঁহার যে কিছু থাকে না, এরূপ sacrifice (ত্যাগ) অতি বিরল। সকলেই জ্ঞান, ভক্তি, মুক্তি, প্রেম এই সকল পরম বস্তু লাভের জন্য লালায়িত। কিন্তু ভাবিয়া দেখিলে বুঝা যায়, কবি ৺সুরেন্দ্রনাথ যে বলিয়াছেন !—"নিয়া সুখ তত নয়, দিয়া বাসি যত।" তাই বলি—self (আত্মাভিমান) কে বিলাইয়া দাও। কাঙ্গাল বৃত্তির অবসান হউক। Self (আত্মাভিমান) থাকিতে ভিক্ষাবৃত্তির নিবৃত্তি দেখি না। "ইহা" পাইলাম তো "উহা" চাইলাম। ক্রমান্বয়ে কারবার ফলন্ত হইয়া দাঁড়াইবে। সুখ-দুঃখ, ভাল-মন্দ, পাপ-পুণ্য ধর্ম্মাধর্ম্ম ইহার আশ্রয় একমাত্র self (আত্মাভিমান)। Self (অভিমান) থাকিতে ইহারা পর্য্যায়ক্রমে আক্রমণ করিবেই করিবে। তাই বলি—সকল জঞ্জালের মূল "আমি," "আমার" পরিত্যাগ করিয়া বিশ্বব্যাপক সত্তায় অবস্থিত হও। তুমি এ সমস্ত ছেঁদো কথা বলিয়া উড়াইয়া দিও না।

Knock and it shall be opened unto you (দরজায় ঘা দেও, খুলিয়া যাইবে)। তোমাতে অনন্ত শক্তি নিহিত রহিয়াছে, ইহা ভুলিয়া আপনাকে মূঢ়জ্ঞানে নিশ্চেষ্ট করিয়াছ। ফেলিয়া দাও—এ ভ্রান্তি ! অন্তর্নিহিত শক্তি বিকাশে যত্নশীল হও। The essence of your heart (হৃদয়ের সার বস্তু) ভালবাসা মুক্তহস্তে জগতে বিতরণ করিয়া প্রারব্ধ ক্ষয় করিতে থাক। তোষামোদ করিয়া বা ছেঁদো কথা লিখিয়া তোমার মন ভুলাইবার নিমিত্ত লিখিলাম—ইহা বিবেচনা করিও না। তোমার নিকট আমার কোন প্রত্যাশা নাই —ইহা বোধ হয় তুমি বিলক্ষণ জান। * * * *

---

(৭)

R. K. Mission Entally.
1st Febry, 1905.

* * * ঠাকুরের "খান দান চাষার" উদাহরণটী স্মরণ আছে ত? সয়তানের একটি প্রচ্ছন্ন নাম—'নিরাশা'! তাহার সেবা করিয়া জীব সন্তাপ বই আর কিছুই লাভ করিতে পারে না। ইহাকে পরম শত্রু জ্ঞান করিবে। রামকে পাইলাম না বলিয়া যে, ভূতকে ভজিতে হইবে, সুধা পাইলাম না বলিয়া যে, বিষ খাইয়া মরিতে হইবে—এ কথার অর্থ নাই। কার্য্যে আমাদের অধিকার; কার্য্য করিয়া যাও। ফলাফলে দৃষ্টি রাখিও না। * * * *

---

(৮)

২ পৌষ, ১৭-১২-১৯০৫ রবিবার

* * * প্রভু এখন বলিতেছেন কি—জান? "বাসা পাকড়েছ, এখন সহর দেখে আনন্দে বেড়াও।" স্বার্থবিসর্জ্জনে প্রভুর কার্য্য কর। আপনার উদরপূরণ হইলে, লোকে বিছানা অনুসন্ধান করে, ঘুমাইবার জন্য। তাহা হইবে না। ক্ষুধার যন্ত্রণা কি, তাহা অনুভব হইয়াছে, এখন দেখ কে কোথায় ক্ষুধার্ত্ত আছে, প্রভুর অন্নছত্রের সন্ধান তাহাকে বাতলাইয়া দাও। আর কাঙ্গলা বৃত্তি করিবার আবশ্যক নাই। পরের দুঃখে চিত্ত ডুবাইয়া যথাসাধ্য তাদের দুঃখ লাঘবে যত্নবান্ হও। আমি খাইব, আমি সুখ সম্ভোগ করিব, আমার ভাল হইবে—এ কামনাই বন্ধনের হেতু। ইহা যতদূর পার, পরিত্যাগে যত্নশীল হও।

দাসের কার্য্য—প্রভুর সেবা। প্রভু জীবরূপে লীলা করিতেছেন। জীবের সেবা কর, প্রভুর সেবা হইবে। সকল বিষয়ে সংকীর্ণতা পরিহার কর—চিত্তকে প্রসার করিয়া দাও। সত্যের আলোকে আলোকিত হইবে। আপনার ভাবনা একদম্ ছাড়িয়া দাও। প্রভু তোমার ভাবনা ভাবিবেন। ঈশ্বরের করুণা দেখ!

মানুষ যখন ধর্ম্ম করিতে আইসে, তখন ভাবে—তাহার সুখ হইবে, মান হইবে, মাহিয়ানা বাড়িবে, ইত্যাদি ইত্যাদি। কিন্তু, যখন সে তাঁহার কৃপার অধিকারী হয়, তখন বলে—কিছুই চাই না। "সুখের আশা-বর্জ্জনেই সুখলাভ হইয়া থাকে। ঘরে বসিয়া পায়েস, পলান্ন উপভোগে সে ব্যক্তি সন্ন্যাসীর পদবী লাভ করিতে পারে। বাহিরে কৌপীন লইলে কি হইবে? মনে ত্যাগ করিয়া রাজ্য চালাইলেও দোষ নাই। এ সকল আপনিই ক্রমে বুঝিবে। * * * *

---

(৯)

শ্রীশ্রীগুরুপদ ভরসা

৩০ শে শ্রাবণ।

২নং ডিহি ইটালী রোড।

* * * সময় সানুকুল না হইলে কিছুই হয় না। বলিবে—তবে ঈশ্বরের নামানুকীর্ত্তনে ফল কি? ভগবানে দৃঢ় বিশ্বাস হওয়া কিরূপ সুসময়ের ফল—চিন্তা করিয়া দেখিবে। আমরা জ্বালায় পড়িয়া মুখে কত কথাই বলি, কত জ্ঞান, কত ভক্তি, কত বিশ্বাসের অভিমান করিয়া থাকি, কিন্তু সরল মনে সত্যানুরোধে—অনুসন্ধান করিয়া

দেখিলে অন্তঃকরণে সেরূপ কিছুই দেখিতে পাই না। মহাত্মারা বলিয়া গিয়াছেন এবং শাস্ত্রাদিতেও দেখা যায় যে, পূর্ণজ্ঞান বা ভক্তি হইলে জীব মুক্ত হয়, তখন আর কর্ম্মবন্ধন ও সময়ের বলাবল থাকে না। সে বিধিনিষেধের পরপারে যায়।

যুধিষ্ঠিরাদি মহাত্মারা ভগবানের চাক্ষুষ দর্শন লাভ করিয়াও দুঃসময়ের কঠোর পীড়ন হইতে অব্যাহতি লাভ করিতে পারেন নাই। কৈ তাঁহারা ত তা, বলিয়া ধর্ম্মের প্রতি বীতরাগ প্রকাশ করেন নাই? বরঞ্চ দুঃসময় ভগবদ্‌ভজনের সহায়তা করে বলিয়া আদরে তাহাকে আলিঙ্গন করিয়াছেন। যুধিষ্ঠির কি জানিতেন না—কপট দ্যূতক্রীড়ায় তিনি সর্ব্বস্বান্ত হইবেন? ভ্রাতা, বণিতা, আত্মীয়েরা পুনঃ পুনঃ নিষেধ করিলেও তিনি তাহা হইতে প্রতিনিবৃত্ত হইলেন না কেন? তিনি ভগবৎকৃপায় দুঃখকে আদর করিতে শক্তিবান্ ও সময়ের বলাবল হৃদয়ঙ্গম করিয়াছিলেন। তাই তাদৃশ বিপদে বিপদ্‌বন্ধু হরিকে বিস্মরণ হন নাই।

আমাদের ক্ষুদ্র মন; অবস্থা মনের মত না হইলেই ঈশ্বরপ্রত্যয় হারাইয়া ফেলি! কেবল দুঃখেই নয়, সুখেও ভুলিয়া যাই। "খান দান চাষা হও"। জলের প্রত্যাশা করিও না। চাষ দাও, যাহা হইবার হউক। আমরা খতাইতে গিয়াই গোলে পড়ি। ধর্ম্ম-স্বভাব না হইলে বড়ই বিপদ, পতনের আশঙ্কা পদে পদে। নগদা মুটের কোনকালে শান্তি নাই। আমাদের এক সম্পত্তি ভালবাসা, প্রতিদানপ্রাপ্তির আশা পরিত্যাগে ভালবাসিতে পারিলেই তবে সুখ শান্তি। * * * *

---

(১০)

শনিবার, ১৫ জুন, ১৯০১।

বাবা—!

* * * দেখ! আমি যখনই তোমাকে দেখি, দেখি তুমি বিবর্ণ রহিয়াছ। ইহাতে আমি বড় ব্যথা পাই। সুখ-দুঃখ, লাভালাভ, জয়পরাজয় সকলি কর্ম্মফলে হইয়া থাকে, সে জন্য ক্ষুণ্ণ হইও না। যে চক্র ঘুরিয়াছে, তাহা নিবারণের সাধ্য নাই। ভাগ্যের সহিত যুদ্ধ করিতে করিতে যে ক্লান্ত হইয়া বিষণ্ণ হইয়া পড়ে, তাহার পুরুষার্থ কোথায়? পূর্ণ উৎসাহে বুক পাতিয়া দাও, সে ক্রমে নিস্তেজ হইয়া পড়িবে। তুমি জয়লাভ করিবে। হৃদয়ের দুর্ব্বলতা যত্নপূর্ব্বক পরিহার করা উচিত। To be weak is miserable doing or suffering। (কার্য্যে বা ভোগে দুর্ব্বলতাই দুঃখ *)। * * * *

---

(১১)

১লা আগষ্ট, ১৯০১।

* * * মনে ক্ষোভ করিও না। কোন অবস্থাই স্থায়ী হয় না। চাঞ্চল্য মনের ধর্ম্ম বলিয়া আমাদিগকে চঞ্চল করে। যা' হইবার তা' পূর্ব্ব হইতেই নির্দ্দিষ্ট আছে; কারণ ব্যতীত কর্ম্ম হয় না। কারণেও আমাদের কোন হাত নাই। দেখিতে গেলে, ভগবানের মায়া-সাগরের জীবপুঞ্জ তৃণ মাত্র। শুভানুষ্ঠান ও সৎ উদ্দেশ্যে কার্য্যপরায়ণ হওয়াই কর্ত্তব্য,ফ লাফল ঈশ্বরাধীন। * * * *

---

* পূর্ব্বাপর পত্র ও কথোপকথনে দেবেন্দ্রনাথ কর্ত্তৃক ব্যবহৃত ইংরাজী শব্দ ও বাক্যের বঙ্গানুবাদ আমাদের।

(১২)

Ram Krishna Mission, Entally.
The 31st August, 1906.

* * * যে বলে 'ভালবাসি' তার ভালবাসা সীমাবদ্ধ। সে জানে না, ভালবাসার পাল্লা কত দূর! তাই বলে 'ভালবাসি'!! তুমি ভালবাস না, তার মানে হচ্ছে এই—আকাঙ্ক্ষার অনুরূপ ভালবাসার আস্বাদন পাও না। আমরা সকল বিষয়েই তৃপ্তিকে অন্বেষণ করিয়া থাকি। ভক্তি, প্রেম, জ্ঞান ইহার পার্শ্বেই তৃপ্তিলাভ করিতে চাহি, কিন্তু জানি না তৃপ্তি অর্থে 'বিকার'। জ্ঞান, ভক্তি, প্রেমের ত কথাই নাই, সামান্য বিষয়েও তৃপ্তি অবস্থায় জীবকে নিরুদ্যম, নিরুৎসাহ ও অলসাক্রান্ত করিয়া থাকে। উত্তম ভোজনে তৃপ্তিলাভ হইলেই শয়নের তদ্বিরে আকৃষ্ট হইতে হয়। এ সম্বন্ধে ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ তাঁহার কোন ভক্তকে বলিয়াছিলেন যে, "আমার ভক্ত প্রথম যখন আমার অনুসরণ করে, আমি তখন তাহার সকল কামনা সফল করি এবং তাহার হৃদয়ে সর্ব্বদা উপস্থিত থাকিয়া দর্শন দেই। পরে সে আমাতে অনুরক্ত হইলে আমি তাহা হইতে দূরে অবস্থান করি।"

ভক্ত এতৎ শ্রবণে বলিল, "প্রভু, এ কি নিদারুণ কথা!"

ভগবান্ বলিলেন, "ইহাতে ভক্তের আমার প্রতি বিশেষ অনুরাগ ও অনুরক্তি জন্মে; তজ্জন্য সে আজীবন আমার অনুসরণে নিবৃত্ত হয় না। আমাকে লাভদ্বারা তৃপ্তিলাভ করিলে ভালবাসার সম্পূর্ণত্ব হয় না।"

প্রভু বলিতেন, "কোন বিষয়ে ইতি করিস্ না। যাহার অন্ত আছে তাহাই বিকার।"

তোমার ভালবাসায় যে গণ্ডী পড়ে নাই ইহা বড় সুখের বিষয়। ঈশ্বরের ভালবাসার স্মৃতি সর্ব্বদা মনে রাখিবে। তাঁহার ভালবাসা এত প্রবল যে, আমাদের ক্ষুদ্র ভালবাসা সে ভালবাসা অতিক্রম করিয়া তাঁহার নিকটে পৌঁছিতে পারে না; সূর্য্যকিরণে প্রদীপের আলো চিরকালই হীনপ্রভ! তাই বলিয়া ভালবাসিতে ক্ষান্ত থাকিব কেন? ভালবাস, যতদূর পার ভালবাস। ব্যক্তিবিশেষে ভালবাসা অভ্যাস করিয়া, সেই ভালবাসা জগতে ছড়াইয়া দিতে অভ্যাস কর। আশীর্ব্বাদ করি—কৃতকার্য্য হইবে।

যে, ভালবাসা চাহে, তাহাকে দাও। যে, না চাহে, তাহাকেও দাও। ভালবাসাই মনুষ্যত্বের চরম। আপনাকে বিলাইয়া দাও। নিজের সুখের আশা বিসর্জ্জন কর। তুমি দশ জনের হও। তোমার কেহ হইবে কি না—তাহা দেখিও না। চর্ম্মচক্ষে ঈশ্বর দেখিতে চাহিয়াছ, গুরুদর্শন করিতে চাহিয়াছ?—আপনাকে বিলাইয়া দিয়া জগৎকে প্রেম দাও, দেখিবে—আবাল বৃদ্ধ সকল নরনারীর হৃদয়ে তোমার অভীষ্ট বস্তু বিরাজ করিতেছে। কীট-পতঙ্গ, স্থাবর-জঙ্গম, —ইহা আর নেত্রপথে পতিত হইবে না।

ইহা শুনিতে কঠিন, কিন্তু অভ্যাসে আয়ত্ত হইবে। তাঁহাকে লাভ করিবার ইচ্ছা থাকিলে কিছুই কঠিন বলিয়া বোধ হইবে না। একবার স্থির চিত্তে ভাবিয়া দেখ—ভগবান্ আমাদিগকে দেখা দিবেন না বলিয়া কি লুকাইয়া আছেন? ইহা কখনই সম্ভব নহে। তিনি পুত্ররূপে, পিতৃরূপে, মাতৃরূপে, বন্ধু, বান্ধব, শত্রু, মিত্র নানারূপে তোমার সহিত বিহার করিতেছেন। তুমি অজ্ঞান

ও মমতায় মুগ্ধ হইয়া নানারূপে আকৃষ্ট হইয়া দেখিতে পাইতেছ না—এই মাত্র। যাহা কিছু করিতেছ, তাঁহারই কার্য্য করিতেছ। ঠাকুরের কৃপায় ইহা উপলব্ধি হইলেই তোমার সকল ক্ষোভের অবসান হইবে, চিন্তা করিও না।

ঈশ্বর অতি আপনার জিনিষ। তৎসম্বন্ধে কিম্ভূত কিমাকার idea (কল্পনা) সকল পরিত্যাগ করিবে। ঈশ্বর বিরল নহেন। যাহা কিছু দর্শন করিবে, তাহা তাহাই। ঈশ্বরজ্ঞানে সকলকে ভালবাসিবে—পরমপুরুষার্থ সাধন হইবে। দশ মুণ্ড, কুড়ি হাত কালী, দুর্গা—যা'ই বল, দেখিয়া বিশেষ কি লাভ হইবে—জানি না। স্বামীজির কথা বর্ত্তমান থাকিতে, অনুমানে কোন ফল নাই। যাহা দেখিবে, ঈশ্বরজ্ঞানে ভালবাসিবে। সে ভালবাসা তাঁহাতেই পর্য্যাপ্ত হইবে, তাহাতে সন্দেহ নাই। অধিক আর কি লিখিব? ইহার অধিক আর আমি কিছুই জানি না।

---

(১৩)

২রা শ্রাবণ, বুধবার
July 18, 1906.

* * * তুমি লিখিয়াছ আমি তোমার উপরে যদি "অসন্তুষ্ট হইয়া থাকি"। এ কথা পাঠে আমার দুঃখের স্থলে হাসি পাইল। বৎস! তোমার প্রতি অসন্তুষ্ট হইয়াছি, তুমি কিসে বুঝিলে? এ বিষয়ে আমি তোমার কথায় তোমাকে জিজ্ঞাসা করিতে পারি—"তুমি কি আমার প্রতি অসন্তুষ্ট হইয়াছ?" নহিলে কি করিয়া উপলব্ধি

করিলে যে, আমি অসন্তুষ্ট হইয়াছি? অপরাধ শব্দের মানে আমার মনে হয় যে, কর্ত্তার কার্য্যের ত্রুটিবশতঃ মনে যে একটা অস্বচ্ছন্দতা হয় তাহাই; তাহা কর্ত্তাতেই নিবদ্ধ থাকিয়া অসুখ উৎপাদন করে মাত্র। নচেৎ ঈশ্বর যদি জীবের অপরাধ গ্রহণ করিতেন তাহা হইলে, সমগ্র ধরণী আজ শ্মশানে পরিণত হইত!

তবে পুরাণাদিতে ঈশ্বরের অপরাধমূলক ধ্বংসাদি নানা রূপক বিভীষিকার কথা যে পাঠ করিয়াছি, তাহার অন্য তাৎপর্য্য থাকিতে পারে। তাহা না হইলে ঈশ্বরের ন্যায় মহান্ সর্ব্বশক্তিমান্ বিভূ ক্ষুদ্রাদপি ক্ষুদ্র জীবের দোষানুসন্ধানে তাঁহার অসীম করুণা কলঙ্কিত করিতেছেন; ইহা আমি বুঝিতে পারি না। কার্য্যকে ফলপ্রসূ করিয়া আবার তিনি বেত্র লইয়া জীবকে দণ্ডার্থে বসিয়া আছেন, ইহা কি তোমার মনে হয়? ওসব কথা মনে করিও না। ঈশ্বর মনের মন, প্রাণের প্রাণ, আত্মার আত্মা, তাঁহার ন্যায় আমাদের আপনার কে আছে? তিনি আমার সমস্তই জানেন। আমার শক্তি এবং দুর্ব্বলতা—এ উভয়ই আমি যত না জানি, তিনি তাহা হইতেও অধিক জানেন। এ সকল দুশ্চিন্তা ছাড়িয়া দিয়া তোমার প্রিয়জনকে ব্যাপক করিয়া দেখ। Struggle yourself help will come (পরিশ্রম কর সাহায্য আসিবে।) তাঁহার মধ্যে সকলকে দেখ ও সকলের মধ্যে তাঁহাকে দেখ—দুঃখের অবসান ও মৃত্যুজয় হইবে।

---

(১৪)

১লা শ্রাবণ, মঙ্গলবার

The 17th July, 1906.

* * * তোমাদের সেবা সুধা অপেক্ষাও আমার তৃপ্তিকর! আশীর্ব্বাদ করি—আমাতে তোমার নিষ্ঠা ভক্তি হউক। শ্রীগুরুর শ্রীচরণকৃপায় এখন হৃদয়ে বুঝিতে সমর্থ হইতেছি যে, যাগ, যজ্ঞ, সাধন, ভজন—যাহাই বল, গুরুকৃপা ভিন্ন আর অন্য গত্যন্তর নাই। 'গুরুই ব্রহ্মা, গুরুই বিষ্ণু, গুরুই মহেশ্বর, গুরুই ব্রহ্ম, গুরুগীতার এই মন্ত্রই জীবের একমাত্র অবলম্বনীয়। কালক্রমে আমরা শক্তিহীন। কঠিন তপস্যা বা সাধন ভজনে আমাদের ক্ষমতা কই? মন দুর্ব্বল—কি লইয়া সাধনা করিব? কৃপা ভিন্ন অন্য কিছুই দেখি না। সাধনায় তিনি আয়ত্ত হইবেন, এ কথা মনে করিতেও অপরাধ বিবেচনা হয়। গুরু আর কেহই নহেন—ঈশ্বর। মানুষ মানুষকে পরিত্রাণ করিবে? মানুষ মানুষকে বুঝাইতে পারে না। ঈশ্বরের কথাই ফলবতী হইয়া থাকে। এই জন্যই মানুষ গুরু নহে। গুরু ঈশ্বর—এ কথা অবশ্য বুঝিয়াছ। হৃদয়ে দৃঢ়রূপে প্রতীতি হইলেই হইল। এই গানটী খুব ভাল বলিয়া আমার মনে হয়—

"যখন যেরূপে কালী রাখিবে আমারে।
সেই সে মঙ্গল যদি না ভুলি তোমারে॥"

প্রভুর উক্তি—"খেতে শুতে স্মরণ মনন"—ইহাও কালমাহাত্ম্যে হয় না! কিছু চিন্তা করিও না, যাঁর কার্য্য তিনিই করিবেন। তাঁহার সত্তায় তোমার সত্তা ডুবিয়া যাইবে। আবার তাঁহার সত্তালাভে তোমার সত্তা নূতন হইয়া জাগিয়া উঠিবে। তুমি বসিয়া কেবল

এই রহস্য দেখ, আর প্রভুর জয় দাও। স্বয়ং কিছুই করিও না। তাঁহার উপর ফেলিয়া দাও, আপদ শান্তি হইয়া যাইবে। সুখে রাখেন—রহিবে, দুঃখে রাখেন—চারা নাই। তিনি তোমার কর্তৃত্বাভিমানকে দগ্ধ করিয়া ফেলিবেন—এ পক্ষে সন্দেহ নাই। হতাশ্বাস হইবে না। ইহাতে মনের স্বচ্ছন্দতা নষ্ট ভিন্ন কোনই লাভ নাই। ইহা তোমাকে বার বার বলিয়াছি; স্মরণ আছে? * * * *

---

(১৫)

* * * তুমি সেজন্য কিছু মনে করিও না, বা হতাশ্বাস হইও না। এইটি জানিও যে, যে পর্য্যন্ত আমরা বস্তু লাভ করিতে না পারিব, সে পর্য্যন্ত আমাদের উঠিতে পড়িতে হইবেই হইবে। প্রত্যেক fall (পতন)—rise (উন্নতি) এর কারণ বলিয়া জানিবে। আমাদের একটি ভুল ধারণা আছে যে, ব্যর্থ কর্ম্ম করিতে গেলেই একবারেই সকল অন্তর্বৃত্তি ঠিক্ হইয়া যাইবে। ইহা বলিতে ভাল, কিন্তু কার্য্যে তাহা অন্যরূপ হইয়া থাকে। মনুষ্যের হৃদ্গত মহা মহা দোষের যদি একেবারেই নিবৃত্তি হইয়া যাইত, তাহা হইলে সাধকেরা দীর্ঘকাল কঠোর তপস্যা ও পুনঃ পুনঃ চেষ্টা করিতেন না। তবে সাধক যখন আপনার হৃদয়ের দৌর্ব্বল্য ও অসারতা দেখিতে পান, তখন তাঁহার কোন মতে নিরাশ হওয়া কর্ত্তব্য হয় না। ঠাকুর বলিতেন,—"বাছুর শতবার পড়ে আবার শতবার উঠিতে চেষ্টা করে। যাহার হৃদয়ে এই struggle (সংগ্রাম) বলবতী হয়, সে সেই অমুল্যধনের অধিকারী হইয়া থাকে। "Struggle is the best beauty of life (সংগ্রামই

জীবনের সর্ব্বোৎকৃষ্ট সৌন্দর্য্য) যে কখনও পড়ে নাই, সে তত প্রশংসনীয় নহে। কিন্তু পড়িয়া যাহার উত্থান হয়, তাহার প্রশংসাই প্রশংসা। এতএব মনের দৌর্ব্বল্যদর্শনে মনে করিও না যে, কিছুই হইতেছে না; বরঞ্চ আরও দৃঢ়তার সহিত সে দুর্ব্বলতাকে পরিহারের চেষ্টা করিবে। যতক্ষণ আমরা লক্ষ্যস্থলে না পৌছিব, ততক্ষণ সুবিধা অসুবিধা উভয়ের মধ্য দিয়া যাইতে হইবে, ইহা মনে ধারণা রাখিবে। সম্পূর্ণ নির্ভর কি একেবারেই হয়? সে জন্য ভয় পাইও না। * * * *

---

(১৬)

কলিকাতা
১২-১-১৩১৫

* * * তোমাদের মিসনব্রাদার ভিন্ন অন্য বিশ্বাসাবলম্বী ব্যক্তিরও তথায় সমাগম হয়। প্রথম অবস্থায় তাহা তত ইষ্টদায়ক বলিয়া বোধ করি না। "চারা গাছে বেড়া" দেওয়া কর্ত্তব্য। যাহা হউক, তোমরা বুদ্ধিমান্, আত্মমতসংরক্ষণে সমর্থ। অধিক আর কি লিখিব? আর একটি কথা—ধর্ম্মচর্চ্চার স্থান প্রতিনিয়ত পরিবর্ত্তন করাও কর্ত্তব্য নহে। ভজনালয়ে অন্য চিন্তা, অন্য কার্য্য করা নিষিদ্ধ। ঘরটী Entirely (সম্পূর্ণরূপে) ধর্ম্মচর্চ্চার নিমিত্ত হওয়া চাহি।

* * * মহাত্মারা বলিয়া গিয়াছেন—"আপন ভজনকথা, না কহিবে যথা তথা।" মানে এই, অবিশ্বাসীর সঙ্গ বিশ্বাসীর নিষিদ্ধ। স্তবকবচে ইহা পুনঃ পুনঃ নিষেধ করা আছে। সহোদর বা Bossom

friend (সুহৃদ্) হইলেও তাহার সঙ্গ পরিহার্য্য। উহাতে কি অনিষ্ট হয়, না হয়, তাহা বলিয়া শেষ করা যায় না।

আমার মনে হইতেছে—তোমার মন তত ভাল নাই। তাহা না থাকিবারই কথা। শাস্ত্রে ঈশ্বরলাভের একমাত্র উপায় বলিয়াছেন—"গুরু-বেদান্তবাক্যে বিশ্বাস।" গুরু অপেক্ষা গুরুবাক্যে নির্ভরই একমাত্র উপায়। অবিতর্কে গুরুবাক্যে বিশ্বাস চাই। হইতে পারে—শিষ্য, গুরু অপেক্ষাও বিদ্যাবুদ্ধিসম্পন্ন! কিন্তু বিশ্বাসের রাজ্যে সে সম্পূর্ণ অপরিচিত। ঈশ্বর বিশ্বাসেই লভ্য। তর্কযুক্তিতে ঈশ্বরস্থাপন হয় না। তাই বলি—তোমার গুরু যখন বলিয়াছেন—"ভয় নাই, তোমার ঈশ্বর লাভ হইবে,"—সে কথায় নির্ভর না করিয়া মনের কথা শুনিবার আবশ্যক কি? তবে গুরুবাক্যে নির্ভর কৈ!

বৎস, বলিয়াছি এক মুহূর্ত্তে ঈশ্বরলাভ হয়; সময়ের অপেক্ষা করিতে বলিবার তাৎপর্য্য—কেবল মনকে প্রস্তুত করা। মন যখন ঠিক্ প্রস্তুত হইবে, মন যখন গুরুবাক্যে ষোল আনা বিশ্বাস করিতে সমর্থ হইবে; যখন শিষ্য গুরুবাক্যে বিষভক্ষণে আদিষ্ট হইলেও, মন কি বলে—একবার জিজ্ঞাসা না করিয়া, তৎক্ষণাৎ তাহা করিতে প্রস্তুত হইবে, তখন গুরু তাহাকে যেই মাত্র বলিবেন, "তোমার ঈশ্বরলাভ হউক", সেই মুহূর্ত্তেই সে তাহা লাভ করিবেই করিবে। বাবা! যদি ঈশ্বর লাভ করিতে চাও, মহারত্ন বলিয়া যে সকল জঞ্জাল হৃদয়ে ভরিয়া রাখিয়াছ, বিশ্বাসের অগ্নিতে তাহা ভস্মীভূত করিয়া ফেল। বিশ্বাস ভিন্ন যুগযুগান্তরের সাধনা ও জ্ঞানচর্চ্চা করিয়াও তাঁহাকে পাইবে না। কথার সওদাগরী ছাড়িয়া দাও। গুরুবাক্য, বেদবাক্য বলিয়া ধারণা করিতে চেষ্টা কর। ইহাই ঈশ্বর লাভের একমাত্র সাধনা জানিবে। এক সর্ষপপরিমিত বিশ্বাস হিমালয়কে স্থানচ্যুত করিতে পারে—যিশু বলিয়াছেন। এ কথা কি

তুমি বিশ্বাস করিতে প্রস্তুত নহ? সমস্ত ছাড়িয়া দিয়া বিশ্বাসের চর্চ্চায় নিযুক্ত হও; তর্কযুক্তিকে দরিয়ায় ভাসাইয়া দাও। তর্কযুক্তি খোন্তা, কুড়াল, পথের জঙ্গল সাফ করিয়া দেয় মাত্র। ঈশ্বরলাভে বিশ্বাসই একমাত্র উপায় জানিও। ব্যস্ত হইও না, যত ব্যস্ত হইবে, উদ্দেশ্য বস্তু ততই দূরে যাইয়া পড়িবে। স্থির হইয়া কার্য্য কর, উহাই কার্য্যের রহস্য। আঁকু বাঁকু করিলে কেবল শক্তির অপচয় হইবে মাত্র। তুমি সায়েন্সের অধ্যাপক—বেশী বলিতে হইবে না। * * * *

---

(১৭)

The 7th August, 1908.

Meerut Cantt.

* * * কর্ম্মফল ভোগ করিতেই হইবে। কখনও দুঃখ, কখনও শান্তি, কখনও অশান্তি—ইহা অনিবার্য্য জানিয়া ঈশ্বরের পাদপদ্মে মতি রাখিতে যত্নবান্ হওয়াই আমাদের একমাত্র কর্ত্তব্য। মনের পশ্চাতে ঘুরিলে ঈশ্বরের পশ্চাতে থাকিতে পারিব না। মন যাহা করে করুক। তুমি হরি হরি করিতে থাক। মনের স্বভাব চঞ্চল, তাহার কাজ সে করুক, তোমার কাজ তুমি কর। পরিণামে তোমার জয় হইবে। ঠাকুরের কথা সর্ব্বদা স্মরণ রাখিও—"এক হাত সংসারে দাও, আর এক হাত ঈশ্বরের পাদপদ্মে রাখ।" তুমি কোন বিষয় চিন্তা করিও না। সংসার তোমাকে ডুবাইতে পারিবে না। ক্ষণিক আবরিত হইলেও তাহা স্থায়ী হইবে না। তোমার গুরুপদে সর্ব্বদা রতি মতি রাখিবে, কোন বিঘ্নই হইবে না। * * * *

---

(১৮)

July 23, 1910

* * * তোমার পত্রে জ্ঞাত হইলাম। ভক্তিপথে ভগবানকে সর্ব্বস্ব করিয়া রাখিতে হয়। পরিণামে ইহার উপলব্ধি হয় বটে, কিন্তু সাধন অবস্থায় ভক্তের নিজের শক্তি নাই, ঈশ্বরকৃপায় সমস্ত হ'বে—এই বলিয়া গা ঢালিয়া বসিয়া থাকা খুব অজ্ঞানের কার্য্য। সত্য, তাঁহার ইচ্ছাতেই সমস্ত যে হয়—এ কথা কখন বুঝিব? না, যখন আমার অহং-জ্ঞানের নাশ হইবে। যে পর্য্যন্ত অহংজ্ঞান থাকিবে, সে পর্য্যন্ত ঈশ্বরের নিকট প্রার্থনা রাখিয়া নিজের কুপ্রবৃত্তি সকল দমনের বিশেষ চেষ্টা, সাধককে নিজে করিতে হইবে; ঈশ্বর করিয়া দিবেন এ কথা ঝুট্ বাত্। তিনি ফলদাতা, কার্য্যের কর্ত্তা আমি। আমি যদি কর্ম্ম না করিলাম, ফল পাইব কিসের? ভক্তিপথে অনেক সময়ে ভগবানের দোহাই দিয়া ভক্ত আপনাকে অজ্ঞাতভাবে ঠকায়। সমুদয় কুপ্রবৃত্তির প্রশ্রয় দিব, আর ঈশ্বর আছেন, তিনি দয়াময়, সকল করিয়া দিবেন—এ কুড়েমীর কথা। এইরূপ ভক্ত সহস্র জন্মগ্রহণ করিলেও কিছু হয় কি না, সন্দেহের বিষয়। অবশ্য, তুমি এক পদ অগ্রসর হইলে ভগবান্ দশ পা এগিয়ে আসিবেন—ইহা খুব সত্য। তুমি কিছুই করিবে না, মধ্যে মধ্যে ভগবান্ বলিয়া—দুই বার 'হরি হরি' করিয়া কার্য্যের খতম হইল—মনে করিলে কিছুই হইবে না।

চিত্তসংযম পক্ষে ভক্তকে নিজে পুনঃ পুনঃ চেষ্টা, যত্ন করিতে হইবে, অবশ্য যাহার তৎপ্রতি দৃষ্টি থাকে, ভগবান্ তাহাকে ঐ কার্য্যে সাহায্য করিয়া থাকেন। তিনি কল্পতরু, যাহাই চাহিবে, তাহাই পাইবে, যাহা চাইবে না তাহা পাইবেও না। চিত্ত সংযম করিয়া সচ্চরিত্র না হইলে কিছুই ধারণা হইবে না। ছিদ্রকুম্ভে যতই

জল ঢাল না কেন, বাহির হইয়া যাইবে। অতএব, সর্ব্বাগ্রে যাহাতে পবিত্র স্বভাব গঠিত হয়, তৎপ্রতি বিশেষ যত্নবান্ হইতে হইবে।

ভগবান্ ব্যক্তিমাত্রেরই হৃদয়ে বিরাজ করিতেছেন, তাঁহাকে লাভের জন্য কোন কার্য্যেরই অনুষ্ঠান করিতে হয় না। তিনি স্বপ্রকাশ, কেবল আমাদের অজ্ঞানবশতঃ তাঁহাকে আমরা অনুভব বা দর্শন করিতে পারি না। বিশুদ্ধচরিত্র হইলে, সেই অজ্ঞানরূপ বাধার যে পরিমাণ হ্রাস হইবে, সেই পরিমাণ আমাদের মধ্যে ঈশ্বরের সত্তা উপলব্ধি হইবে,--ইহাই কার্য্যকরী কথা। অন্যথা "হে ভগবান্! তুমি প্রেমময়, তুমি পতিতপাবন্"—বলিয়া চীৎকার করিলে কি হইবে? ভগবান্ প্রাণ চান, তাঁহাতে প্রাণ মন দিতে হইবে। জীব যদি প্রবৃত্ত না হয় ও সৎপ্রবৃত্তির আশ্রয় গ্রহণ না করে, তাহার প্রাণ শয়তানের সেবায় নিযুক্ত থাকিবে; সে কি করিয়া ঈশ্বরকে সে প্রাণ অর্পণ করিতে পারিবে? সত্যকে পাইতে হইলে মিথ্যাকে পরিত্যাগ করা চাই।

আমি জানি সংসারী জীবের পক্ষে এ সকল কথা অসম্ভব বলিয়া ধারণা হইতে পারে। সে স্থলে আমার বক্তব্য এই যে, সদ্যঃ প্রসূতা গাভীর বৎসের প্রতি একবার দৃষ্টি করিয়া দেখ। সে ভূমিষ্ঠ হইয়াই দাঁড়াইতে চেষ্টা করে, কিন্তু পারে না। বার বার পড়িয়া যায়, অথচ সে নিশ্চেষ্ট থাকে না, উঠিয়া দাঁড়াইবার জন্য বার বার চেষ্টা করিয়া থাকে এবং অবশেষে কৃতকার্য্য হয়।

হে সংসারী জীব! জানি তুমি কায়-প্রাণে খুব দুর্ব্বল, কিন্তু হতাশ হইবার প্রয়োজন নাই, আপনাকে সংশোধন করিয়া ভগবানের দিকে যাইতে শিথিলযত্ন হইও না,—তুমিও একদিন কৃতার্থ হইতে পারিবে। ভাবিয়া দেখ— পর্ব্বতস্থ ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র নির্ঝরের বিন্দু বিন্দু

বারি বহিয়া গিয়া সাগরকে জীবিত রাখিয়াছে, অন্যথা উহা শুকাইয়া যাইত। ইহাও দেখিয়াছ—ফোঁটা ফোঁটা জল পড়িয়া প্রস্তরে গর্ত্ত হয়। নিরাশ হইবার কারণ নাই ; যত্ন চেষ্টা কর, অবশ্যই সফল হইবে। যে পর্য্যন্ত অভীষ্ট লাভ না হয়, সে পর্য্যন্ত লাগিয়া থাক।

ঠাকুরের উপদেশটী এস্থলে স্মরণ রাখা কর্ত্তব্য। তিনি বলিতেন, "খানদান চাষা হও"—এক বৎসর কেন, সাত বৎসরও যদি অনাবৃষ্টি হয়, তথাচ সে চাষ করিতে ছাড়ে না। কিন্তু যে মুদির দোকান ছেড়ে চাষ আরম্ভ করে, সে এক বৎসর জল না হইলেই হাল গরু বেচে ফেরার হয়। অতএব রোক করিয়া লাগিতে হইবে, ভ্যাদ্‌ভেদের কিছুই হয় না * * প্রভৃতি ভক্তবৃন্দকে ইহা বলিবে, একটা কথায় আছে না ?—"সাধ হয় বৈষ্ণব হতে, কি ফাটে মচ্ছব দিতে।" হতাশ হইবার প্রয়োজন নাই। ধীরে ধীরে অগ্রসর হও। যে পরিমাণে উপযুক্ততা লাভ করিবে, সেই পরিমাণে পুরস্কৃত হইবে। ইহা নিশ্চয় জানিও, Rome was not built in a day (রোম একদিনে নির্ম্মিত হয় নাই)। উঠ, জাগ্রত হও, যে পর্য্যন্ত উদ্দেশ্যস্থানে পৌছিতে না পার, সে পর্য্যন্ত ক্ষান্ত হইও না। পূজ্যপাদ ঋষিদিগের বাক্য অনুসরণ কর, "উত্তিষ্ঠত জাগ্রত প্রাপ্য বরান্ নিবোধত।" * * সকলকে বলিবে, "চালাকি দ্বারা কোন মহৎ কার্য্য হয় না।" উহা এই সংসারের কার্য্যে প্রযুজ্য।

---

(১৯)

* * * * * *

১। নিজের সহস্র ক্ষতি স্বীকার ক'রেও পরের উপকার করবার চেষ্টা করবে।

২। অপ্রিয় ঘটনায় যদি শান্তি রক্ষা করিতে না পার, তবে সে শান্তির মহত্ত্ব কি ?

৩। সংসারে বিচিত্রঘটনাবলী আমাদিগকে মনুষত্বলাভে সহায়তা করে।

৪। নিজে যতই পবিত্র হওনা কেন, ঈশ্বরের নিকট নিত্য ক্ষমা প্রার্থনা করিবে। যদি অপরকে ক্ষমা করিতে না পার, তবে কেমন করিয়া ঈশ্বরের নিকট ক্ষমা প্রত্যাশা করিবে ?

৫। তৈলাক্ত মাথায় তৈলদান অপেক্ষা রুক্ষ মাথায় তৈল দানে অধিক মহত্ত্ব।

৬। পাপীকে পাপের পথে ঠেলে দেওয়া অপেক্ষা পুণ্যের পথে অগ্রসর করান অধিক মহত্ত্ব

৭। গুরুর কাছে (শিষ্যের) থাকা ভাল, আবার খারাপও বটে।

৮। একটী ভাব আশ্রয় না করলে একশ বছরেও কিছু হবে না। একটী রূপ ঠিক করে তার সঙ্গে একটী ভাব আশ্রয় করে ডেকে গেলেই হলো।

৯। স্ত্রীলোকের কোন সৌন্দর্য্য নাই ; আমরা কামেতে সুন্দর দেখি।

১০। কিসে ধর্ম্ম হয়, আর কিসে অধর্ম্ম হয় তাহা বোঝা যায় না।

১১। আচার, অনাচার, অত্যাচার—জগতে প্রত্যেক বস্তুর এই তিনটে ভাব আছে, এর মধ্যে আচারটাই ভাল।

১২। যার চৈতন্য হয় তার সব দিকেই হয়।

* * * * *

(২০)

ভাগবত বলিয়াছেন, যে আমার ভক্ত আমাকে সর্ব্বদা সম্ভোগ করিতে চাহিলেও আমি তাহার নিকট হইতে দূরে অবস্থান করি, যেহেতু তাহাতে তাহার অনুরাগের বৃদ্ধি ও চেষ্টার পুষ্টিসাধন হইবে। মিলনের যে কি সুখ, বিরহেই তাহা বুঝা যায়। তিনি প্রেমময়, সকলকেই তাঁহার ক্রোড়ে আশ্রয় দিবেন, কাহাকেও ফেলিবেন না। আমরা অবিশ্বাসী তাই হতাশ্বাস হইয়া অন্ধকার দেখি এবং কষ্ট পাই। আমরা তাঁহার সন্তান, পাপ পুণ্যের ধার ধারি না। বড়লোকের ছেলে খুন করিয়া অব্যাহতি পায়। আমরা বাবাকে জানি, অত শত বুঝি না, যদি অপরাধী হই, সে অবশ্যই ক্ষমা করিবে। যে ভগবান ক্ষমা করেন না, ন্যায়ের নিক্তি লইয়া জীবের ন্যায় অন্যায় মাপ করিয়া স্বর্গনরকের ব্যবস্থা করিতেছেন, সে ভগবানকে আমরা দূর হইতে কেবল ভয়ের জন্য প্রণাম করিতে পারি। যিনি আমার দুর্ব্বলতা দেখিয়া আমার ন্যায় দেহ ধরিয়া নানা ক্লেশ সহ্য করিয়া বলেন যে, "বৎস—ভয় নাই—তোমার মহাপাতক, অতিপাতক, যাহা কিছু থাকে আমাকে দাও, আমি আমার পবিত্রতা তোমাকে দিয়া পবিত্র করিব"। আমাদের ভগবান এই, তবে * ভয় কি? আনন্দে বল—জয় রামকৃষ্ণের জয়।

শ্রীদেবেন্দ্র

এই পত্রখানির প্রতিলিপি নিম্নে প্রদত্ত হইল। বার্দ্ধক্যে দেবেন্দ্র-নাথের হস্তাক্ষর কিরূপ হইয়াছিল, তাহা এতদ্দৃষ্টে জানিতে পারা যাইবে—

---

* পত্রাবলীতে উল্লিখিত নাম প্রকাশ করিতে কাহারও কাহারও আপত্তি থাকায় সর্ব্বত্রই নাম বর্জ্জিত হইয়াছে।

ভাগবত বলিয়াছেন, যে আমায় ভক্ত আমাকে সর্ব্বদা
সন্তুষ্ট করিতে চাহিবে- আমি তাহার নিকট হইতে
দূরে অবস্থান করি, যেহেতু তাহাতে তাহার —
অনুরাগের বৃদ্ধি ও সেবার স্পৃহা অধিক হইবে।
মিলনে যে কি সুখ, বিরহেই তাহা বুঝা যায়।
তিনি প্রেমময়, সকলকেই তাঁহার প্রেমের আশ্রয় —
দিবেন, কাহাকেও ফেলিবেন না। আমরা আশ্রয়প্রার্থী —
ঐ প্রভুর হইয়া অন্তরের সেবা এবং কর্ম্ম করি।
আমরা তাঁহার সন্তান — পাপ পুণ্যের ধার ধারি না।
বড় লোকের ছেলে খুন করিয়া অব্যাহতি পায়।
আমরা বাবাকে জানি — শঙ্কা বুঝি না, যদি —
অপরাধী হই — সে অবশ্যই ক্ষমা করিবে।
যে ভগবান ক্ষমা করেন না, তাদের নিত্য লইয়া
জীবের ন্যায় অন্যায় মাপ করিয়া স্বর্গ নরকের ব্যবস্থা
করিতেছেন সে ভগবানকে আমরা দূর হইতে কেবল —
ভয়ের জন্য প্রণাম করিতে পারি। যিনি আমার
দুর্ব্বলতা দেখিয়া আমার ন্যায় দেহ ধরিয়া —
নানা ক্লেশ সহ্য করিয়া বলেন যে, "হে বৎস —
ভয় নাই। তোমার সমস্ত পাপ, তাপ, সব —
কিছু আমাকে দাও, আমি তাহাও পরিষ্কার
তোমাকে দিয়া পবিত্র করিব"। আমাদের ভগবান
এই; তবে ভয় কি? আনন্দে বল —
জয় রামকৃষ্ণের জয়। — শ্রীসদানন্দ

চতুস্ত্রিংশ পরিচ্ছেদ

দেবেন্দ্রনাথের মতবাদ।

এই সকল পত্রাবলী হইতে মহাত্মা দেবেন্দ্রনাথের আত্মবিকাশের সুস্পষ্ট আভাস পাওয়া যায়। 'দেবগীতি'তে প্রকাশিত দেবেন্দ্রনাথের রচিত গীত, স্তোত্র ও কবিতাবলী হইতেও তাঁহাতে যে জ্ঞান, ভক্তি ও প্রেমপূর্ণ ভাবে প্রস্ফুটিত হইয়াছিল, তাহা সহজেই বুঝা যায়।

দেবেন্দ্রনাথ শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণদেবের অনুগত ভক্ত ও প্রিয় শিষ্য ছিলেন। শিষ্য, গুরুর মতবাদ আপন চিন্তা ও সাধনাবলে উপলব্ধি করিতে সমর্থ হইয়া থাকেন—ইহাই সনাতন রীতি। পরমহংসদেব যেমন ভক্তিরসাভিসিঞ্চিত অদ্বৈতবেদান্ততত্ত্বের প্রতিমূর্ত্তি ছিলেন, মহাত্মা দেবেন্দ্রনাথও তাঁহারই ছায়াস্বরূপ ছিলেন। দেবেন্দ্রনাথের চরিত্রে ও লেখাতে তাহার প্রকৃষ্ট পরিচয় পাওয়া যায়। দার্শনিক রীতিতে যে কোন মতবাদের পরিচয় দিতে হইলে প্রধানতঃ পাঁচটী বিষয়ের পরিচয় দিতে হয়, ইহা সুধীব্যক্তিমাত্রেই অবগত আছেন। সেই পাঁচটী বিষয় যথা—১। ব্রহ্ম, ২। জীব, ৩। জগৎ, ৪। মুক্তি, ও ৫। সাধন। এই পঞ্চ বিষয়ই সকল দর্শনশাস্ত্রের বিচার্য্য বিষয়। দেবেন্দ্রনাথ এই পাঁচটী বিষয় সম্বন্ধে যে সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছিলেন, এই পত্রাবলি ও 'দেবগীতি'তে প্রকাশিত কবিতাদি এবং তাঁহার সহিত কথোপকথন হইতে যাহা জানিতে পারিয়াছি চিন্তাশীল পাঠকবর্গের জন্য তাহার উল্লেখ অবশ্যকরণীয়। এই জন্য তাহা নিম্নে প্রদত্ত হইল :—

১। ব্রহ্ম সম্বন্ধে দেবেন্দ্রনাথের মত এই —

(ক) ইহা 'নিগুর্ণ'—'দেশকালের অতীত', নির্ব্বিশেষ এবং এক-মাত্র নিত্য অদ্বৈত বস্তু।

(খ) ইহা 'মায়াপরিবৃত নহে' 'নিত্যস্বপ্রকাশ'।

(গ) ইহা 'সত্য, জ্ঞান ও আনন্দরূপ' এবং দৃশ্য নহে।

(ঘ) মায়াবিশিষ্ট ব্রহ্মই সগুণ ও সবিশেষ ব্রহ্ম। সেই সগুণ ব্রহ্মই ঈশ্বর—ইহা উপাস্য, ইনিই 'আদর্শ পুরুষ' বিশেষ। উপাসক "শেষে এমন এক অবস্থায় উত্তীর্ণ হয় যে, তাহার আদর্শ পুরুষ ও তাহাতে কোন পার্থক্য থাকে না।"

(ঙ) ঈশ্বরের অনাদি অথচ সান্ত মায়াশক্তির বশেই সৃষ্টি-স্থিতি-লয় হয়। ঈশ্বর অনন্ত 'সর্ব্বশক্তিমান' ও 'সর্ব্বজ্ঞ'।

২। জীব সম্বন্ধে দেবেন্দ্রনাথের মত এই—

(ক) জীব স্বরূপতঃ ব্রহ্মই।

(খ) জীব 'মায়াপরিবৃত'—'মায়া-কুজ্ঝটিকারূপ আবরণের ভিতরেই তাহার খেলাধুলা ও ভেদ জ্ঞান।'

(গ) জীব বহু, অল্পজ্ঞ ও অল্পশক্তিমান্।

৩। জগৎ সম্বন্ধে দেবেন্দ্রনাথের মত এই—

(ক) এক ব্রহ্মশক্তিরই পরিণাম এই জগৎ।

(খ) ইহা 'মনের ধর্ম্ম' বা মায়াকল্পিত—'আত্মজ্ঞানে জগৎ নাই।'

(গ) 'জগৎ বোধ থাকিতে পরব্রহ্মের ধারণা কি প্রকারে হইতে পারে?' 'যাহার অন্ত আছে, তাহাই বিকার' ইহা সান্ত, পরিবর্ত্তনশীল এজন্য অনির্ব্বচনীয় বা মিথ্যা।

(ঘ) জীব ও ব্রহ্মের ঐক্যজ্ঞানে এই জগৎ ও তাহার মূলকারণ মায়া চিরতরে বিলুপ্ত হয়।

৪। মুক্তি সম্বন্ধে দেবেন্দ্রনাথের মত এই—

(ক) মুক্তিতে জীবের জীবত্ব চলিয়া যায় ও তাহার অদ্বিতীয় ব্রহ্ম-স্বরূপের প্রকাশ হয়। 'মায়াজালের ভিতর দিয়া তাহার আত্মদৃষ্টি হয়'।

(খ) ব্রহ্মজ্ঞান হইলে দ্রষ্টৃ-দৃশ্য-দর্শন অথবা জ্ঞাতা-জ্ঞেয়-জ্ঞান সকলই বিলীন হয়; থাকে—কেবল সৎ চিৎ আনন্দস্বরূপ।

(গ) 'মুক্তিতে জীবের সহিত ব্রহ্মের কোন ভেদই থাকে না।'

৫। সাধন সম্বন্ধে দেবেন্দ্রনাথের মত এই—

(ক) জ্ঞানেই মুক্তি। একজ্ঞানই জ্ঞান।

(খ) ভক্তিতে শেষে সেই জ্ঞানই হয়।

(গ) ভক্তিপথই সহজ পথ।

(ঘ) কর্ম্ম সেই ভক্তিপথে আনিয়া দেয়।

(ঙ) "যোগী স্থূল সূক্ষ্ম দেহ বিশ্লেষণ করিয়া সেই আত্মজ্ঞান লাভ করেন। আত্মজ্ঞানে 'চরমে সকলেই কৃতার্থ'।

দার্শনিক ভাষায় দেবেন্দ্রনাথের মতের ইহাই পরিচয়।

ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণদেবের যেরূপ সর্ব্বধর্ম্ম বা সর্ব্বভাবের সমন্বয় ছিল, দেবেন্দ্রনাথের জীবনেও তাহা সম্পূর্ণরূপে ফুটিয়া উঠিয়াছিল। দেবেন্দ্রনাথের মধ্যে দ্বৈত ও অদ্বৈতের অনন্যসাধারণ একটী সুন্দর সামঞ্জস্য পরিলক্ষিত হইত। যাহা হউক, তাঁহার মতবাদসংক্রান্ত অপরাপর কথা এই :—

১। অধিকারিভেদে ভাব ও সাধনার পথ ভিন্ন, লক্ষ্য এক।

২। বাহ্যিক অনুষ্ঠান অপেক্ষা আন্তরিক অনুষ্ঠানের প্রতি তাঁহার লক্ষ্য অধিক ছিল। এই কারণেই বাহ্যিক অনুষ্ঠান উপেক্ষণীয় কখনই বলিতেন না।

৩। সদাচার বা শাস্ত্রীয় আচার এবং লোকাচার সকলই তিনি প্রয়োজনীয় বলিতেন।

৪। শাস্ত্রাধ্যায়নে তিনি বিশেষ অনুরাগীই ছিলেন এবং তাহা করিতে উপদেশ দিতেন; সর্ব্বদাই ঠাকুরের কথা পুনরুক্তি করিয়া বলিতেন—'সখি! যাবৎ বাঁচি তাবৎ শিখি।'

৫। সর্ব্বজীবে 'ঈশ্বরজ্ঞানে' ভালবাসা তিনি নিজে অভ্যাস করিয়াছেন এবং সকলকে তাহা করিতে বলিতেন। তিনি বলিতেন, 'এমন স্পর্শমণি আর পাইবে না।' 'ভালবাসায় বদ্ধ হয় না—জীবন্মুক্ত হইয়া যায়।'

৬। 'গুরু ও বেদান্তবাক্যে বিশ্বাসই একমাত্র অবলম্বনীয়।' 'গুরুকৃপা ভিন্ন গত্যন্তর নাই।'

৭। 'ভক্তিপথে ভগবানকে সর্ব্বস্ব করিয়া রাখিতে হয়।'

ইহার অন্তরায় নিবারণের জন্য বলিয়াছেন ঃ—পুরুষকারেই পুরুষার্থপ্রকাশ'—তাহাতেই 'জয়লাভ'। 'তৃপ্তি অর্থে বিকার'। 'তৃপ্তি অবস্থায় জীবকে নিরুদ্যম, নিরুৎসাহ, অলসাক্রান্ত করিয়া থাকে।' 'ঈশ্বর করিয়া দিবেন—একথা ঝুট বাত'। 'তুমি কিছুই করিবে না,' 'ঈশ্বর আছেন, তিনি সকল করিয়া দিবেন—এ কুড়েমীর কথা।'

'(মন আমার) বিনা অনুভূতি,
লাভ কি হবে যতই পড় না বেদ ভাগবত পুঁথি॥'<br>'চিত্তশুদ্ধি শুদ্ধা বুদ্ধি না হ'লে সঙ্গতি
সে ধন কি মন পাবি কখন, ধ্যানে পায় না যোগী যতি॥'

'চিত্তসংযম,' 'বিশুদ্ধ চরিত্র' ও 'পবিত্রতা' দ্বারা 'আপনাকে সংশোধন করিয়া ভগবানের দিকে যাইতে হইবে।' 'যে পর্য্যন্ত আমরা বস্তু লাভ করিতে না পারিব, সে পর্য্যন্ত আমাদিগকে উঠিতে পড়িতে হইবে।' 'অভ্যাসে অসম্ভব কিছুই নহে।' 'নগদা মুটের কোন কালে শান্তি নাই।' 'ঈশ্বরে সম্পূর্ণ নির্ভর কি একেবারেই হয়?' 'কর্ম্মফল ভোগ করিতেই হইবে।'

'এক হাত সংসারে দেও, আর এক হাত ঈশ্বরের পাদপদ্মে রাখ।' 'সংসার তোমাকে ডুবাইতে পারিবে না।'

'ঈশ্বর প্রেমময়'—'তিনি আমাদের দুর্ব্বলতা দেখিয়া আমার ন্যায় দেহ ধারণ করিয়া নানা ক্লেশ সহ্য করিয়া বলেন, 'বৎস, ভয় নাই—তোমার মহাপাতক, অতিপাতক যাহা কিছু থাকে, আমাকে দেও, আমি আমার পবিত্রতা দিয়া তোমাকে পবিত্র করিব।'

নানা বিরুদ্ধ মতবাদের মধ্যে একটী মত যেমন সার্ব্বভৌম মত হয় না, কিন্তু সকল মতের সহিত অবিরোধে অবস্থিত সর্ব্বাবগাহী যে মতবাদ, তাহাই সার্ব্বভৌম মত হয়। সেইরূপ বেদের মধ্যে বিভিন্ন মতবাদগুলি কখন সার্ব্বভৌম মতবাদ হয় না। তবে বেদের সেই মতই সার্ব্বভৌমিক মত, যে মতে সকল মতের স্থান আছে—সকল মতের উপযোগিতা স্বীকার করা হয়। তাহাই বেদোক্ত সার্ব্বভৌম মত। আর বেদোক্ত এই মতটীই অদ্বৈত মত, এবং তাহাই শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ-দেবের মতবাদ। তাঁহার মতে অদ্বৈত মত চরম ও সর্ব্বশ্রেষ্ঠ মত হইলেও, দ্বৈত ও বিশিষ্টাদ্বৈত প্রভৃতি সকল মতেরই স্থান আছে—সাধনপথে সকল মতেরই উপযোগিতা আছে। কেহই মিথ্যা নহে। দ্বৈত ও বিশিষ্টাদ্বৈতাদি মতে বলা হয়—অদ্বৈত মতে নরক হয়; কারণ, তাহাতে 'জীবই ব্রহ্ম' বলা হয়। কিন্তু, অদ্বৈত মতে ঐ সকল

মতেরই ফল আছে—আবশ্যকতাও আছে। ঠাকুরও এই জন্যই অদ্বৈত মতকে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ মত বলিয়াছেন।

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণদেবের মত নানা জনে নানা ভাবে গ্রহণ করিয়াছেন। ঠাকুরের মতকে কেহ দ্বৈত, কেহ বিশিষ্টাদ্বৈত, কেহ দ্বৈতাদ্বৈত বলিয়াছেন। কিন্তু দেবেন্দ্রনাথ অদ্বৈত মতই ঠাকুরের মত বলিয়া গ্রহণ করিয়াছিলেন, আর তাহাই আমাদিগকে উপদেশ দিয়া গিয়াছেন। এই অদ্বৈতমতানুসরণেই মহাত্মা দেবেন্দ্রনাথের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ অধিকারিত্বের পক্ষে প্রমাণ। সমাধিবলে তিনি এই মতের সত্যতা ও শ্রেষ্ঠতা উপলব্ধি করিয়াছিলেন। দেবেন্দ্রনাথের উপদেশ ও মত তাঁহার সমাধিলব্ধ মত, তাহা ঠাকুরেরই মত।

পঞ্চত্রিংশ পরিচ্ছেদ

বিদায়গ্রহণ।

(বাং ১৩১৮, ইং ১৯১১)

বাল্যে—যিনি ধূলাখেলায় প্রমত্ত, কৈশোরে—যিনি বিদ্যাভ্যাসে বিরত, যৌবনে যিনি সংসারকার্য্যে উদাসীন, প্রৌঢ়ে—যিনি সংসারী ও ভীষণ দারিদ্র্যের সহিত সংগ্রামে সদাই বিব্রত, এবং ঈশ্বরলাভে ব্যাকুল হইয়া শ্রীরামকৃষ্ণপদাশ্রয়লাভে কৃতার্থ, তৎপরে শ্রীরামকৃষ্ণের অন্তরঙ্গ ভক্তগণের সঙ্গে যাঁহার ধর্ম্মজীবন পরিপুষ্ট, বার্দ্ধক্যে—যিনি জ্ঞানবৃদ্ধ ও ত্যাগী এবং পরোপকার ও ধর্ম্মপ্রচারে রত—সেই দেবেন্দ্রনাথ এইবার আপন জীবন-লীলা সমাপ্তপ্রায় জানিয়া অন্তিম পথে গমনের জন্য প্রস্তুত হইতে লাগিলেন।

দেবেন্দ্রনাথের বয়ঃক্রম এক্ষণে ৬৮ বৎসর। এই সময় তাঁহার শরীর তিল তিল করিয়া দিনের পর দিন ক্ষীণ হইতেই লাগিল। কোন দিন একটু সুস্থ থাকেন, আবার কোন দিন শ্বাসপ্রশ্বাসের কষ্টে এরূপ যন্ত্রণা ভোগ করিতে থাকেন যে, সে অবস্থা দর্শন করিলে পাষাণ-কঠোর হৃদয়েও আঘাত লাগিত। কিন্তু বড়ই আশ্চর্য্যের বিষয়, আমরা দেখিয়াছি যে, এমন অবস্থাতেও যদি কোন ব্যক্তি আসিয়া ভগবৎপ্রসঙ্গে কোন কথা তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিতেন, তখনই তাঁহার সমস্ত যন্ত্রণা যেন কোথায় অন্তর্হিত হইয়া যাইত; তিনি সবল, নীরোগ ব্যক্তির ন্যায় অনর্গল অক্লান্তিতে ঘণ্টার পর ঘণ্টা ধরিয়া কথা বলিতে থাকিতেন। আবার যেমন উক্ত

প্রসঙ্গ বন্ধ হইত, অমনি পূর্ব্ববৎ রোগযন্ত্রণাসমূহ আসিয়া পুনরাক্রমণ করিত।

জনসমাগমে দেবেন্দ্রনাথের হাঁপানির যন্ত্রণা অত্যন্ত বাড়িয়া যাইতে লাগিল দেখিয়া, ভক্তগণ স্থির করিলেন যে, তাঁহাকে কাহারও সহিত কথা কহিতে বা কাহাকেও তাঁহার চরণস্পর্শ করিতে দেওয়া হইবে না। একদিন কোন আগন্তুক ব্যক্তিকে তাঁহার চরণ স্পর্শ করিতে না দেওয়ায় সে ব্যক্তি অতি ক্ষুন্নমনে তাঁহার নিকট বসিয়া থাকেন। তদ্দর্শনে দেবেন্দ্রনাথ ভক্তদিগকে বলিয়াছিলেন,—"ওরে, এ শরীরটা লোকের কল্যাণের জন্যই আছে, ইহা তাহাদের মঙ্গলের জন্যই পাত হউক, আমাকে স্পর্শ করিতে তোরা কাহাকেও বারণ করিস্ না।"

দেবেন্দ্রনাথের শেষ রচনা।

দেবেন্দ্রনাথ এই অবস্থাতেই

"কৃপা কর মা ক্ষেমঙ্করি !
আমি দেখ্‌লাম কত বেয়ে চেয়ে
কিছুই ত করিতে নারি ॥"* ইত্যাদি

গানটী রচনা করেন। ইহাই তাঁহার রচিত শেষ গান।

এই সময়ে ভবানীপুর হইতে শ্রীযুত ললিতমোহন বসু † দেবেন্দ্রনাথের নিকট ঘন ঘন যাতায়াত করিতেন। দেবেন্দ্রনাথ ললিতমোহনকে বড় ভালবাসিতেন। দেবেন্দ্রনাথ তাঁহাকে একদিন বলিয়াছিলেন, "তোমার এখানে নয়, তুমি মঠে যাও"।

---

* দেবগীতি ৫৭ পৃঃ দ্রষ্টব্য।

† ললিতমোহনের এ সময় পাঠ্যাবস্থা। ইনি পরে সন্ন্যাস গ্রহণ করিয়া স্বামী কমলেশ্বরানন্দ নামে অভিহিত হন।

ইহাতে ললিতমোহন বলেন, "আমি সেখানে যাইবার পয়সা কোথায় পাইব ?"

দেবেন্দ্রনাথ বলিলেন, "আমি দিব। তুমি সন্ন্যাসীদের কাছে যাও।"

দেবেন্দ্রনাথের শেষ উৎসব।

১৩১৮ সালের বৈশাখ, ইং ১৯১১ সালের এপ্রেল মাসে গুড্ ফ্রাইডের ছুটীতে বার্ষিক উৎসব সম্পন্ন হয়। এই বৎসরের এই উৎসবই দেবেন্দ্রনাথের শেষ উৎসব। তিনি অসুস্থ শরীর লইয়াই উৎসবের যাবতীয় কার্য্য তত্ত্বাবধান করিলেন এবং দরিদ্রনারায়ণের সেবা সম্পন্ন হইয়া গেলে প্রসাদ গ্রহণ করিলেন। শ্রীশ্রীগৌরী মাতা, স্বামী প্রেমানন্দ, শ্রীযুত গিরিশ বাবু, ভাই ভূপতি, শ্রীযুত মহেন্দ্রনাথ গুপ্ত এবং শ্রীযুত মহেন্দ্রনাথ দত্ত প্রভৃতি এই উৎসবে উপস্থিত ছিলেন।

তাণ্ডব নৃত্য ও ভাব সমাধি।

বেলা বারোটা হইতে রাত্রি বারোটা পর্য্যন্ত হিন্দু, মুসলমান ও খৃষ্টীয়ান প্রভৃতি নানা সম্প্রদায়ের কীর্ত্তন আসিয়া উৎসবে গান করিয়া যাইতে লাগিল। সন্ধ্যার পর একদল কীর্ত্তন আসিয়া ঠাকুরের সম্মুখে গান আরম্ভ করিল; দেবেন্দ্রনাথ সেই গান শুনিয়া ভাবে মত্ত হইয়া কীর্ত্তনিয়াদের সহিত তাণ্ডব-নৃত্য করিতে আরম্ভ করিলেন। কীর্ত্তন এমনই জমিয়া গেল যে, অনেকক্ষণ পর্য্যন্ত সে নৃত্যেরও বিরাম নাই, আর সে গানেরও বিরাম নাই। তখন মনে হইল—যেন বসুন্ধরা টলমল করিতেছে। দেবেন্দ্রনাথের কতিপয় আশ্রিত ও ভক্ত ব্যক্তি ভাবে বিভোর হইয়া গেলেন; কেহ অনবরত ক্রন্দন, কেহ বা উচ্চহাস্য করিতে লাগিলেন; কেহ বা মাটীতে গড়াগড়ি

থাইতে লাগিলেন। এইরূপ চিত্তবিমোহন অপার্থিব দৃশ্য কচিৎ কখনও সৌভাগ্যক্রমে মানবের দৃষ্টিগোচর হয়।

এই সময় দেবেন্দ্রনাথ নৃত্য করিতে করিতে হঠাৎ কাষ্ঠপুত্তলিকাবৎ স্থির হইয়া গেলেন! তাঁহার এই ভাব স্থায়ী হইতেছে দেখিয়া ভক্তগণ চিন্তাকুল হইয়া পড়িলেন। কেহ কেহ মনে করিতে লাগিলেন—আজ বুঝি বা ঐ অবস্থাতেই দেবেন্দ্রনাথ দেহ পরিত্যাগ করেন। কেহ কেহ বা কাঁদিতে কাঁদিতে ঠাকুরের নিকট প্রার্থনা জানাইতে লাগিলেন। এই ভাবে বহুক্ষণের পর দেবেন্দ্রনাথের সংজ্ঞালাভ হইল; তিনি পূর্ব্বাবস্থা প্রাপ্ত হইলেন। ভক্তগণও ক্রমে ক্রমে প্রকৃতিস্থ হইয়া দেবেন্দ্রনাথসমীপে আসিয়া বসিলেন।

মান্দ্রাজী খৃষ্টীয়ান ভক্ত।

আষাঢ়ের শেষ ভাগে জনৈক মান্দ্রাজদেশীয় রোমান ক্যাথলিক্ খৃষ্টীয়ান শান্তিলাভের আশায় ঘুরিতে ঘুরিতে দেবেন্দ্রনাথের নিকট আসিয়া উপস্থিত হন। তিনি বাঙ্গালা বা হিন্দী জানিতেন না। দেবেন্দ্রনাথের সহিত ইংরাজীতে কথা বলিতে থাকেন। দেবেন্দ্রনাথ বিশুদ্ধ বা অনর্গল ইংরাজী বলিতে না পারায়, জনৈক ভক্ত তাহা শুদ্ধ করিয়া বলিতে থাকেন। ইহাতে মান্দ্রাজী ভদ্রলোকটী বলিয়াছিলেন, "আমি তাঁহার মুখের কথা হইতেই বেশ বুঝিতে পারিতেছি। তাঁহার কথার সহিত আমার ভিতর আলো আসিতেছে ইঁহার ঐরূপ ভাষাই আমার নিকট বেশ মিষ্ট বোধ হইতেছে। আমার চিত্ত দুর্ব্বল হইয়া গিয়াছিল, ইঁহার কথায় সবল হইল।" ভদ্রলোকটী ইহার পরেও কয়েকবার আসিয়াছিলেন।

দেবেন্দ্রনাথের শেষ রথোৎসব।

শ্রাবণ মাসে রথযাত্রার দিবস সমস্ত দিন দেবেন্দ্রনাথ শ্বাসকষ্টে নিতান্তই মুহ্যমান হইয়া পড়িয়াছিলেন। সন্ধ্যার সময় ঠাকুরকে রথে বসাইয়া টানিবার পূর্ব্বে যেমন গান আরম্ভ হইল, অমনি যেন তাঁহার সমস্ত অসুখ কোথায় চলিয়া গেল। তাঁহার মুখে দিব্যভাব পরিস্ফুট হইয়া উঠিল। দেবেন্দ্রনাথ মহানন্দে সকলকে লইয়া রথোৎসব সম্পন্ন করিলেন।

এই বৎসর ভাদ্রমাসে শ্রীযুক্ত মহেন্দ্রনাথ দত্ত মহাশয়ের মাতৃ-বিয়োগ ঘটে। এই সময় তিনি একদিন প্রাতঃকালে দেবেন্দ্রনাথের সহিত সাক্ষাৎ করিতে আগমন করেন। দেবেন্দ্রনাথ তখন হাঁপানিতে বড় কষ্ট পাইতেছিলেন। মহেন্দ্র (মহিম) বাবুকে পাইয়া তিনি এত আনন্দিত হইলেন যে, রোগযন্ত্রণা একেবারে বিস্মৃত হইয়া গেলেন। মহিম বাবু রোগের কথা জিজ্ঞাসা করিলে তিনি জোর করিয়া বলিতে লাগিলেন, "কার রোগ, কোথায় রোগ ?" তখন তাঁহার আনন্দ কে দেখে ?

এই সময় শ্রীযুত জিতেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় নামক জনৈক যুবক দেবেন্দ্রনাথের ভাব দেখিয়া আকৃষ্ট হন ও তাঁহার আশ্রয় গ্রহণ করেন।

'গাছ টলমল করছে'।

পূজার পূর্ব্বে, মহেন্দ্রকুমার আখাউড়া (ত্রিপুরা) হইতে অল্প-সময়ের জন্য আসিয়া দেবেন্দ্রনাথের সহিত শেষ সাক্ষাৎ করিয়া যান। তিনি দেবেন্দ্রনাথের নিকট উপবিষ্ট উপেন্দ্রনাথকে দেবেন্দ্রনাথ সম্বন্ধে বলেন—"কি দেখছেন, গাছ টলমল করছে। আপনারা সাবধান থাকবেন।" ইহাতে দেবেন্দ্রনাথ বলিয়াছিলেন,—"গাছ যদি টলমলই করে, তবে গাছতলা থেকে স'রে দাঁড়ালেই হল।"
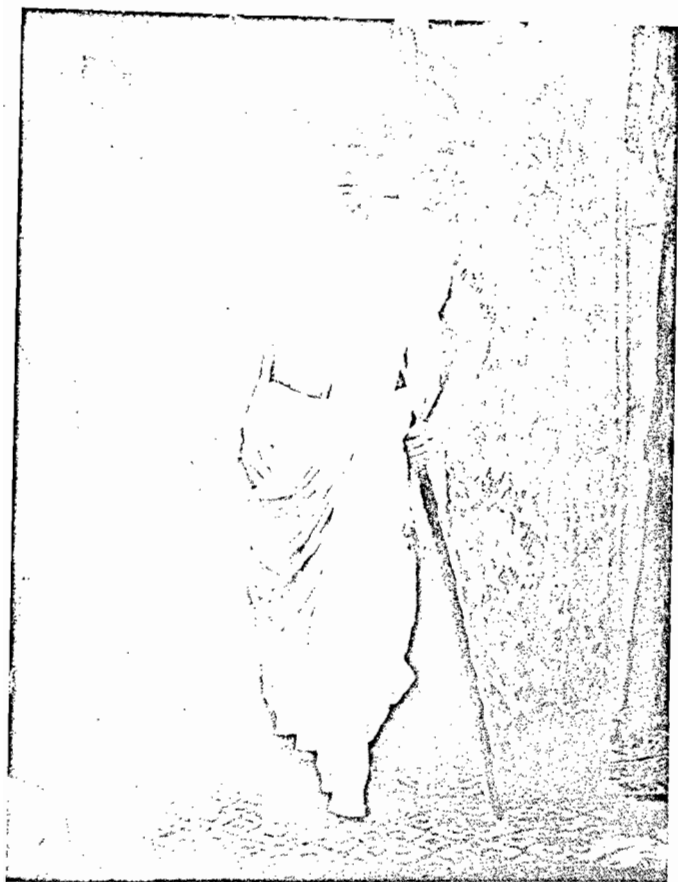
মহাপ্রস্থানের অল্প পূর্ব্বে—দেবেন্দ্রনাথ

'হাড়মাসের খাঁচাটা ভেঙ্গে গেলে, আপনার মত ক'রে গ'ড়ে নিও'।

দূরদেশস্থ প্রিয়জনগণ প্রায় সকলেই একে একে আসিয়া এই বৎসর একবার করিয়া দেবেন্দ্রনাথকে শেষ দেখা দেখিয়া যান। দেবেন্দ্রনাথ সকলকেই তাহার মহাপ্রস্থানের আভাস জানাইয়া তাঁহাদের নিকট হইতে বিদায় গ্রহণ করিতেন। বলিতেন—"আমার হাড়মাসের খাঁচাটা ভেঙ্গে গেলে, তোমরা আপনার মত ক'রে গ'ড়ে নিও। আমি তোমাদের সঙ্গেই থাকিব।"

'প্রেমই ঈশ্বর'।

পূজার পর প্রাণেশকুমার ঢাকা হইতে দেবেন্দ্রনাথকে দর্শন করিতে আসেন। তিন দিন অবস্থানের পর, ২১শে আশ্বিন, রবিবার কোজাগর-লক্ষ্মীপূজার রাত্রিতে তিনি যখন বিদায় গ্রহণ করেন, তখন দেবেন্দ্রনাথ বলিয়াছিলেন,—"আর দেহ থাকিতে নয়। ঈশ্বরদর্শন কিছু চতুর্ভুজ দেখা নয়, উহাতে ভুলিও না। বুকে একটু প্রেম এলেই ঈশ্বরদর্শনের সাধ মিটিবে—প্রেমই ঈশ্বর।"

———o———

ষট্‌ত্রিংশ পরিচ্ছেদ

মহাপ্রস্থান।

তিরোধান—১৩১৮ সালের ২৭শে আশ্বিন, শনিবার—ইং ১৯১১-১১ সেপ্টেম্বর।

২৪শে আশ্বিন, বুধবার, বৈকালে দেবেন্দ্রনাথ বাহিরে আসিয়া ভবানীপুরস্থ ও অন্যান্য স্থানের আশ্রিতগণকে উপদেশাদি দান করিয়া শ্রীশ্রীঠাকুরের আরতির পর বাটীর ভিতর গমন করেন এবং জনৈক সেবককে শরীরের তাপ দেখিতে বলেন। থার্ম্মোমিটারে দেখা গেল, সামান্য জ্বর হইয়াছে। এইরূপ জ্বর মধ্যে মধ্যে তাঁহার হইত। কিন্তু শরীরের গ্লানিবশতঃ দেবেন্দ্রনাথের সে রাত্রিতে নিদ্রা হইল না।

পরদিন প্রাতেও সেইরূপ জ্বর ছিল। সুরেন বাবুর হোমিওপ্যাথি ঔষধ চলিতে লাগিল। বৈকালে ৫টার সময় দেখা গেল, জ্বর ১০২ ডিগ্রী। অগত্যা পুনরায় সুরেন বাবুর নিকট হইতে ঔষধ আনীত হইল। যাহা হউক, জ্বর রাত্রি দেড় ঘটিকার সময় বিরাম হইল। তাহার পর দেবেন্দ্রনাথের বেশ সুনিদ্রা হইল।

শুক্রবার প্রাতে বাহিরে আসিয়া দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরকে প্রণাম করিয়া ভিতরে যাইয়া বলিলেন, "আজ বেশ ভাল আছি, কোনও গ্লানি নাই, জ্বরও নাই।" বেলা ১টার সময় তিনি তাঁহার ভ্রাতৃজায়াকে জিজ্ঞাসা করিলেন—"কালীপূজা কবে?" ভ্রাতৃজায়া বলিলেন, "৪ঠা কার্ত্তিক শনিবার।"

দেবেন্দ্রনাথ আবার জিজ্ঞাসা করিলেন, "আজ কি বার?" ভ্রাতৃজায়া বলিলেন—"শুক্রবার।" ইহার কিছুক্ষণ পরে দেবেন্দ্রনাথ এক গেলাস

জল আনাইলেন এবং প্রায় সমস্ত জলটা নাসিকা দ্বারা টানিয়া লইলেন। পরে উপস্থিত জনৈক ভক্তকেও বলিলেন, মাথা ধরিলে ঐরূপ জল টানিলে উপকার হয়।

'আর রাখতে পাচ্ছো না—এইবার শেষ'।

বেলা দেড়টার সময় দেবেন্দ্রনাথ জনৈক ভক্তকে সুরেন বাবুর নিকট যাইয়া মাথার অসুখের জন্য ঔষধ আনিতে বলিলেন। কিন্তু বেলা দুইটার সময় তাঁহার দেহে ভয়ানক কম্প উপস্থিত হইল। তিনি ভক্তটীকে কথায় কথায় বলিলেন,—"আর রক্ষা নাই, আর রাখতে পাচ্ছো না, এইবার শেষ।"

এই সময় দেবেন্দ্রনাথ অমলচন্দ্রকে জিজ্ঞাসা করিলেন—"অমল! আমার নামে কত টাকা ধার আছে—বলিতে পার?"

কাগজ পত্র দেখিয়া অমল বলিলেন, "২৪।২৫ টাকা হইবে।"

দেবেন্দ্রনাথ জনৈক ভক্তকে বলিলেন, "হাঁ রে, তুই আমার এই ঋণের ভার লইতে পারবি?"

ভক্তটী বলিলেন, "আজ্ঞে হাঁ, পারব।"

'ছেড়ে দেও, ছেড়ে দেও'।

এই সময়ে জনৈক ভক্ত তাঁহার পায়ে হাত বুলাইতে যাইলে, তিনি উচ্চৈস্বরে বলিলেন, "ছেড়ে দাও, ছেড়ে দাও।" ইহাতে উক্ত ভক্ত তাঁহার শয্যা সংস্পৃষ্ট বেঞ্চের উপর গিয়া বসিলেন। তদ্দর্শনে তিনি পুনরায় বলিয়া উঠিলেন—"আমার বিছানা ছেড়ে দাও—আমার বিছানা ছেড়ে দাও।" ইহাতে যে যেখানে তাঁহার বিছানার সংস্পর্শে ছিলেন, সকলেই তাড়াতাড়ি বিছানা ছাড়িয়া ঘরের মেজেয় বসিলেন।

'আমার প্রাণায়াম হচ্ছে—জয় জয় জয় !'

দেবেন্দ্রনাথ কৃষ্ণকুমারকে দেখিয়া বলিলেন—"দেখছিস্ কি, আমার প্রাণায়াম হচ্ছে।" ইহার কিছু পরেই তিনি তিনবার "**জয়! জয়!! জয়!!!**" ধ্বনি করিয়া উঠিলেন এবং বেলা ৩॥০ টার সময় একেবারে নির্ব্বাক্ হইয়া গেলেন। সকলেই ভাবিল, তাঁহার "ভাব সমাধির" আবির্ভাব হইয়াছে। ইহার পর তিনি আর কাহারও সহিত কোনরূপ বাক্যালাপ করেন নাই।

এই সময় দেবেন্দ্রনাথ কখন শুইয়া পড়িতেছিলেন, কখন বা ধ্যাননিমীলিতনেত্রে মেরুদণ্ড সোজা করিয়া স্থিরগম্ভীরভাবে উপবিষ্ট হইতেছিলেন।

হর্ষ, কম্প, পুলক, রোমাঞ্চ-শিবনেত্র।

সন্ধ্যার সময় যখন ঠাকুরের আরতি প্রায় শেষ হইয়া আসিয়াছে, তখন দেবেন্দ্রনাথের এমন একটা অবস্থা আসিল যে, বোধ হইল যেন, তাঁহার প্রাণবায়ু দেহ হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া যাইতেছে। বুঝি বা আরতি-শেষের সঙ্গে সঙ্গেই তাঁহার প্রাণবায়ু বহির্গত হয়। এই সময় দেখা গেল, দেবেন্দ্রনাথের কখন হর্ষ, কখন কম্প, কখন পুলক, কখন রোমাঞ্চ ও মধ্যে মধ্যে শিবনেত্র হইতেছে। আহা! সে দেবদৃষ্টির তুলনা নাই! মনে হইতে লাগিল, দেবেন্দ্রনাথ যেন ঠাকুরকে দেখিয়া কত হাসি হাসিতেছেন, আর মধ্যে মধ্যে তাঁহার চক্ষুতে আনন্দাশ্রু বহিতেছে।

এই অবস্থায় প্রায় ২২ ঘণ্টা কাটিয়া গেল। এই সময় দেবেন্দ্রনাথের বদনকমল হইতে মধ্যে মধ্যে অস্পষ্ট ওঁকারধ্বনি এবং গুরু-নামোচ্চারণের শব্দ শুনা যাইতেছিল।

ভক্ত ও চিকিৎসক-সমাগম।

দেবেন্দ্রনাথের পূর্ব্বাদেশ অনুসারে বেলুড়মঠে, এবং শরৎ মহারাজ, গিরিশ বাবু, মাষ্টার মহাশয় ও মহিম বাবু প্রভৃতিকে সংবাদ দেওয়া হইল। ভবানীপুর, শ্যামবাজার ও অন্যান্য স্থানের আশ্রিত ভক্তগণ এবং পরিচিতবর্গের মধ্যে যিনিই সংবাদ পাইলেন, তিনিই তৎক্ষণাৎ আসিয়া উপস্থিত হইলেন। তাঁহাদের তৎকালীন বিষণ্ণ মূর্ত্তি দেখিয়া মনে হইতে লাগিল, যেন সকলেই দেবেন্দ্রনাথকে শেষ বিদায় দিতে প্রস্তুত হইয়া আসিয়াছেন। ইতিমধ্যেই পল্লীর যাবতীয় ইতর ভদ্র সকলেই উপস্থিত হইয়াছিলেন। ক্রমে সুরেন্দ্র বাবু ও তাঁহার ভ্রাতৃগণও আসিয়া মিলিত হইলেন। ডাক্তার সুরেশচন্দ্র সরকার, ভক্তপ্রবর ডাক্তার কাঞ্জিলাল, ডাক্তার নগেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, ডাক্তার বারিদবরণ মুখোপাধ্যায়, কবিরাজ মহানন্দ ও পঞ্চানন্দ প্রভৃতি সকলেই উপস্থিত হইলেন। সকলেই দেখিয়া বলিলেন—"এ যে শেষ মুহূর্ত্ত দেখিতেছি!"

এই সময় স্বামী বিবেকানন্দের শিষ্য শ্রীযুক্ত উপেন্দ্রনারায়ণ দেব আসিলেন। তিনি নিজেই একটী কবিরাজ সঙ্গে করিয়া আনিয়াছিলেন। কবিরাজ দেবেন্দ্রনাথের অবস্থা দেখিয়া বলিলেন—"বোধ হইতেছে, ইনি আর এ দেহে ফিরিবেন না।"

পূজার ফুল ও চরণামৃত গ্রহণ।

উপেন্দ্রনারায়ণ রাত্রি দুইটার সময় পুনরায় আসিলেন এবং ঔষধ দিতে দেখিয়া বলিলেন—"কেন আর ঔষধ দিয়া কষ্ট দিচ্ছিস্? দেখছিস্‌নি, ঠাকুর ওঁর ভিতর পূর্ণমাত্রায় খেলা লাগিয়েছেন।" তাঁহার কথানুযায়ী ঠাকুরের চরণামৃত, পূজার ফুল প্রভৃতি দেবেন্দ্রনাথের কপালে, মাথায়, চোখে, মুখে, হৃদয়ে, কণ্ঠে ও নাভিতে দেওয়া

হইতে লাগিল। আশ্চর্য্যের বিষয়, ইহাতে তাঁহার শরীরে যেন বিদ্যুতের মত পুলক, কম্প ও রোমাঞ্চ আবার দেখা দিল। সকলেই দেখিয়া অবাক্!

সেবকগণের জনতা ক্রমেই বৃদ্ধি পাইতে লাগিল। সকলেরই ইচ্ছা—তাঁর কাছে শেষ পর্য্যন্ত থাকেন। এইভাবে রাত্রিপ্রভাত হইল এবং সেই 'কাল দিবা' আসিল।

অর্চ্চনালয়-তীর্থক্ষেত্র।

একে একে মহেন্দ্র মাষ্টার মহাশয় ও মহিম বাবু প্রভৃতি কলিকাতা হইতে আসিলেন। সুবোধ মহারাজ প্রভৃতি অনেকেই মঠ হইতে আসিয়া সমবেত হইলেন। দেবেন্দ্রনাথের এই অসুখের সংবাদ পাইয়াই তাঁহার প্রিয়জন ও কলিকাতাস্থ ঠাকুরের ভক্তগণ পূর্ব্বদিন হইতেই সমবেত হইয়াছিলেন। অর্চ্চনালয়ে ভক্ত ও ভক্তপরিবার আর ধরে না। দেবেন্দ্রনাথের ঘরে, বাহিরের ঘরে, উঠানে, ঠাকুরঘরের সম্মুখের রোয়াকে ও গলি প্রভৃতি সর্ব্বত্র ভক্তগণের জনতা। অন্তঃপুরও স্ত্রীভক্তে পরিপূর্ণ। যেন উৎসব-ক্ষেত্রে বা কোনও তীর্থক্ষেত্রে পর্ব্বোপলক্ষে বহু যাত্রীর সমাগম হইয়াছে!

এতক্ষণ সেবকেরা ভক্তগণকে দেবেন্দ্রনাথের গৃহে জনতা করিতে দিতেছিলেন না; আশা—যদি দেবেন্দ্রনাথ ফিরিয়া আসেন। কিন্তু এক্ষণে সে আশা উন্মূলিত হইল। সকলেই ভাবিল—'দেবেন্দ্রনাথ আমাদিগকে চিরতরে ছাড়িয়া চলিয়া যাইতেছেন। তাঁহার জীবনের আশা আর নাই। তবে আর কেন ভক্তগণকে দেবেন্দ্রনাথের শেষ দর্শন-স্পর্শন হইতে বঞ্চিত করা!' এই সময় জনৈক সেবক গদ্‌গদ কণ্ঠে বলিয়া উঠিলেন—"আপনাদের যাহার যাহা করিবার ইচ্ছা, যাহার

যাহা মনের সাধ, এইবার মিটাইয়া লউন। দেবেন্দ্রনাথ মহাপ্রস্থানে চলিয়াছেন।"

রামকৃষ্ণ নামধ্বনিতে পল্লী মুখরিত।

দেবেন্দ্রনাথের কোষ্ঠিতে তীর্থমৃত্যুর উল্লেখ ছিল। এক্ষণে তাহা বুঝি সত্য হইল। ঠাকুরবাড়ীতে এই ভক্তসমাগমে ও ঠাকুরের নাম-কীর্ত্তনে দেবেন্দ্রনাথের গৃহ সত্য সত্যই তীর্থে পরিণত হইয়াছে। ভক্তেরা কেহ ভূমিষ্ঠ হইয়া প্রণাম করিতেছে, কেহ বা দেবেন্দ্রনাথের চরণে মস্তক বিলুণ্ঠিত করিতেছে, কেহ বা তাঁহার পাদপদ্মদ্বয় লইয়া একবার মস্তকে, একবার হৃদয়ে ধারণ করিয়া অশ্রু জলে পাদপদ্ম বিধৌত করিতে লাগিল। অতঃপর আবালবৃদ্ধবনিতা সকলেই দেবেন্দ্রনাথকে ঘিরিয়া সমস্বরে "ওঁ নমো ভগবতে রামকৃষ্ণায়"—এই শ্রুতিসুখকর মধুরধ্বনিতে পল্লী মুখরিত করিয়া তুলিল। কি জানি, এই ধ্বনি শুনিয়াই বোধ হয়—দেবেন্দ্রনাথের সর্ব্বাঙ্গে ও বদনমণ্ডলে বিমল জ্যোতিঃ ফুটিয়া উঠিল। আহা! সে কি অপূর্ব্ব দৃশ্য! বোধ হইল, যেন দধীচি মুনি পরহিতের জন্য শিষ্যগণ-পরিবেষ্টিত হইয়া তনু ত্যাগ করিতেছেন। ঠাকুরের নামধ্বনি ও ভাবভক্তিতে অর্চ্চনালয় বৈকুণ্ঠবৎ পুণ্যময় বোধ হইতে লাগিল।

একটা পঞ্চান্ন মিনিটে দেবেন্দ্রনাথ মহাসমাধিস্থ।

বেলা একটা বাজিল। এক দুই করিয়া ৫৪ মিনিটও কাটিল। এইবার সেই কাল ৫৫ মিনিট আসিল। মহাভক্ত দেবেন্দ্রনাথের শেষবার শিবনেত্র হইল, এবং গাত্র রোমাঞ্চিত হইয়া সর্ব্বাঙ্গ কম্পিত হইতে লাগিল, দুই চক্ষুতে অবিরলধারায় আনন্দাশ্রু বহিতে লাগিল। দেবেন্দ্রনাথ, ভগবান্ শ্রীরামকৃষ্ণের নামধ্বনির মধ্যে শেষ নিঃশ্বাস

পরিত্যাগ করিলেন এবং চিরতরে মহাসমাধিতে সমাধিস্থ হইলেন। আহা! সে কি—এক অপূর্ব্ব দৃশ্য! কেহ ঠাকুরের ছবি লইয়া দেবেন্দ্রনাথের মস্তকে ধরিয়া আছেন, কেহ বা পদ-প্রান্তে উপবিষ্ট, কেহ বা অনিমেষনেত্রে দণ্ডায়মান! ক্ষণকালের জন্য সকলেই যেন চিত্রপুত্তলিকাবৎ সংজ্ঞাহীন!

কিয়ৎকাল পরে দেবেন্দ্রনাথের পবিত্র দেহ তাঁহার শয়নকক্ষ হইতে বক্ষে ধারণ করিয়া ঠাকুরের ঘরের সম্মুখের রোয়াকে শায়িত করা হইল। বহু ভক্ত দেবেন্দ্রনাথের শ্রীপাদপদ্মে আলতা দিয়া শ্রীচরণের ছাপ লইলেন। অতঃপর ভক্তগণ দেবেন্দ্রনাথকে নূতন গরদের কাপড় পরাইয়া, গলায় চাদর ও বিবিধ সুবাসিত কুসুমের গোড়ে মালা দিয়া এবং কপালে চন্দন ও ⁄বিশ্বনাথের ভস্ম লেপন করিয়া দেবেন্দ্রনাথকে অপূর্ব্বসাজে সাজাইলেন। জনৈক ভক্ত তাঁহার বক্ষে ও কপালে "শ্রীরামকৃষ্ণ" নাম লিখিয়া দিলেন। শবদেহে শিবরূপ যেন প্রস্ফুটিত হইয়া উঠিল!

দিব্যদেহ পালঙ্কোপরি সজ্জিত।

ইহার পর একখানি উত্তম নূতন পালঙ্ক আনা হইল। বস্ত্র বলিয়া তাহা অর্চ্চনালয়ের সম্মুখের গলিতে রাখা হইল। অবিলম্বে বিবিধ পত্র-পুষ্প ও মাল্য দ্বারা উহা উত্তমরূপে সাজাইয়া, এবং উত্তম শয্যাদ্বারা সুশোভিত করা হইল। অতঃপর দেবেন্দ্রনাথের দেহ ধীরে ধীরে উহাতে স্থাপিত করা হইল। এইবার অপরাপর শিষ্যবর্গ নিজ নিজ সাধ মিটাইয়া শ্রীগুরুর চরণে চন্দন, আলতা, পুষ্প প্রভৃতি দিয়া সাজাইতে লাগিলেন। শয্যোপরি সুগন্ধি দ্রব্য সকল ছড়াইয়া দেওয়া হইল; কোনও অনুষ্ঠানেরই ত্রুটি হইল না। আহা! শেষ শয্যায় দেবেন্দ্রনাথের কি অপূর্ব্ব শোভা! এ দিব্য শোভার কি তুলনা আছে?

অতঃপর তাঁহার মস্তকোপরি ঠাকুরের ছবি রাখিয়া তাহা পুষ্পমাল্য দ্বারা সুশোভিত করা হইল। বোধ হইল যেন শ্রীশ্রীঠাকুর নিজ প্রিয় শিষ্যকে সঙ্গে লইয়া স্বধামে শুভ যাত্রা করিতেছেন।

মহাযাত্রার দৃশ্য।

দেবেন্দ্রনাথের তপঃপূত দিব্যদেহ ভবানীপুরের শিষ্যবর্গের অভিপ্রায় অনুসারে সংকারের জন্য কালীঘাটে লইয়া যাওয়া স্থির হইল। প্রায় শতাধিক ভক্ত মিলিত হইয়া অর্চ্চনালয়ে ঠাকুরের নিত্য আরতির সময়ে যে নামকীর্ত্তন হয়, খোল-করতালসহ সেই নামকীর্ত্তন করিতে করিতে—খই ও পয়সা ছড়াইতে ছড়াইতে দেবেন্দ্রনাথের সেই দিব্য দেহ লইয়া ৺দেবনারায়ণ দেব প্রতিষ্ঠিত শিবমন্দিরের সম্মুখ দিয়া, পদ্মপুকুর ও বেণেপুকুরের ভিতর দিয়া চলিতে লাগিলেন। দেবেন্দ্রনাথের এই মহাযাত্রার দৃশ্য এক অপূর্ব্ব দৃশ্য হইল। দেবেন্দ্র-নাথের সেই উজ্জ্বল তপ্তকাঞ্চনের ন্যায় বর্ণ, শ্বেতচন্দনের সঙ্গে মিশিয়া এক অতি অপরূপ শ্রীধারণ করিয়াছে। অলক্তরঞ্জিত পাদপদ্মদ্বয় ও তাহার চতুষ্পার্শ্বে রক্তপদ্মরাশি—যেনপ রস্পর পরস্পরকে অপ্রতিভ করিতেছে।

এই দৃশ্য দেখিয়া হিন্দু, মুসলমান, ইহুদী, খৃষ্টীয়ানগণও স্ব স্ব প্রথানুযায়ী অভিবাদন করিতে লাগিলেন। ইংরাজ পুরুষ ও রমণীগণও টুপী খুলিয়া সম্মান জানাইলেন। অনেক অপরিচিত ভদ্রলোকও সঙ্গে সঙ্গে চলিলেন। কত লোক তাঁহাকে একবার স্পর্শ করিয়া চরিতার্থ হইয়াছিলেন। বহু পথিকই "ইনি কে" জানিবার জন্য আগ্রহ প্রকাশ করিতে লাগিল। কেহ বলিল—"ইনি কোথাকার রাজা"। আবার কেহ বা তাহার প্রতিবাদ করিয়া বলিল, "না রে, ইনি কোথাকার

রাণী হইবেন, দেখছিস না—পায়ে আলতা, গোঁফ নাই।” কেহ বা উৎসুক হইয়া “এ মহাপুরুষের নাম কি ? ইনি কোথায় থাকিতেন ?” ইত্যাদি অনেক প্রশ্নই জিজ্ঞাসা করিতে লাগিল।

এইভাবে পথ চলিতে চলিতে দেবেন্দ্রনাথের ভক্ত ও শিষ্যগণ শিবত্বপ্রাপ্ত দেবেন্দ্রনাথের শবদেহ লইয়া ভবানীপুরে স্বর্গীয় নফরচন্দ্রের স্মৃতিস্তম্ভের নিকট উপস্থিত হইলেন। তথায় সকলে নফরচন্দ্রের প্রতি সম্মানপ্রদর্শন করিয়া ৺কালীঘাটে নকুলেশ্বরতলা ও মায়ের মন্দির ঘুরিয়া বরাবর মন্দিরের সম্মুখের রাস্তা ধরিয়া আদিগঙ্গাতীরস্থ কেওড়াতলা মহাশ্মশানে উপস্থিত হইলেন। সকলের মনে হইল—যেন কোন দেব-বিগ্রহকে মন্দির হইতে মন্দিরান্তরে স্থানান্তরিত করা হইতেছে। পূজ্যপাদ মাষ্টার মহাশয় ও মহিম বাবু প্রভৃতি সকলেই সঙ্গে সঙ্গে নগ্নপদে আসিয়াছিলেন।

নিশীথে নিস্তব্ধ শ্মশানক্ষেত্রের শোভা।

শ্মশানে উপস্থিত হইলে আবার অনেক নূতন ভক্তের সমাগম হইল; শ্মশান লোকে লোকারণ্য! নিশীথে সেই নিস্তব্ধ শ্মশানক্ষেত্র যেন আলোকমালায় পরিবেষ্টিত মহা সমৃদ্ধিশালী উৎসবপূর্ণ নগরের ন্যায় বিরাজমান হইল। এত জনসমাগমে শ্মশানের নিস্তব্ধতা কোথায় দূর হইয়া গেল। অনবরত ‘মা’র নাম এবং “ওঁ রামকৃষ্ণ” এই দুই নামে সেই স্থান মুখরিত হইয়া উঠিল। শত শত নরনারী তাঁহার সেই সৌম্যমূর্ত্তি দর্শন ও স্পর্শন করিতে লাগিল। কেহ বা তাঁহার পদদ্বয় একবার শিরে, একবার হৃদয়ে ধারণ করিয়া নিজেকে কত কৃতার্থ ও ধন্য বোধ করিতে লাগিল। অনেকে আবার তাঁহার পদধূলি লইল এবং তাঁহার শ্রীচরণের প্রসাদী পুষ্প সংগ্রহ করিয়া অঞ্চলে বাঁধিয়া

লইয়া গেল। ভক্তগণ তাঁহার পবিত্রদেহ ঘিরিয়া কীর্ত্তন করিতে লাগিলেন। ঠিক যেন সকলে তুলসীবৃক্ষ প্রদক্ষিণ করিয়া অষ্ট প্রহর নামসংকীর্ত্তন করিতেছেন। "জয় রামকৃষ্ণ" নামরোলে দিগন্ত প্রতিধ্বনিত হইতে লাগিল। ইহার পর ভক্ত ও শিষ্যগণ আশ মিটাইয়া তাঁহাদের গুরুদেবকে শেষ পুষ্পাঞ্জলি অর্পণপূর্ব্বক আরতি করিলেন।

রাত্রি একটার সময় সব শেষ।

শ্রদ্ধেয় মহিম বাবুর অভিপ্রায় অনুসারে খাটের মাপে নূতন স্থানে এক নূতন চুল্লী প্রস্তুত করিয়া চন্দনকাষ্ঠ, ঘৃত ও ধূনাদি দ্বারা অপূর্ব্ব চিতা-শয্যা সজ্জিত হইল। অতঃপর সেই পালঙ্কোপরি সাজান-বাগান হইতে ঠাকুরের ছবিখানি খুলিয়া লইয়া দেবেন্দ্রনাথের সুসজ্জিত দেহ পালঙ্ক-সহিত চিতার উপর রক্ষিত হইল। সর্ব্বভুক্ অগ্নিদেব অল্প সময়ের মধ্যেই সেই দেবকান্তিবিশিষ্ট স্থূল শরীর গ্রাস করিয়া ফেলিলেন। দেবেন্দ্রনাথের পাঞ্চভৌতিক দেহ পঞ্চভূতে বিলীন হইল। রাত্রি একটার সময় সব শেষ হইল! দেবেন্দ্রনাথের জীবনপ্রদীপ চিরতরে নির্ব্বাপিত হইল!

দেবেন্দ্রনাথের আশ্রিতবর্গ প্রায় দুই ঘণ্টাকাল ধরিয়া প্রত্যেকে ক্রমান্বয়ে চিতায় এক কলসী করিয়া গঙ্গাজল ঢালিয়া তদীয় দেহাস্থি সংগ্রহ করিলেন এবং অদ্যাবধি তাঁহারা অর্চ্চনালয়ে তাহার নিত্য-নৈমিত্তিক পূজা করিতেছেন।

সংকারসমাপনান্তে কালীঘাটে মায়ের চরণপ্রান্তে প্রবাহিতা আদিগঙ্গায় যখন সকলে স্নান করিয়া উঠিলেন, তখন সকলেরই মনে হইতে লাগিল, যেন কোন যোগ-উপলক্ষে এই গভীর নিস্তব্ধ নিশিতে এত লোক একত্র হইয়া গঙ্গাস্নান করিতেছেন। অতঃপর সকলে শূন্যমনে রাত্রি তিনটার সময়ে ঘরে ফিরিলেন। প্রত্যাগমন-

কালে মনে হইতে লাগিল, যেন দশমী পূর্ণ না হইতেই সপ্তমীতেই সোনার প্রতিমা বিসর্জ্জন দিয়া সকলে ঘরে ফিরিতেছেন।

অন্তিমের শেষ দৃশ্য দেবেন্দ্রনাথ যে কি দেখাইয়া গিয়াছেন, তাহা যিনি দেখিয়াছেন, তিনিই বুঝেন! যাঁহারা ভাগ্যবান্, এ দৃশ্য দেখিয়া ও বুঝিয়া তাঁহারা তাঁহাদের হৃদয়ে আঁকিয়া রাখিয়াছেন, ধ্যান করিয়া কৃতার্থ হইতেছেন। সে দৃশ্য কল্পনারও অতীত, অতি সুন্দর, অতি মনোরম—দুঃখব্যঞ্জক অথচ শান্তি ও বৈরাগ্যদায়ক।

আলেখ্য স্থাপন ও পূজা।

দেবেন্দ্রনাথের শিষ্যেরা অর্চ্চনালয়ে তাঁহার শয়নকক্ষে পালঙ্কের উপর তাঁহার আলেখ্য সযত্নে ও সম্মানের সহিত সাজাইয়া রাখিয়াছেন। তাঁহার ব্যবহৃত দ্রব্যাদি ও পাদুকা প্রভৃতিও তাঁহার শিষ্যবর্গ সযত্নে রক্ষা করিতেছেন। শ্রীশ্রীঠাকুরের সেবাদি কার্য্যও ভক্তেরা পূর্ব্ববৎ করিতেছেন।

শ্রীশ্রীমার আশ্বাসবাণী।

ভক্তমুখে দেবেন্দ্রনাথের তিরোধানবার্ত্তা শুনিয়া শ্রীশ্রীমা বলিয়াছিলেন—"অধীর হইও না, দেবেন্দ্র যায় নাই, ঠিক্ আছে; তাঁর কাজকর্ম্ম পূর্ব্ববৎ কর"। শ্রীশ্রীমার এই আশ্বাসবাণী প্রত্যেক ভক্তকে চিরদিন হৃদয়ে বল দান করিতেছে। বাস্তবিক পক্ষে, "আমার প্রাণের-দেবতা আমার সঙ্গেই আছেন; সম্মুখে, পশ্চাতে, অধঃ, ঊর্দ্ধে, আশে-পাশে, চারিদিকে তিনি বিরাজমান"—এরূপ মনে করিলে আর কি তাঁহার অভাববোধ থাকে?

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণোৎসব।

দেবেন্দ্রনাথের শিষ্যগণ প্রায় আটশত টাকা ব্যয় করিয়া তাঁহার ঔর্দ্ধদেহিক ক্রিয়াদি বিশেষ সমারোহপূর্ব্বক সুসম্পন্ন করিয়াছিলেন।

সকলেই দশ দিন নগ্নপদে থাকিয়া ও নিরামিষ ভোজন করিয়া যথারীতি শ্রদ্ধা-ভক্তি প্রদর্শন করিয়াছিলেন। এতদুপলক্ষে ১২ই কার্ত্তিক, রবিবার শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণোৎসব হইয়াছিল। এই উৎসবে সকাল হইতে শ্রীশ্রীঠাকুরের বিশেষ পূজা, নামসংকীর্ত্তন ও প্রায় তিন শত সাধু ও ভক্তকে উত্তমরূপে সেবা করান হইয়াছিল। বেলুড়-মঠ হইতে স্বামী প্রেমানন্দ ও কয়েকজন সন্ন্যাসী, ব্রহ্মচারী এবং ভক্ত আসিয়াছিলেন। অপরাহ্নে প্রায় দুই হাজার কাঙ্গালীকে পরিতোষরূপে লুচি, মিষ্টান্ন প্রভৃতি ভোজন করাইয়া উৎসব সমাধা করা হয়।

মহাত্মা দেবেন্দ্রনাথের আবির্ভাবে গৌরবান্বিত তাঁহার জন্মভূমি যশোহরের অধিবাসী ভক্তবৃন্দ এই উৎসবে সমাগত জনসাধারণকে একটী কবিতাসহ দেবেন্দ্রনাথের সুন্দর ছবি উপহার প্রদান করিয়াছিলেন।*

যে কিছু রহিল ত্রুটি করিতে বর্ণন,
তব প্রেমগুণে দেব! হউক পূরণ।
অবয়ব-রেখামাত্র হইল অঙ্কিত;
নিজ নিজ কল্পনায়,
যোগ্যবর্ণ যোজনায়,
ভাবুকে করিবে পট পূরিত রঞ্জিত;—
দেবেন্দ্র মূরতি যথা হবে মনোনীত!

সমাপ্ত

* ১৩১৮ সালের অগ্রহায়ণের 'তত্ত্বমঞ্জরী' হইতে পরিবর্ত্তিতাকারে এই বর্ণনা গৃহীত হইয়াছে।

দেবেন বাবু আমাকে নিরতিশয় স্নেহ করিতেন এবং কনিষ্ঠ ভ্রাতার ন্যায় দেখিতেন। আমিও দেবেন বাবুকে সেইরূপ ভালবাসিতাম ও শ্রদ্ধাভক্তি করিতাম। আমার সেই ভালবাসা ও শ্রদ্ধাভক্তি প্রকাশ করিবার জন্য পুষ্পাঞ্জলি-স্বরূপ তাঁহার সম্বন্ধে দুই চারিটী কথা লিপিবদ্ধ হইল।—

শ্রীমহেন্দ্রনাথ দত্ত।

দেবেন বাবু

মহাত্মা দেবেন্দ্রনাথ সম্বন্ধে যৎকিঞ্চিৎ

মহাপুরুষদিগের জীবনে এইটী দেখিতে পাই যে, কাহারও শক্তি জীবনের প্রথমেই প্রস্ফুটিত বা বিকশিত হয়; অল্প দিনের মধ্যে নিজের প্রতিভাবলে নানাবিধ কার্য্য করিয়া জগতের অনেক কল্যাণ সাধন করিয়া ইহধাম হইতে চলিয়া যান। ইহাকে বলে early development বা জীবনের প্রথমাবস্থায় শক্তির বিকাশ।

কিন্তু অনেক স্থলে দেখিতে পাই যে, ভিতরে মহতী শক্তি থাকিলেও বাহ্যিক নানা কারণ বশতঃ সেই শক্তি প্রস্ফুটিত বা বিকশিত হইবার কোন সুযোগ ঘটিয়া উঠে না। জীবনের প্রথম অবস্থাটা সাধারণ লোকের ন্যায় নগণ্য হইয়া থাকে। কেবল মাত্র তীক্ষ্ণদৃষ্টিসম্পন্ন ব্যক্তি এই সকল লোকের অন্তর্নিহিত শক্তির পরিচয় পাইয়া ভবিষ্যৎ জীবনদৃষ্টে তাঁহাদিগকে প্রশংসা করিয়া যান। সাধারণ লোকের নিকট ইঁহারা তখন নগণ্য হীন লোক বলিয়া প্রতীত হন। কিন্তু কালক্রমে যখন সময় আসে ও নানাবিধ অন্তরায় কিঞ্চিৎ বিদূরিত হয়, সেই সময় ইঁহাদের অন্তর্নিহিত সুষুপ্তশক্তি জাগ্রত হইয়া সকলকে বিমোহিত করে। ঠিক্ যেন পূর্ব্ব দিনে অর্দ্ধসুপ্ত ছিলেন, প্রভাতকালে নিদ্রাভঙ্গের পর জ্ঞানী হইয়া উঠিলেন। ইহাকে বলে late development বা পরবর্ত্তী কালে শক্তির বিকাশ।

বহু মহাপুরুষেরই জীবনের শেষভাগে শক্তি বিকশিত হইয়া থাকে। সমগ্র জীবন পর্য্যালোচনা করিলে, কয়েক বৎসর পূর্ব্বে বা পরে শক্তি বিকশিত হওয়ায় কিছুই আসিয়া যায় না। শুধু লক্ষ্যের

বিষয়—অন্তরাত্মা সেই বিশিষ্ট দেহে জগতের কল্যাণের জন্য কিরূপ শক্তি বিকাশ করিয়াছে, এই মাত্র। এই প্রসঙ্গে ইহাই বিশেষভাবে আলোচিত হইবে।

প্রথম সাক্ষাৎ—১৮৭৬ সাল।

ইং ১৮৭৬ সালে কলিকাতা ৩ নং গৌরমোহন মুখার্জ্জি ষ্ট্রীটে একটী যুবক বাবু আসিতেন। তিনি আমার ছোট কাকা ৺তারকনাথ দত্তের কাছে জমিদারী সেরেস্তার কাগজপত্র লইয়া যাইতেন এবং তাঁহার বৈঠকখানায় বসিয়া মামলা মোকর্দ্দমার কথা কহিয়া নীচে আসিয়া সাধারণ ভাবে সকলের সহিত কথা বার্ত্তা করিতেন। চেহারা হ্রস্বও নয়, দীর্ঘও নয়, মাঝামাঝি। শরীর সুগঠিত ও সৌম্যমূর্ত্তি, রং সুন্দর, বিশিষ্টভাবে উজ্জ্বল, পরনে কোঁচান ধুতি এবং বাম স্কন্ধে কোঁচান উড়ানি, বক্ষের উপর উপবীত। গ্রীষ্মকাল, এজন্য গায়ে পিরান বা অন্য কিছু আবরণ থাকিত না। লোকটী উপস্থিত হইলে তাঁহার উপর সকলের দৃষ্টি পড়িত। কথাবার্ত্তা সব সময় হাসিমুখে এবং সকলের সহিত যেন আত্মীয়তা করিতে ইচ্ছা। এইজন্য আমরা সকলেই লোকটীর প্রতি আকৃষ্ট হইয়াছিলাম।

সরকারদিগের ঘর হইতে কখনও কখনও তাঁহাকে তামাক সাজিয়া দেওয়া হইত। তিনি হুকা টানিতেন এবং দালানে তক্তাপোষে বসিয়া প্রায়ই নস্য লইতেন ও নরেন্দ্রনাথ প্রভৃতিকে নস্য লইতে শিখাইতেন। পিতা এবং কাকা উকিল, বাড়ীতে সর্ব্বদাই বহু লোক আসিয়া থাকে, কিন্তু তাহাদের সহিত আমাদের কারুর বড় ঘনিষ্ঠতা বা মেশামিশি হইত না। কিন্তু এই ব্যক্তির সহিত আমাদের বেশ একটা আত্মীয়তা হইল। তখন আমার বয়স অল্প। আট নয় বৎসরের অধিক হইবে

না। পরে জানিলাম এই ব্যক্তির নাম দেবেন্দ্রনাথ মজুমদার। ইনি গুণেন্দ্রনাথ ঠাকুরের তরফের কর্ম্মচারী।

লোকটীকে দেখিতাম—বাহিরে যেন জমিদারের কর্ম্মচারী, মামলা মোকর্দ্দমা বিষয়ে কথা কহিয়া থাকেন, কিন্তু তাঁহার ভিতরটা ভালবাসায় ভরিয়া রহিয়াছে; কাহারও প্রতি বিশিষ্টভাবে নহে, সকলের প্রতিই ভালবাসা ফেলিতে চেষ্টা করিতেছেন। কিন্তু অবস্থার বৈগুণ্যে যেন সেই ভালবাসা বিকশিত হইতে পারিতেছে না। লোকটী যেন সেই জন্য মরমে মরিয়া রহিয়াছেন।

ছোট শিশু এই সকল ভাব অতি শীঘ্রই বুঝিতে পারে। অন্তর-শুষ্ক ব্যক্তির কাছে শিশু যায় না, অন্তর স্নেহপূর্ণ হইলেই শিশু সেই ব্যক্তির কাছে যায়। শিশুই হইতেছে মানুষপরীক্ষা করিবার বিশেষ যন্ত্র। দেবেন বাবুর এই আকর্ষণী শক্তি আমরা অতি শৈশবেই অনুভব করিতাম এবং কখন তিনি ছোট কাকার ঘর হইতে ফিরিয়া অসিবেন, সেজন্য তাঁহার প্রতীক্ষায় থাকিতাম ও হুড়াহুড়ি করিয়া তাঁহার কাছে গিয়া নস্য লইতাম। আবশ্যক অনাবশ্যক কোন কারণে নয়, একটা আত্মীয়তা স্থাপন করিবার জন্য একটু নস্য লইতাম। তাঁহাকে আমাদের খুব ভাল লাগিত। ইহাই হইল আমাদের শৈশবের কথা। এইরূপ ভাবে কয়েক বৎসর চলিয়াছিল। অমরা লোকটীকে বাড়ীর লোক বলিয়া গণ্য করিতাম।

ভক্তবীর রামচন্দ্র দত্ত মহাশয়ের বাড়ীতে দেখা।

রাম দাদার বাড়ীতে গর্ম্মীকালে পরমহংস মহাশয় আসেন। আমি সন্ধ্যার সময় গিয়া দেখি, বাড়ীর অনেকেই আগে গিয়াছেন। রাম দাদার বাড়ীতে ঢুকিয়াই ডান দিকের বড় ঘরটীতে তৃতীয় দরজার

সম্মুখে ঢালা তক্তাপোষের উপর পরমহংস মহাশয়ের বসিবার স্থান হইয়াছে। তিনি পিছনে তাকিয়া করিয়া বসিয়া আছেন, মাঝে মাঝে একটী বেটুয়া হইতে একটু মশলা লইতেছেন। চোখ পিট্ পিট্ করিয়া চাহিতেছেন—কথা জড়ান ভাষা, উচ্চারণে কলিকাতার ভাষার সহিত বিশেষ পার্থক্য। আমি প্রণাম করিয়া পরমহংস মহাশয়ের পায়ের দিকে দরজার নিকটে তক্তাপোষের উপর বসিলাম এবং দেখিলাম, দ্বিতীয় দরজার মধ্যস্থলে আমাদের সেই পুরাতন পরিচিত ব্যক্তিটী বসিয়া আছেন।

তখন তিনি আর যুবা নহেন, প্রৌঢ় হইয়াছেন। লাবণ্য ও সৌন্দর্য্য আছে। তবে যুবাকালের সেই রূপ, অঙ্গসৌষ্ঠব বা কান্তি নাই। লোকটী দেওয়ালের দিকে পিঠ দিয়া পরমহংস মহাশয়ের দিকে মুখ করিয়া অতি স্থির, সংযতভাবে বসিয়া আছেন। কোন কথাবার্ত্তা নাই, কোন প্রশ্ন নাই, তন্ময় হইয়া বসিয়া আছেন। চক্ষু উন্মীলিত, কিন্তু দৃষ্টি অন্তর্মুখী, যেন লোকটীর অন্তর-আত্মা বা মন দেহ ছাড়িয়া অন্যত্র কোথায় চলিয়া গিয়াছে, দেহটা পড়িয়া রহিয়াছে মাত্র। মুখে খুব ভক্তির ভাব—গভীর ধ্যানের আভা বিকাশ পাইতেছে। দেখিয়া বড়ই মধুর দৃশ্য বলিয়া বোধ হইল। আমি ফিরিয়া ফিরিয়া এক এক বার পরমহংস মহাশয়ের দিকে চাহিতে লাগিলাম এবং এক এক বার সেই ধ্যানমগ্ন লোকটীর দিকে চাহিতে-ছিলাম। যত দেখিতে লাগিলাম ততই ফিরিয়া ফিরিয়া আবার দেখিতে ইচ্ছা হইতে লাগিল।

ঘরে অপর সকলে বসিয়া আছেন, কেহ কিছু কথা বলিতেছেন, কেহ পাখা দিয়া বাতাস করিতেছেন, কেহ বা ফাই-ফরমাইস করিতেছেন। সকলেরই চঞ্চল ভাব, কিন্তু এই লোকটীরই দেখিলাম

গভীর তন্ময় ভাব—নিঃস্পন্দ মোমের পুতুলটীর মত পরমহংস মহাশয়ের দিকে চাহিয়া রহিয়াছেন। কোঁচান চাদরখানি উভয় উরুতের উপর রাখিয়াছেন। গলায় শুধু পৈতা গাছটী। চাদর কাপড় বেশ ফর্সা এবং পরিষ্কার ভাবে কোঁচান। পরিহিত কোঁচান কাপড় ও চাদরে কেমন একটা শিল্পনৈপুণ্য ছিল।

পরমহংস মহাশয় আহার করিলে পর, উপরকার ছাদের উপর সকলকার খাইবার ঠাঁই হইল এবং আমরা সকলে গিয়া আহারাদি করিলাম। এইরূপে রাম দাদার বাড়ীতে পরমহংস মহাশয় যখন আসিতেন, দেবেন বাবুকেও তথন দেখিতাম। তখন হইতে বুঝিলাম—যদিও তিনি গুণেন্দ্রনাথ ঠাকুরের জমিদারীতে কর্ম্ম করিতেন, তথাপি পরমহংস মহাশয়ের প্রতি বিশেষ অনুরক্ত এবং সেই জন্যই রাম দাদার বাটীতে ঐরূপ লোকসমাগম হইলে তিনিও আসিতেন।

গ্রীষ্মকাল ১৮৮৪ সালের সন্ধ্যার সময় নরেন্দ্রনাথকে ডাকিতে আসা।

ইং ১৮৮৪ সালে ফেব্রুয়ারী মাসের শেষ বরাবর পিতা ৺বিশ্বনাথ দত্তের মৃত্যু হয়। নরেন্দ্রনাথের সংসার একেবারে বিপন্ন হইয়া পড়িল, চাকর, সরকার, লোকজন পূর্ব্বদিনও ছিল, কিন্তু পরদিন একমুষ্টি অন্নের কোন সংস্থান ছিল না। নরেন্দ্রনাথ একেবারে এত বিষণ্ণ ও চিন্তিত হইয়া পড়িলেন যে, তাঁহার শিরঃপীড়া দেখা দিল। সকল সময়ই মাথার ভিতর যেন আগুনের হল্‌কা জলিতেছে। বাহিরের বৈঠকখানার দরজা বন্ধ করিয়া কর্পূরের নস্য নিতেন। ধ্যান করিবার চেষ্টা করিতেন, কিন্তু ধ্যান হইত না। একবারের অন্ন জুটে ত আর একবারের কিছুই হইত না। অনেক সময় প্রবোধ দিবার জন্য বলিতেন যে, "বাহিরের একজনের বাড়ীতে নিমন্ত্রণ খাইয়া আসিয়াছি।"

প্রকৃতপক্ষে অনাহারেই রহিয়াছেন। এই সব পাঁচ কারণে তাঁহার শিরঃপীড়া জন্মে।

গর্ম্মীকাল, শনিবার ; রাম দাদার বাড়ীতে পরমহংস মহাশয় আসিয়াছেন। অনেক লোক, বিকাল থেকেই ভিড় হইয়াছে। প্রথমে অভিমান করে নরেন্দ্রনাথ গেলেন না। দুই এক জন ভক্ত তাঁহাকে ডাকিতে আসিলেন, কিন্তু নরেন্দ্রনাথ বিষণ্ণ ও ক্ষুব্ধ ভাবে রহিলেন, কাহারও কথা শুনিলেন না এবং কিছুতেই যাইলেন না। অবশেষে সন্ধ্যার সময় দেবেন বাবু আসিলেন এবং আমাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "নরেন বাবু কোথায়?" আমি পাশের ঘর দেখাইয়া দিলাম। দরজা বন্ধ ছিল, দেবেন বাবু অনেকবার ধাক্কা দিয়া দরজা খোলাইলেন। তিনি কথাবার্ত্তা এমন স্নেহপূর্ণ মিষ্ট ভাবে বলিতে লাগিলেন যে, নরেন্দ্রনাথের ক্রোধ, অভিমান সব চলিয়া গেল! তখন আর কোন কথা না কহিয়া কোঁচার কাপড় গায় এবং চটী জুতা পায় দিয়াই রাম দাদার বাড়ী গেলেন। দেবেন বাবুও হৃষ্ট মনে সঙ্গে সঙ্গে চলিলেন।

পরমহংস মহাশয় ঢালা তক্তাপোষের উপর যেখানে বসিয়া ছিলেন, নরেন্দ্রনাথ দরজার সম্মুখে সেইখানে গিয়া প্রণাম করিয়া মুখ গোঁজ করিয়া বসিয়া রহিলেন। অনেকেই চারিদিকে মুখ ফিরাইতে লাগিলেন এবং একটু অসন্তুষ্ট ভাব প্রকাশ করিলেন। কারণ, এত ভক্ত লোক বসিয়া আছেন, তাঁহাদের বিষয় পরমহংস মহাশয় কিছুই বলিতেছেন না, কিন্তু নরেন্দ্রনাথের আসার পর হইতেই "নরেন, নরেন" করিয়া অস্থির হইয়াছেন। নরেন্দ্রনাথ যাইতেই পরমহংস মহাশয় বলিলেন, "আমরা যে নর, তুমি যে নরের ইন্দ্র, তুমি না থাকিলে কি আসর জমে?" এই বলিয়া তিনি নরেন্দ্রনাথের মাথায় এবং পিঠে স্নেহপূর্ণ ভাবে হাত বুলাইতে লাগিলেন। আমি সেই সময় দেবেন বাবর একটু পরেই

তথায় গিয়াছিলাম এবং প্রথম দরজার কাছে বসিয়াছিলাম। নরেন্দ্রনাথ মিনিট ৪।৫ ঘরের ভিতর থাকিয়া গরম বোধ করায় রাস্তার বেঞ্চির উপর আসিয়া বসিলেন এবং সকলের সঙ্গে বেশ আনন্দ করিয়া কথা বলিতে লাগিলেন। দেবেন বাবু কিন্তু তাঁহার নিজের অভ্যস্থ স্থানটীতে বসিয়া রহিলেন এবং তিনি যে কৃতকার্য্য হইয়াছিলেন—ক্রুদ্ধ নরেন্দ্রনাথকে ডাকিয়া আনিতে পারিয়াছিলেন—এই জন্য বিশেষ আনন্দ অনুভব করিতেছিলেন। এই ডাকিয়া আনিবার কথাটা পরে অনেক বার দেবেন বাবু আনন্দ প্রকাশ করিয়া আমাকে বলিয়াছিলেন।

১৮৮৭ সালে গিরিশ বাবুর বাটীতে দেখা।

১৮৮৭ সাল থেকে গিরিশ বাবুর বাড়ীতে দেবেন বাবুকে সর্ব্বদাই দেখিতাম। লোকটীর ভিতর যেন একটা ভালবাসা আত্মীয়তা ও আকর্যণী-শক্তি বেশ বাড়িতে ছিল। কিন্তু তিনি অবস্থার বৈগুণ্যে সেটা যেন প্রকাশ করিতে পারিতেছিলেন না, বা ইচ্ছা করিয়া মনটাকে চাপিতে ছিলেন। অনেক লোকের সঙ্গে তখন মিশিতাম, সকলের সঙ্গে ভক্ত হিসাবে এক হইতাম, কিন্তু মনের কথা বলিবার বা ব্যথার ব্যথী এরূপ লোক সকলে ছিলেন না। যোগেন মহারাজের ভিতর যেমন একটা অমায়িক ভালবাসা এবং আত্মীয়তার ভাব ছিল, দেবেন বাবুর ভিতরও ঠিক্ সেই রকম ভাব ছিল। দেবেন বাবু সুবিধা পাইলেই অর্থাৎ যখন লোকের ভিড় নেই, একটু নিরিবিলি স্থানে গিয়া বাড়ীর প্রত্যেকের বিষয় জিজ্ঞাসা করিতেন এবং কি করা উচিত ও অনুচিত—এই সব বিষয়ে স্নেহপূর্ণভাবে কথা কহিতেন। জীবনের শেষ অবস্থায় তাঁহার বুকে যে ভালবাসার উৎস উঠিয়াছিল, আমরা ১৮৮৭।৮৮ সাল হইতে সেটা বেশ বুঝিতে পারিয়াছিলাম। মাঝে পেটের দায়ে

থিয়েটারে চাকুরী করেছিলেন ; সেটা তাঁর ধাতস্থ নয় এবং প্রবৃত্তিরও সম্পূর্ণ বিপরীত—যেন নাচার হইয়া তিনি ঐ কাজ করিতেন। কিন্তু গিরিশ বাবুর বাড়ীতে বসিয়া যখন আপোসে কথা হইত, তখন থিয়েটারের কথার নাম গন্ধও থাকিত না। তখন তিনি একজন অতি ভক্তিমান্ লোক—তাঁর বুক ভালবাসায় ভরা।

দেবেন বাবুর সাধনা।

এই সময়টা দেবেন বাবুর অতি খারাপ অবস্থাও বলা যাইতে পারে বা খুব ভাল অবস্থাও বলা যাইতে পারে। বিপরীত স্রোত তাঁহাকে দুই দিকে টানিতেছিল। কোন দিক স্থির করিবেন, তাহা ঠিক্ করিতে পারিতেছিলেন না। বড় সংসার, টাকা চাই, সেও এক কথা ; আবার একনিষ্ঠ হইয়া ভগবানকে ডাকিব সেও এক কথা। এই দুই টানায় পড়িয়া তিনি নিজেকে সামলাইতে পারিতেছিলেন না। কিন্তু বিশেষ একটী ভাব দেখিতাম যে, নরেন্দ্রনাথ তাঁহার চেয়ে বয়সে ঢের ছোট এবং তাঁহার বাল্যকাল হইতে জানাশুনা, কিন্তু তথাপি নরেন্দ্রনাথের তীক্ষ্ণ মনোবৃত্তিতে মোহিত হইয়া তিনি তাঁহার গুণের ও মহত্ত্বের প্রশংসা করিতেন ও শক্তিমত্তা উপলব্ধি করিতেন এবং পরমহংস মহাশয়ের পরেই তিনি নরেন্দ্রনাথকে শ্রদ্ধাভক্তি করিতেন—অতি বিনীত ও সংযত হইয়া কথা কহিতেন। বাল্যকালের সে চক্ষে আর দেখিতেন না। বরং মহাশক্তিমান্ পুরুষের কাছে বসিয়া কিছু শিখিতে চান—ইহাই তাঁহার ভিতরকার ভাব ছিল।

বুদ্ধের মতামত লইয়া যখন তর্ক হইত, দেবেন বাবু সেটা তত ভাল বুঝিতেন না। কিন্তু যখন উপাখ্যান সরু হইত, দয়ার

ভাবে সর্ব্বজীবের জন্য বুদ্ধের প্রাণ কাঁদিতেছে শুনিতেন, তখন দেবেন বাবুর বড় ভাল লাগিত; তাঁহার দুই চক্ষু জলে ভরিয়া যাইত। ইহা কিন্তু প্রচলিত 'ন্যাদ্‌ন্যেদে' বোষ্টুমী ভাব নয় অর্থাৎ কথা বলিবার আগেই কান্না, নাক দিয়া 'শিক্‌নী পড়া' ইত্যাদি। দেবেন বাবু সেরূপ ভাব কখনও ভালবাসিতেন না। জগৎ ত্যাগ করিয়া শুধু ভক্তি, সেটাও তিনি বড় পছন্দ করিতেন না। শুষ্ক জ্ঞানও তাঁহার ধাতে ছিল না। সকল লোককে ভালবেসেই ভক্তি জ্ঞান বা কর্ম্মের ফললাভ করাই তাঁর মনের স্বাভাবিক প্রবৃত্তি ছিল। আটু পাটু করিয়া সকলকে যেন আপনার করা, এটাই তাঁর বিশেষ ভাব ছিল। ভালবাসার জন্যই ভালবাসা—এইটা তাঁর ভিতর স্পষ্ট দেখিতাম।

থিয়েটারের কর্ম্মত্যাগের পর দেবেন বাবুর কয়েক বৎসর জীবন অতি কষ্টময় অথবা অতি সুখময় বলা যাইতে পারে। সাংসারিক বিষয়ে তাঁহার বিশেষ অনাটন ছিল। কখনও কখনও দেখা গিয়াছে যে, তাঁহার মুখ শুষ্ক, কাহারও কাছে মুখ ফুটিতেছেন না, বিষণ্ণ হইয়া বসিয়া আছেন। অবশেষে যোগেন মহারাজ ইসারা করিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "দেবেন বাবু, মুখটা আজ শুষ্ক কেন?"

তিনি অপ্রতিভ হইয়া বলিলেন, "না কিছু নয়, বিশেষ কিছু নয়।"

যোগেন মহারাজ তখন একটা অছিলা করিয়া অন্যত্র উঠিয়া গেলেন এবং দেবেন বাবুকে তথায় ডাকিলেন। উভয়ে যেন কত হাসি তামাসা করিতেছেন, বাহ্যিক এই ভাব দেখাইয়া তিনি দেবেন বাবুকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "আজ ব্যাপারটা কি?"

দেবেন বাবু হাস্য করিয়া বলিলেন, "হরিমটর ভাজা," অর্থাৎ আজ হাঁড়ি চড়ে নাই। যোগেন মহারাজ তখনই কাহারও কাছ হইতে কিছু আনিয়া দেবেন বাবুর হাতে দিলেন। অপর কেহ

জানিতে না পারে এমন ভাবে দেবেন বাবুও একটা ছুতা করিয়া চলিয়া গেলেন।

পরমহংস মহাশয়ের ত্যাগী শিষ্যেরা গৃহত্যাগ করিয়া নগ্নপদে নানা স্থানে পরিভ্রমণ করিতেন, ভূমিপৃষ্ঠে শুইয়া থাকিতেন; তাঁহাদের কোন দিন আহার জুটিত, কোন দিন বা কিছুই না। দেবেন বাবুও তেমনই সর্ব্বপ্রকার মহাকঠোর সাধনা করিতে লাগিলেন এবং সর্ব্বদা উচ্চ ভাবরাশির চর্চ্চা ও উপলব্ধির আশায় উন্মত্তের ন্যায় জীবন-স্রোত পরিচালিত করিতে লাগিলেন।

গৃহী ভক্তেরা যদিও বাহ্যিক চিহ্ন—গৈরিক বসন, নগ্নপদ, মস্তক-মুণ্ডন ও গৃহত্যাগ আদি গ্রহণ করিলেন না, কিন্তু প্রকৃত পক্ষে ঠাকুরের উভয় শ্রেণীর শিষ্যেরা আপন আপন প্রবৃত্তি অনুযায়ী ও পন্থানুরূপ কঠোর তপস্যা করিতে লাগিলেন। পরমহংস মহাশয়ের কথা আলোচনা, বেদান্ত ও দর্শনশাস্ত্রের নানা মত শ্রবণ ও সর্ব্বদাই সেই বিষয়ে চিন্তা এবং তর্ক বিতর্ককালে পূর্ব্বপক্ষ ও উত্তরপক্ষ লইয়া বিচার ইত্যাদি—সকলেই সমান ভাবে করিতে লাগিলেন।

তখনকার দিনে ত্যাগী ও গৃহী ভক্তদের ভিতর কোনই পার্থক্য ছিল না। সকলেই পরমহংস মহাশয়ের ভক্ত, সকলেই তাঁহাকে দর্শন করিয়াছেন এবং তাঁহার প্রদর্শিত পথ প্রাণপণে উপলব্ধি করিতে চেষ্টা করিতেছেন। এই জন্য বিকাল হইতে রাত্রি ৯।১০টা পর্য্যন্ত গিরিশ বাবু বা বলরাম বাবুর বাটীতে সকলেই একত্রিত হইতেন। তখন সাংসারিক বা দুনিয়াদারী কোন কথাই থাকিত না; নিয়ত সাধনার উচ্চ অঙ্গের ভিন্ন ভিন্ন স্তরের কথা চলিত এবং সকলে মিলিয়া একটি জমাট সমষ্টি হইয়া থাকিতেন। রাত্রি অধিক হইলে অনিচ্ছায় যে যার নিজের স্থানে চলিয়া যাইতেন। ভক্তসমাগম যে

একটা আনন্দের জিনিষ, তাহা আমরা তখন বিশেষ ভাবে অনুভব করিতাম। এই দৃশ্য যাঁহারা দেখিয়াছেন তাঁহারা সেই আনন্দস্মৃতি জলন্ত ভাবে চিরদিন অন্তরে পোষণ করিতেছেন। ইহাকেই বলে ঈশ্বর-সান্নিধ্য জ্ঞান, বা ভক্তমুখে ভগবানের দর্শন।

দেবেন বাবুর বংশের উৎপত্তির কথা।

একদিন সন্ধ্যার প্রাক্কালে বলরাম বাবুর হল্ ঘরে বসিয়া আছি, অনেকেই উপস্থিত ছিলেন। তখন প্রসঙ্গক্রমে পিরালী ব্রাহ্মণের কথা উঠিল। আমি যোগেন মহারাজের সহিত ঐ বিষয়ে কথা কহিতেছিলাম, হাসি তামাসাও বেশ চলিতেছিল। তবে দেবেন বাবুকে বিশেষ সম্মান করায় তাঁহার কাছে সংযত রহিলাম। দেবেন বাবু তখন নিজবংশের উৎপত্তির কথা কহিতে লাগিলেনঃ—

"এক গ্রামে এক জমিদার ছিল। তাঁর নয়টি মেয়ে। বড় মেয়েটী বত্রিশ বৎসর, ছোটটীর বয়স 'নয়'। জমিদার ব্রাহ্মণ, উপযুক্ত পাত্র পান নাই, এজন্য কন্যাগুলির বিবাহ হয় নাই। এই ভাবে কিছুকাল যায়, হঠাৎ এক দিন বিকাল বেলা এক যুবা সাধু আসিয়া গ্রামে ঢুকিল। গ্রামের লোকেরা বলিল, 'ঐ জমিদার ব্রাহ্মণ, তাঁর বাটী যান; সীদা পাইবেন।' সন্ন্যাসীটী অগত্যা সেই ব্রাহ্মণ জমিদারের বাড়ীতে গেলেন। জমিদার তাঁহাকে চাল-ডাল ইত্যাদি দেওয়াইলেন।

যুবক সন্ন্যাসীকে শ্রীমান্ দেখিয়া তাঁহার সহিত তিনি নানা কথা আরম্ভ করিলেন। কথা-প্রসঙ্গে বুঝিলেন যে, সন্ন্যাসীটী স্বশ্রেণীর ব্রাহ্মণ ও পাল্টীঘর। জমিদার আর কিছু না বলিয়া গোপনে এক পুরোহিত ডাকাইলেন, এবং কৌশলে সন্ন্যাসীকে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ করিয়া সন্ধ্যার পর তাঁহাকে ভিতর বাড়ী লইয়া গিয়া একেবারে নয়টি কন্যা সম্প্রদান!

শাঁক বাজানমাত্র 'বে'র' শানাই হ'লো। নয় কনের সাত পাকে সন্ন্যাসীর বিয়ে হয়ে গেল। নান্দীমুখ, গায়ে হলুদ জাকড়ে রহিল। লগ্ন-পত্র, ও ক্ষণ এ ক্ষেত্রে ধার রইল। গোধূলীতে তো হলো বে! সন্ন্যাসী ঠাকুর আর যান কোথা! কতগুলি যুবতী মেয়ে পেলেন—একটা নয়—গোটা নয়! তার তো সন্ন্যাসীগিরি মাথা থেকে ভোঁ করে উড়ে গেল!

তারপর একদিন জমিদার বলিলেন,—"দেখ, আমরা স্ত্রী পুরুষে বুড়া বুড়ী হয়েছি, আমরা কাশী বাস করিব। তুমি এই স্ত্রী পরিবার লয়ে এই বাড়ী ঘর দুয়ার জমি জেরাত দেখা শুনা কর। আজ থেকে এ সকল তোমারই হইল। ইহাতে তোমাদের সুশৃঙ্খলে সকলই চলিবে।" এই বলেই তো বুড়া বুড়ী কাশী রওনা হলেন। সন্ন্যাসী ঠাকুর তখন এক-পাল স্ত্রী লয়ে সুখে সংসার কর্‌তে লাগিলেন। আর জমিদার ত হলেনই।"

ইহাতে হাসির ধুম প'ড়ে গেল। দেবেন বাবু আবার বলিতে লাগিলেন, "সেই সন্ন্যাসী হলেন আমাদের আদিপুরুষ। এঁর সময় থেকেই আমরা পিরালী হইলাম। আমরা হইতেছি আসল পিরালী। আমাদের সহিত সম্পর্ক করিয়া অপর সকলে—পিরালী হইয়াছে।"

গল্পটি এখানে সংক্ষেপে দেওয়া হইল। বলিবার সময় দেবেন বাবু এমন হাত নাড়িয়া মুখভঙ্গী করিয়া হাসাইয়া হাসাইয়া গল্পটী বলিয়াছিলেন যে, আমরা সকলে লুটাপুটি যাইতেছিলাম। সন্ন্যাসীর অভিনয়টা তিনি বড় সুন্দর দেখিয়েছিলেন। আর তখন তিনি এমনি বোলচাল সুরু করেছিলেন যে, তিনি কিরূপ স্ফূর্ত্তিবাজ রসিক লোক, তা প্রকাশ পাইতেছিল। গল্পেতে ইতিহাস থেকে হাসির ভাবটাই বেশী ছিল।

কালীকৃষ্ণ ঠাকুরের বাড়ীতে রসুয়ের গল্প।

বলরাম বাবুর বাড়ীর রাস্তার দিকে বারাণ্ডায় দাঁড়াইয়া দেবেন বাবু একদিন গল্প সুরু করলেন—"দেখ কালীকৃষ্ণ ঠাকুরের বাড়ীতে এক রসুয়ে ছিল। সে রান্না ঘরে ঢুকিতে ঢের দেরি করিত, কিন্তু ঝি চাকরদের তার বলা ছিল যে, 'খুব সকালে উনানে আগুন দিয়া একটা হাঁড়ীতে ডাল চড়াইয়া দিবে। যত আনাজ তরকারী আছে কুটিয়া আর একটায় সিদ্ধ চড়াইয়া দিবে। আর একটা উনানে হাঁড়ীতে জল গরম করিতে দিবে। চালটা অপর এক হাঁড়ীতে চাপাইয়া দিবে। তাহা হইলেই ঘণ্টা খানেকের ভিতর সকল রকম তরকারী তৈয়ার করিয়া দিব।' রান্না ঘরের ঝি চাকর নিত্য তাই করিত। রসুয়ে বেলা করিয়া আসিয়া হাঁড়ীতে হাত দিয়া একবার করিয়া দেখিয়া লইত যে, আনাজ তরকারী সব সিদ্ধ হইয়াছে কি না। পরে হাঁড়ীটা নামাইত এবং সিদ্ধ আনাজগুলি থালায় থালায় পৃথক্ করিয়া ফেলিত। তারপর তিতা, ঝাল, টক মিশাইয়া একটা সুক্তো, একটা ডাল্না, একটা চর্চ্চড়ী ও একটা অম্বল, এইরূপে বহু প্রকার ভিন্ন ভিন্ন সুন্দর তরকারী করিত। সে কোথায় কি কেরামতী করিত, তাহা কেহ ধরিতে পারিত না। অথচ এক ঘণ্টার ভিতর দশ তরকারী করিয়া ঠিক্ সময়ে সকলকে ভাত দিত।

দেবেন বাবু এই গল্পটী প্রায়ই বলিয়া গম্ভীর হইয়া যাইতেন, আর বলিতেন, "ব্যাপারটা সামান্য বটে, কিন্তু জগতের ব্যাপারও ভেবে দেখলে ঠিক্ এই। ভিন্ন ভিন্ন আনাজ তরকারী সবই ত এক হাণ্ডায় সিদ্ধ হয়, শুধু মশলা ও গরম জলের পরিমাণ ক'রে দেওয়ায় সুক্তো, ঝোল, চর্চ্চড়ী, ডাল্না ইত্যাদি হয়। জগৎটাও তাই—একই জিনিষ, একই জায়গায় থেকে হয়, শুধু গুণের তফাতে নানা রকম করে

দেখাচ্ছে, আর আমরা বল্‌ছি—কোনটার সহিত কোনটার মিল নাই। কিন্তু উৎপত্তি এক জায়গা হ'তে।" এই কথা বলিতে বলিতে দেবেন বাবুর মুখ গম্ভীর ও দৃষ্টি স্থির হইয়া যাইত। ভিতরে তাঁর যে গম্ভীর চিন্তা আসিত, সেটা যেন তিনি ভাষায় বলিতে পারিতেন না। হাসি তামাসা থেকে কথাটা সুরু করিয়া তিনি অতি গভীর দিকে লইয়া যাইতেন।

দেবেন বাবুর গিরিশ বাবুর কাছে চাকরী করা।

দেবেন বাবু কয়েক বৎসর গিরিশ বাবুর কাছে চাকুরী করিয়াছিলেন। গিরিশ বাবু মুখে বলিয়া যাইতেন, দেবেন বাবু সেই সকল লিখিয়া লইতেন। দেবেন বাবুর বাংলা হাতের লেখা অতি সুন্দর ছিল।

এই স্থলে ইহা বলা আবশ্যক যে, দেবেন বাবু যদিও গিরিশ বাবুর কাছে কর্ম্ম করিয়াছিলেন. কিন্তু গিরিশ বাবু তাঁহাকে বিশেষ সম্মান ও শ্রদ্ধা করিয়া কথা কহিতেন। অধীন ব্যক্তির প্রতি সাধারণতঃ যেরূপ আজ্ঞা বা আদেশ বা উচ্চ নীচ ভাব প্রদর্শন করিতে দেখা যায়, এরূপ কিছু ছিল না। উভয়ে যেন পরম আত্মীয় এবং পরস্পরকে পরামর্শ ও উৎসাহ দিয়া একই উদ্দেশ্য সাধন করিতেছেন। উভয়ের মধ্যে প্রগাঢ় সখ্যভাব ও শ্রদ্ধা-ভক্তির বিশেষ মাধুর্য্য ছিল। এমন কি আবশ্যক হইলে দেবেন বাবু গিরিশ বাবুকে ধম্‌কাইতেন এবং গিরিশ বাবু ধীর ভাবে নিজের দোষ স্বীকার করিয়া লইতেন। আসল কথা এই যে, গিরিশ বাবু নিজে গুণী লোক ছিলেন এবং গুণগ্রাহীও ছিলেন, সেই জন্যে তিনি দেবেন বাবুকে এইরূপ সম্মানের চক্ষে দেখিতেন এবং দেবেন বাবুও সেইরূপ গুণগ্রাহী ছিলেন বলিয়া গিরিশ বাবুর প্রতি তাঁর প্রগাঢ় শ্রদ্ধা ছিল এবং উভয়েই

শ্রীরামকৃষ্ণের শিষ্য হওয়ায় অবসর পাইলেই শ্রীরামকৃষ্ণের কথাবার্ত্তা ও আলোচনা করিতেন।

দেবেন বাবুর তর্কের মাধুর্য্য।

একটা বিশেষত্ব দেখিতাম এই যে, থিয়েটার বাড়ীতে গিরিশ বাবু থিয়েটারের লোক, গ্রন্থ লিখিবার সময় তিনি কবি; কিন্তু অপর সময় তিনি ভক্ত। ভক্তগণকে সমবেত করিয়া তাঁহার ঘরে সকল সময় তিনি শ্রীরামকৃষ্ণ সম্বন্ধে কথাবার্ত্তা কহিতেন। এই সকল কথোপকথন এত গভীর ও নানাবিষয়ক হইত যে, তাহা যদি সমস্ত লিপিবদ্ধ করা যাইত, তাহা হইলে বিশেষ জ্ঞানপূর্ণ কয়েক খানি গ্রন্থ হইত। বরাহনগর মঠে নরেন্দ্রনাথ প্রমুখ অনেকেই আসিয়া কথাবার্ত্তা কহিতেন। দেবেন বাবুও এই সকল কথায় যোগ দিতেন, তিনি ভক্ত লোক, নরমভাবের কথা বেশ কহিতেন।

গিরিশ বাবু যদিও তর্কে খুব ডাণ্ডাবাজী করিতে পারিতেন, কিন্তু দেবেন বাবুও বড় কম যাইতেন না। তিনি নরম নরম মিঠা ভাষায় কথা কাটাইতেন। নিজের পক্ষ উত্তমরূপে সমর্থন করিতে পারিতেন। অবশ্য নরেন্দ্রনাথের সহিত তুলনায় তিনি বড় তর্ক করিতে পারিতেন না। তবে অন্য সকলের সহিত তিনি দুহাত বেশ তর্ক করিতেন। তর্কে তাঁর একটা বিশেষত্ব দেখিতাম যে, মানীর মান রাখিয়া বিশেষ শ্রদ্ধাভক্তি দেখাইয়া ভালবাসার ভিতর দিয়া তিনি তর্ক করিতেন। এইটাকেই বলে কবিত্ব শক্তি। তাঁর তর্কের ভিতর এইটাই বিশেষত্ব ছিল। এই জন্য সকলে দেবেন বাবুকে শ্রদ্ধাভক্তি করিত। তবে হুকুমজারি করা বা নিজের মত জারীকরা—আমার মত না মানিলে আর উপায় নাই—এই সব ভাব তাঁহাতে লেশমাত্রও ছিল না। তাঁর কথার ভিতর সরলতা ও মাধুর্য্য ছিল, এবং হাসি

তামাসার ভাবও বেশ ছিল। বৈষ্ণবশাস্ত্রে যাহাকে সখ্যভাব বলে, সেই সখ্যভাব দিয়া নিজের মনকে তিনি বিকাশ করিতেন। এই জন্য আমার দেবেন বাবুকে এত ভাল লাগিত।

দেবেন বাবুর আর একটা বিশেষ ক্ষমতা ছিল যে, যেমনই লোক আসিত, তিনি ঠিক্ তাহার অনুরূপ হইতে পারিতেন। তিনি কখনও অপর ব্যক্তির অপেক্ষা নীচু বা উচু দরের হইতেন না। মহা তার্কিক লোক আসিলে তিনি তার্কিক হইতে পারিতেন, ভক্তিমান্ লোক আসিলে ঠিক্ ভক্তিমান্ হইতে পারিতেন, জ্ঞানী লোক আসিলে জ্ঞানী হইতে পারিতেন, ফূর্ত্তীবাজ লোক আসিলে ঠিক্ ফূর্ত্তীবাজও হইতে পারিতেন। কিন্তু তাহাতে একটা বিশেষত্ব ছিল এই যে, কখনও ওস্তাদি চাল বা গুরুগিরি ঢং তিনি দেখাইতেন না। সখ্যভাব, প্রণয় ও প্রীতির ভিতর দিয়া তিনি তাঁহার নিজের হৃদয় ভেদ করিয়া মন ও প্রাণটা বাহির করিয়া অপরকে যেন আবরণ করিয়া ফেলিতেন। শ্রোতা প্রথম একটু নিজের কোট্ বজায় রাখিবার চেষ্টা করিত, কিন্তু দেবেন বাবুর মন ও প্রাণের আকর্ষণী শক্তিতে বিমোহিত হইয়া যেন সেই সময়কার জন্য সে তাঁহারই প্রতিরূপ বা প্রতিবিম্ব হইয়া উঠিত। কি জন্য বা কি উপায়ে সে আত্মহারা হইয়া দেবেন বাবুর নিজের লোক হইয়া যাইত, তাহা সে তখন বুঝিতে পারিত না। কিছু দিন পরে সে বুঝিত যে, লোকটীর ভিতরে একটা মোহিনী শক্তি আছে এবং তিনি ভালবাসা ও সখ্যভাব দিয়া বাজারে কিনা বেচা করেন।

দেবেন বাবুর 'কদরদান' বা গুণগ্রাহিতা শক্তি।

আর একটা কথা, যাহাকে 'কদরদান' বা গুণগ্রাহিতা শক্তি (appreciative mind) বলে, দেবেন বাবুর তাহা বিশেষ ভাবে ছিল।

যে কোন লোক, যে ভাবেরই হউক না কেন, বা যে কোনও অবস্থারই হউক না কেন, দেবেন বাবুর কাছে গেলে তার একটা যাচাই হইত। লোকটীর অনেক গল্‌তি থাকায় সকলেই তার উপর অন্তরে বিরক্ত, কিন্তু কোথায় তাহার একটা লুকান গুণ রহিয়াছে, সাধারণ লোকে তাহা বুঝিতে পারিত না। দেবেন বাবু তার দোষগুলির দিকে না চাহিয়া কোথায় তার একটী সামান্য গুণ আছে, তাহা ধরিতে পারিতেন এবং তাহার সেই গুণের দিক্ দিয়া তার মনটা তুলিতে এবং যাহাতে তাহার উন্নতি হয়, সেই বিষয়ে চেষ্টা করিতেন। এই রূপেই তিনি অধিকাংশ স্থলে কৃতকার্য্য হইয়াছিলেন।

এই 'কদরদান' গুণ তাঁহার বরাবর ছিল। আমি বহু দিন আগে থেকেই তাঁহার এই গুণ লক্ষ্য করিয়াছি। তাঁহার জীবনের শেষ অবস্থায় এই গুণটী বিশেষ ভাবে পরিবর্দ্ধিত হইয়াছিল। শ্রদ্ধেয় গিরিশ বাবুরও এই গুণ বিশেষ ভাবে ছিল। তিনি 'কদরদান' ছিলেন বলিয়াই নানা শ্রেণীর লোক একত্র করিয়া রাখিতে পারিতেন। গিরিশ বাবু নিজে গুণী লোক ছিলেন, এই জন্যই অপরের গুণ গ্রহণ করিতে পারিতেন। গিরিশ বাবুর যদি গুণের তালিকা করা যায়, তাহা হইলে তাঁহার 'কদরদান' গুণটী সর্ব্বপ্রথমে উল্লিখিত হইবে।

আর দেখেছিলুম অজাতশত্রু ব্রহ্মানন্দ স্বামীর মধ্যে এই গুণটী বিশেষভাবে ছিল। রাখাল মহারাজ অপরের সামান্য গুণ থাকিলেও তাহার কদর করিতেন। কিন্তু, তাহা তিনি কখনও তাহার সম্মুখে উল্লেখ করিতেন না। অন্তরালে অপরের সম্মুখে সেই ব্যক্তির ভূয়সী প্রশংসা করিতেন। অজাতশত্রু রাখাল মহারাজের স্বভাব অতি গম্ভীর ছিল এবং তিনি অতি সংযতবাক্ পুরুষ ছিলেন। কিন্তু, তাঁহার এই গুণটী অতি তীক্ষ্ণভাবে থাকায় তিনি অল্প সময়ের মধ্যে

অপরের গুণ বুঝিয়া লইতে পারিতেন, এবং যাহাতে তাহার উন্নতি হয়, সেইজন্য তাহার নাম না করিয়া নিরপেক্ষভাবে সেই বিশেষ গুণটীর কথা বলিয়া যাইতেন। তাহাতে সেই ব্যক্তির অন্তর্নিহিত সুষুপ্ত গুণটী ফুটিয়া উঠিত এবং সেই পথ ধরিয়া চলিয়া তাহার উন্নতি হইত। অপরাপর অনেকের ভিতর 'কদরদান' গুণটী আছে বটে, কিন্তু দেবেন বাবু, গিরিশ বাবু ও রাখাল মহারাজের ভিতর এই গুণটী বিশেষভাবে পরিলক্ষিত হইত। এই জন্য সর্ব্বপ্রকারের ভাল মন্দ লোক এই তিন জনের কাছে অত ঝুঁকিত। ইহাই ছিল এই তিন জনের আকর্ষণী শক্তি।

দেবেন বাবুর আকর্ষণী শক্তির ফল।

দেবেন বাবুর প্রাণের ভিতর যে আকর্ষণী শক্তি ছিল, তাহার দ্বারা তিনি সকলকে আপন করিয়া লইতে চাহিতেন। সকলেই যেন তাঁর নিজ পরিবারভুক্ত। কেহ তাঁহার বাহিরের আলাপী বন্ধু মাত্র—এরূপ ভাব তাঁহার কখনও ছিল না; তাঁহার স্বজন অর্থে 'স্বগোষ্ঠী' ছিল। বাগবাজারে দেখিতাম—স্বগোষ্ঠীর জন্য তিনি নানা বিষয়ে চিন্তা করিতেন এবং সেই ব্যক্তি উপস্থিত হইলে উপযুক্ত পরামর্শ দিতেন। বয়সের সঙ্গে তাঁর এই ভাবটা খুব বাড়িয়া ছিল। শেষকালের অবস্থায় দেখিতাম যে, এইভাবে তাঁর ভিতরটা গলে গিয়ে যেন এক স্রোতের ধারার মত বহিতেছে, সকলের জন্য হাকুপাকু করিতেছে। আমার প্রতি তাঁহার যে অমায়িক ভাব ছিল, তাহা ব্যক্তিগত ভাব নহে, তাহা সকলের জন্য তাঁর সমভাব-বশতঃ।

যে সকল লোককে কেহ নিকটে বসিতে বা আসিতে দেয় না, সেই সকল ওঁচা লোককেও দেবেন বাবু স্থান দিতেন, আদর করিয়া কাছে বসাইতেন ও কথা কহিতেন। আর সেই সকল

ঁচা কথা শুনিতেন এবং মিষ্টভাবে উত্তর দিতেন। ইহাকে তাঁহার সাধারণ সহ্য গুণ—বলিব, কি আর কিছু—বলিব, ঠিক্ করিতে পারিতেছি না। আমি ত এক এক সময়ে রাগিয়া গিয়া দুই একটা ড়া কথা বলে ফেল্‌তুম। কারণ, অসহ্য সে সকল লোকের সঙ্গ, অসহ্য সে সকল লোকের কথা। দেবেন বাবু হাসিয়া হাসিয়া এক একবার বলিতেন, "ওহে, এদেরও একটু মঙ্গল দেখ্‌তে হয়, তাড়িয়ে দিলে এরা দাঁড়ায় কোথা? এদের কি বস্‌তে কোন স্থান আছে! সাত ঘাট ঘুরে, কোন স্থানে এক গণ্ডুষ জল না খেতে পেয়ে, তবে ত এখানে এসেছে। এদের তাড়ালে হবে কেন? এই ওঁচাদের জন্যই ত তিনি এসেছিলেন। সেই জন্যই এই ওঁচাগুলিকে বেশী ডাকি। এদের ভিতর তাঁর ভাব ঢুকিয়ে দেওয়াই ত তাঁর কাজ।"

দেবেন বাবু একদিন আমায় বলিলেন, "ইটালীর সন্নিকটস্থ মুসলমান, ফিরিঙ্গী এবং ইহুদী পুরুষ ও স্ত্রীলোক, ছেলেপুলে লইয়া ঠাকুরের কথা শুনিতে আসে।"

আমি বলিলাম, "সে কি! মুসলমান-ফিরিঙ্গীরাও আসে?"

দেবেন বাবু বলিলেন, "হাঁ হে, তাঁরা বেশ ভক্তি ক'রে আসে—মন দিয়ে ঠাকুরের কথা শুনে।"

আমি বলিলাম, "দেবেন বাবু—এ যে নূতন কথা শুন্‌ছি!"

তিনি হাসিতে হাসিতে বলিলেন, "হাঁ হে। তাঁরা সকালবেলা, সন্ধ্যার সময় মাঝে মাঝে আসে।"

আমি মনে মনে কহিতে লাগিলাম, 'লোকটার কি আকর্ষণী শক্তি, সকল রকম লোককেও টান্‌তে পারে!'

দেবেন বাবুর উপদেষ্টার ভাব।

ভক্তিমার্গের উপদেষ্টার মধ্যে অনেকের ভিতর এই ভাবটা দেখিতে পাওয়া যায় যে, তাঁহারা ভক্তবৃন্দের নিকট হতাশ বিষণ্ণ ভাবে—"আর ক' দিনের জন্যই বা বেঁচে থাকা! জগতের সবই ত দেখ্‌ছ—কষ্টময়, জীবন—অসার!"—এই সকল কথা কহিয়া থাকেন। এই ভাবটাই হ'ল তাঁহাদের ভক্তির প্রধান অঙ্গ। ইহারই নাম হ'ল ত্যাগ, ইহারই নাম হ'ল বৈরাগ্য। আপনাদের ভিতরকার এই বিষণ্ণ ভাবটী তাঁহারা ভক্তবৃন্দের ভিতরেও প্রবেশ করাইয়া দিতে চেষ্টা করেন এবং ভক্তগুলিও নিস্তেজ, নির্জ্জীব, চলন্ত পুত্তলিকাবৎ হইয়া যায়। যাহাকে চলিত কথায় বলে 'পাত্‌কোভুত' ধরিয়ে দেওয়া, এই প্রকার ভক্তির উপদেষ্টারা সেই 'পাতকোভূত' ধরাইয়া দেন। ইহাতে কতকগুলি হস্তপদবিশিষ্ট জীবিতে মৃত, ভক্ষণশীল মাংসপুত্তলিকার সৃষ্টি হয় মাত্র।

দেবেন বাবু ভক্তিমার্গের লোক হইলেও তাঁহার ভাব সম্পূর্ণ বিপরীত ছিল। তাঁহার কথাবার্ত্তা লোকের ভিতর বিষাদ বা বিষণ্ণ ভাব না আনিয়া, হৃদয়ে নূতন শক্তি সঞ্চার করিত এবং সংসারে কাজ করিতে উদ্যম আনিয়া দিত। কখনও বা গম্ভীর ভাবে, কখন বা হাসি কৌতুক করিয়া, কখনও বা একটী উপাখ্যান বলিয়া তিনি শ্রোতার হৃদয়ে উচ্চ ভাব ও উচ্চ আকাঙ্ক্ষা প্রজ্জ্বলিত করিয়া শক্তির উদ্রেক করিয়া দিতেন। এজন্য নানা শ্রেণীর, নানা জাতির ও নানা অবস্থার লোক তাঁহার নিকট যাইত এবং তাঁহার কথা শুনিয়া সকলেই বুকে আশ্বাসবাণী লইয়া ফিরিত।

যা' হো'ক, যাকে বলে "রসে বসে", দেবেন বাবুর ভাব সেই প্রকার ছিল। তিনি নিজে ভক্তিমার্গের লোক হইলেও কর্ম্ম ও জ্ঞানের

ভাব তাঁহার ভিতর প্রজ্জলিত ছিল। ভক্তি সম্পূর্ণ ভাবে প্রস্ফুটিত হইলে স্বভাবতঃই জ্ঞান ও কর্ম্মের ভাব আসিয়া যায়। দেবেন বাবুর জীবনে ইহা বেশ দেখা যায়। বিষণ্ণ, হতাশ বা রোরুদ্যমান ভক্তিমার্গের লোক হইতে দেবেন বাবুর এ বিষয়ে অনেক পার্থক্য ছিল।

দেবেন বাবুর কবিত্ব শক্তি।

দেবেন্দ্র বাবু যখন কথাবার্ত্তা কহিতেন, বা কোন ঘটনা বর্ণনা করিতেন, তখন শ্রোতার মনকে অজ্ঞাতসারে সেই বিবৃত স্থানে লইয়া যাইতেন এবং তথাকার প্রত্যেক বস্তু স্পষ্টভাবে দেখাইতেন। তৎকালে ব্যক্তিসকল কিরূপে কথা কহিতেছে, কিরূপে হাত নাড়িতেছে, কিরূপ মুখভঙ্গী করিতেছে এবং কি ভাবে গলা খাঁকুরী দিয়া আপন আপন ভাব প্রকাশ করিতেছে—তিনি স্পষ্টভাবে তাহার নকল দেখাইতে পারিতেন, অতীত ঘটনাবলী স্পষ্টতঃ সম্মুখে প্রকটিত করিতেন। এই জন্যই 'নকুলে' দেবেন বাবুর কথা এত মধুর হইত এবং শ্রোতৃবর্গও সমান আগ্রহের সহিত শুনিত; বিষাদ বা অবসাদ একটুও আসিত না। কথায় লোককে তিনি এমন হাসাইতে পারিতেন যে, হাসিয়া হাসিয়া সকলের পেটে ব্যথা ধরিত। তিনি কখনও গোমড়া মুখো নীরস ভক্ত ছিলেন না। কান্দুনে 'পান্ত ভেতে' 'প্যানপেনে' ভাব তাঁর একটু মাত্রও ছিল না। হাসি, তামাসা ও ফূর্ত্তি তিনি বেশীই করিতেন। যাকে বলে—রীতিমত মজলিসী লোক। বড় ঘরের আদবকেতা তাঁর স্বভাবসিদ্ধ ছিল। এটা তাঁর সাগ্‌রিদি ক'রে শেখা নয়। এই হাসি-তামাসা-ফূর্ত্তির ভিতর একটা মাধুর্য্য থাকিত। ছেব্‌লামী বা বাচালতা একেবারে থাকিত না। এই স্ফূর্ত্তির দেওড় দিয়া তিনি যে কোন উচ্চভাব বুঝাইতে পারিতেন। এইটী তাঁর একটা বিশেষ গুণ ছিল।

আমি বাগবাজারে গিরিশ বাবুর বাটীতে বা বলরাম বাবুর বাটীতে দেবেন বাবুর কথা কহিবার এই কবিত্ব শক্তি লক্ষ্য করিয়াছিলাম এবং যখন তিনি ইটালীতে অবস্থান করিতেছিলেন, তখন তাঁহার এই শক্তি অতি সুন্দররূপে পরিবর্দ্ধিত হইয়াছিল। এই কবিত্বশক্তি, সেখানে যাঁহারা তাঁহার সহিত ঘনিষ্ঠভাবে মেশামিশি করিয়াছিলেন, তাঁহারা বুঝিয়াছিলেন। তিনি যদি কবি হইবার প্রয়াস করিতেন, তবে তিনি উৎকৃষ্ট কবি হইতে পারিতেন। কারণ, তাঁহার কথাবার্ত্তা সবই 'নভেল' লিখার ধরণে ছিল। তিনি সামান্য মাত্র কয়েকটা স্তব, স্তুতি ও গান লিখিয়া গিয়াছেন; তাহাতে তাঁহার স্বাভাবিক কবিত্ব-শক্তির আভাস পাওয়া যায় মাত্র। বোধ হয়, এই শক্তিটা তাঁহার বংশেরই ধারা। তাঁহার অগ্রজ সুরেন্দ্রনাথ এক খ্যাতনামা কবি ছিলেন। "মহিলা" ও "সুদর্শন" প্রভৃতি কবিতা এখনও পণ্ডিতগণ পড়িয়া আনন্দ অনুভব করেন। কিন্তু অবস্থার বৈগুণ্যে দেবেন বাবু সে শক্তি তেমন বিকাশ করিতে পারেন নাই। এই জন্য নিঃসন্দেহে আমি বলিতে পারি যে, তিনি একজন উচ্চদরের Mute poet বা সুষুপ্ত কবি ছিলেন।

ইটালীর উৎসবে ঠাকুর সাজান।

গুড্ ফ্রাইডের সময় ইটালীর উৎসব আরম্ভ হইল। পূর্ব্বদিকে এক বাগান বাড়ীতে উৎসবের স্থান নিরূপিত হইয়াছে। সকাল হইতেই লোকসমাগম হইতে লাগিল। বেলা ৯।১০টার মধ্যেই কয়েক শত লোক জমা হইল। নূতন স্থানে বহু পরিচিত লোকের সহিত সাক্ষাৎ হওয়ায় বেশ আনন্দ হইল। কিন্তু তখনও ঠাকুর-সাজান সমাপ্ত হয় নাই। পুকুরের কাছে প্রশস্ত স্থানে একটা মঞ্চ নির্ম্মিত হইয়াছে এবং তাহার উপর বাঁশের চেঁচাড়ি দিয়া প্রথম একটা আয়তন করা হইয়াছে।
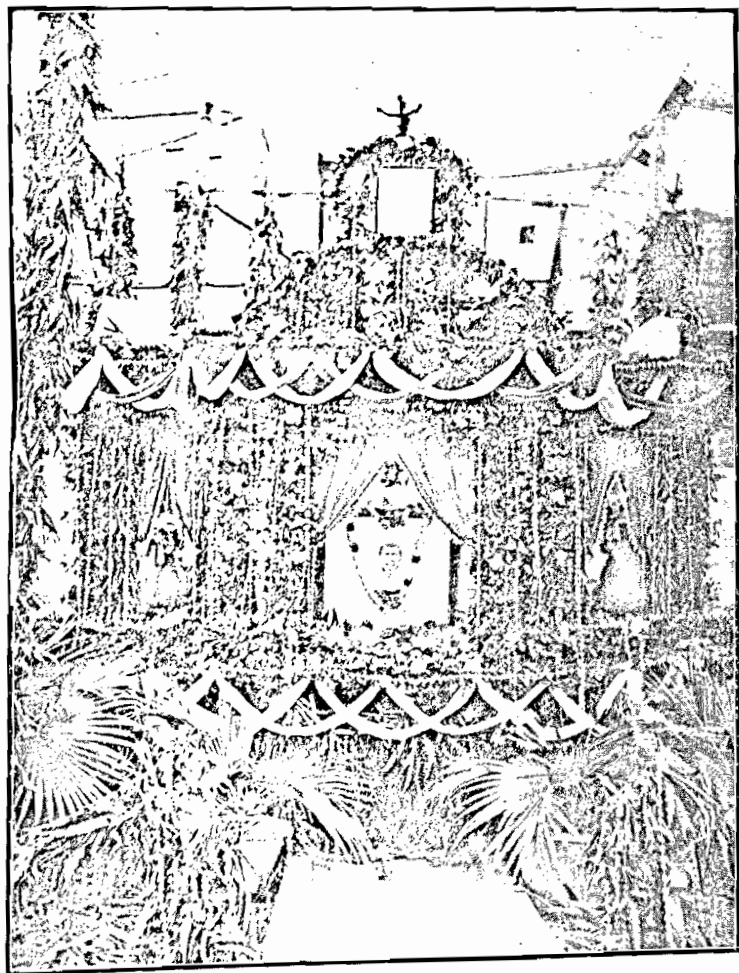
অর্চ্চনালয়ের প্রথম সময়ের
উৎসবে সজ্জিত ঠাকুর।

তাহাতে ঠাকুরদালান, নাটমন্দির, জোড়া থাম ও খিলান ইত্যাদি। সেই কাঠামটাকে আবার কুঁড়িফুলের মালা দিয়া সাজান হইতেছে।

আমি যাইয়া প্রথমে সকলের সহিত দেখা শুনা করিয়া ঠাকুর-সাজানর কাছে যাইলাম এবং স্থির হয়ে এক মনে দেখিতে লাগিলাম। খানিক ক্ষণ পরে দেবেন বাবু আসিয়া আমার পিছন দিকে দাঁড়ালেন। তিনি পরিচয় করাইয়া দিলেন যে, মীরাট হইতে দুইটী ভক্ত আসিয়া সমস্ত রাত্রি জাগিয়া নিজেদের ইচ্ছামত ফুল দিয়া মন্দির সাজাইতেছেন। ফুলের মন্দির বা বৃন্দাবনে দোলের সময় যাহাকে 'ফুলবাঙ্গলা' বলে, সেইরূপ করিতে তাঁহারা সুরু করিয়াছেন। একবার করিয়া কুঁড়ির মালা সাজাইতেছেন, আবার দূরে যাইয়া দেখিতেছেন এবং কোন ত্রুটী হইলেই আবার নূতন করিয়া ফুল দিয়া সাজাইতেছেন। দেখিলাম, দুই তিনটী ভদ্রলোক একেবারে বিভোর হইয়া সাজাইতেছেন; যেন বাহ্যজ্ঞান নাই।

দেবেন বাবুও সকলই স্থির হইয়া দেখিতেছিলেন এবং কোথায় কি ত্রুটী রহিল, তাহা বিশেষ ক'রে লক্ষ্য করিয়া সংশোধন করিয়া দিতেছেন। দেবেন বাবুর কথা গুলি বড় সুন্দর হইতেছিল। ইহাতে আমার খুব আনন্দ হওয়ায় মাঝে মাঝে দুই একটী কথা বলিতে ছিলাম, তাহাতে তিনি হাসিতেছিলেন। তারপর দেবেন বাবু স্পষ্টাপষ্টি আমাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "মহিন! কোন্ খানে কি ভাল করা যেতে পারে, কি অদল বদল করা যেতে পারে, তোমার কি মত বল না?"

আমি নিজের বিবেচনা-মত দুই চারিটী কথা বলিলাম, দেখিলাম—তাহা দেবেন বাবুর মনের মত হইয়াছে। তখন দেবেন বাবু এক হাতের উপর আর এক হাত দিয়া তালি দিতে দিতে উচ্চৈঃস্বরে হাস্য করিয়া বলিলেন, "ঠিক্ বলেছ—beauty (সৌন্দর্য্য) কয় শালা

বোঝে? এই যে কটা লোক সমস্ত রাত্রি জেগে ফুল সাজাচ্ছে ওদের কদর কটা লোক বুঝ্‌লে? এই যে এইটের ভিতর beauty একটা বেরিয়েছে, কয়টা লোক তার কদর করছে বা বুঝতে পার্‌ছে? যত ভক্ত এসেছেন, কেবল প্রসাদেরই মাহাত্ম্য দেখেন, কিন্তু beauty কটা লোকে বোঝে? কি সুন্দর ভাবে সাজান হচ্ছে—কটা লোক তা বুঝ্‌তে পেরেছে? জিনিষটার ভিতর থেকে যে একটা নূতন রকমের beauty বেরল, সেটা কেউ দেখ্‌ছে না—appreciate (কদর) কর্‌ছে না।

দেবেন বাবুর যে একটা উচ্চ শ্রেণীর সৌন্দর্য্যের জ্ঞান ছিল, তাহা এই দিনের ব্যাপার থেকে বুঝ্‌তে পারা যায়। নিজে যদিও চিত্রকর ছিলেন না, কিন্তু যাহাকে বলে 'সমজ্‌দার লোক' তাহা তাঁর মত খুব কমই দেখিতে পাওয়া যায়। অধিকাংশ লোক হচ্ছে 'হাউড়ে'—সৌন্দর্য্যের প্রতি লক্ষ্য নাই, অথবা ভিতরে কোন উপলব্ধি হয় না। যে ঠিক্‌ ঠিক্‌ ভাবে সৌন্দর্য্য বুঝিতে পারে, সে ব্রহ্মকেও বুঝিতে পারে। দেবেন বাবুর এই সৌন্দর্য্যজ্ঞান অতি আশ্চর্য্য দেখেছি।

ওঁ মধু ওঁ মধু ওঁ মধু

কতিপয় দার্শনিকগ্রন্থ।

দুর্লভ দার্শনিক গ্রন্থাবলী

বেদান্তশাস্ত্র আলোচনার ইচ্ছা হইলে
নিম্নলিখিত গ্রন্থগুলি অবশ্যপাঠ্য—

—:*:—

১। আচার্য্য শঙ্কর ও রামানুজ।

ইহাতে (ক) বেদান্তদর্শনের অদ্বৈতমত এবং বিশিষ্টাদ্বৈত-মতের পরিচয়, বীজনির্ণয় ও তুলনা আছে। (খ) অদ্বৈত-মতের আচার্য্য শঙ্করের ও বিশিষ্টাদ্বৈতমতের আচার্য্য-রামানুজের জীবনচরিত এবং তাহাদের নানারূপ বিশ্লেষণমুখে সামান্যবিশেষভাবে তুলনা আছে। (গ) উক্ত আচার্য্যদ্বয়ের সময় অর্থাৎ খৃষ্টিয় ৭ম ও ১০ম শতাব্দীতে ভারতের ইতিহাস ও মানচিত্র আছে। (ঘ) উভয়মতে সাধনপ্রণালী বিশদভাবে বর্ণিত হইয়াছে এবং (ঙ) ঐ সময় ভারতে প্রচলিত যাবতীয় ধর্ম্মমতের বিবরণ আছে। এই গ্রন্থখানি পাঠে বেদান্তশাস্ত্রের রহস্য অতি সূক্ষ্মভাবে জানা যাইবে। বিশ্লেষণমুখে এ জাতীয় মততুলনা ও জীবনচরিত্র তুলনা এই প্রথম। ১১০০পৃষ্ঠা মূল্য ৫৲ টাকা। প্রণেতা—পণ্ডিত শ্রীরাজেন্দ্র নাথ ঘোষ।

২। শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা (পদ্যানুবাদ)।

ইহাতে গীতার পাঠক্রম, মূল শ্লোক, অন্বয়মুখে বাঙ্গালা অনুবাদ ও কাশীদাসী পয়ার ছন্দে গীতার শ্লোকসম্বন্ধ, শ্লোকানুবাদ ও ব্যাখ্যা আছে। এই ব্যাখ্যামধ্যে যাবতীয় দার্শনিকতত্ত্ব, এবং বেদান্তানুকূল সাধনতত্ত্ব, অপরাপর

মতবাদ খণ্ডন, অদ্বৈতমতের শ্রেষ্ঠতা—শাঙ্করভাষ্য এবং তদনুকূল যাবতীয় টীকা, যথা—শ্রীধরী, মধুসূদনী, ব্রহ্মানন্দী, আনন্দগিরি, এবং শঙ্করানন্দী টীকাগুলির তাৎপর্য্য বর্ণনমুখে বর্ণিত হইয়াছে। বাঙ্গালাপদ্যে এরূপ দার্শনিক তত্ত্ববর্ণন এ পর্য্যন্ত হয় নাই। এই একখানি পুস্তক পড়িলে বেদান্তের বহু প্রধান প্রধান গ্রন্থপাঠের ফল হইবে। ইহার পাঠে সুধী মনীষীবৃন্দও আনন্দ পাইবেন—সন্দেহ নাই। ১১০০পৃষ্ঠা, পকেট আকার, মূল্য ১৲ টাকা। রচয়িতা—পণ্ডিত শ্রীরাজেন্দ্র নাথ ঘোষ।

৩। শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা (কেবল পদ্যানুবাদ)।

ইহা উক্ত গীতারই সংক্ষিপ্ত ও সরল সংস্করণ। ইহাতে গীতার অর্থসংক্রান্ত যাবতীয় কথাই অতি সরল, সুললিত পদ্যে বর্ণিত আছে। ইহাকে অতি যত্নে আবালবৃদ্ধবণিতা সকলেরই অত্যন্ত সুখপাঠ্য করা হইয়াছে। যাঁহারা ক্লেশস্বীকার না করিয়া সহজে গীতার্থ বুঝিতে চাহেন, তাঁহাদের পক্ষে এতদপেক্ষা উৎকৃষ্ট গ্রন্থ মিলিবে না। ৪৮০ পৃষ্ঠা পকেট আকার, মূল্য ॥৵০ আনা মাত্র। রচয়িতা—পণ্ডিত শ্রীরাজেন্দ্র নাথ ঘোষ।

৪। নব্যন্যায়—ব্যাপ্তিপঞ্চক।

ইহাতে ব্যাপ্তির পাঁচটী লক্ষণ আছে। মূল, মাথুরী টীকা এবং শিরোমণির দীধিতী টীকার বঙ্গানুবাদ আছে এবং যাবতীয় ফক্কিকা ও তাহার উত্তর আছে। ভূমিকামধ্যে ন্যায়শাস্ত্রের ইতিহাস, সময়নির্ণয়, গ্রন্থকারগণের জীবনচরিত, তর্কামৃতের অনুবাদ প্রভৃতি বহু অত্যাবশ্যকীয় বিষয়ের সমাবেশ আছে। ৬২৪পৃষ্ঠা রয়াল আকার মূল্য—৫৲ টাকা। অনুবাদক—পণ্ডিত শ্রীরাজেন্দ্র নাথ ঘোষ।

৫। তর্কামৃত বা ন্যায়প্রবেশ ১ম ভাগ।

ইহাতে মহামতি জগদীশ তর্কালঙ্কারকৃত মূল তর্কামৃত ও তাহার বিশদ বঙ্গানুবাদ আছে। প্রথমপাঠার্থীর পক্ষে ইহা অতি উপাদেয় পাঠ্য পুস্তক। মূল্য ॥০ আনা মাত্র। অনুবাদক—পণ্ডিত শ্রীরাজেন্দ্র নাথ ঘোষ।

৬। বেদ মানিব কেন?

ইহাতে বেদের প্রামাণ্য অর্থাৎ বেদ যে অভ্রান্ত, অপৌরুষেয় এবং নিত্য তাহা অকাট্য যুক্তির দ্বারা প্রামাণিত করা হইয়াছে। বেদ না মানিলে হিন্দু হয় না, বেদ না বলিলে নাস্তিক নামে অভিহিত হইতে হয়। বর্ত্তমান শিক্ষায় বেদ মনুষ্যরচিত বা চাষা ঋষিদের গান বলিয়া বুঝান হইতেছে, আর তাহার ফলে ধর্ম্মকর্ম্মের মূল উৎপাটিত করা হইতেছে। প্রত্যেক হিন্দুর এ বিষয়ে সত্য ধারণা অর্জ্জন করা উচিত। প্রণেতা—শ্রীরাজেন্দ্রনাথ ঘোষ। মূল্য—।০ আনা মাত্র।

৭। শাস্ত্রসারসংগ্রহঃ।

অর্থাৎ বেদান্তের চারিখানি সর্ব্বশ্রেষ্ঠ গ্রন্থ, যথা—

(ক) খণ্ডনখণ্ডখাদ্যম্, মূল, টীকা, অনুবাদ ও তাৎপর্য্যসহ। অনুবাদক—মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত লক্ষ্মণশাস্ত্রী দ্রাবিড়। প্রায় ২০০শত পৃষ্ঠা।

(খ) চিৎসুখী—মূল, টীকা, অনুবাদ ও তাৎপর্য্যসহ। অনুবাদক—মহামহোপাধ্যয় শ্রীযুক্ত লক্ষ্মণশাস্ত্রী দ্রাবিড়। প্রায় ২০০শত পৃষ্ঠা।

(গ) সিদ্ধান্তলেশসংগ্রহঃ—মুল, টীকা, অনুবাদ ও তাৎপর্য্যসহ। অনুবাদক—মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত প্রমথনাথ তর্কভূষণ। প্রায় ২০০শত পৃষ্ঠা।

(ঘ) অদ্বৈতসিদ্ধিঃ—মূল, লঘুচন্দ্রিকা টীকা, অনুবাদ ও তাৎপর্য্যসহ। অনুবাদক—মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত প্রমথ নাথ তর্কভূষণ। প্রায় ২০০শত পৃষ্ঠা।

এই চারিখানি গ্রন্থ ৫ খণ্ডমাত্র প্রকাশিত হইয়াছে। মূল্য একত্রে ৫৲ টাকা।

৮। শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা।

মূল, শ্রীধরস্বামীর টীকা অন্বয়মুখে সাজান, এবং আকাংক্ষা সহিত শ্লোকানুবাদ ও দার্শনিকতত্ত্বপূর্ণ টীপ্পনীসহ। অনুবাদক—ব্রহ্মচারী প্রাণেশকুমার। সহজে গীতার্থ বুঝিতে হইলে এবং শ্রীধরের টীকার মর্ম্মগ্রহণ করিতে হইলে এতদপেক্ষা উৎকৃষ্ট সংস্করণ আর নাই। মূল্য ॥৵০ আনা।

৯। শ্রীশ্রীচণ্ডী।

মূল, অন্বয়মুখে বঙ্গানুবাদ, প্রয়োগবিধি এবং টীপ্পনীসহ। চণ্ডীর এরূপ বিশুদ্ধ, সরল ও উৎকৃষ্ট আর নাই। অনুবাদক—ব্রহ্মচারী প্রাণেশকুমার। মূল্য ॥৵০ আনা।

১০। মহাত্মা দেবেন্দ্রনাথ।

শ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংসদেবের অন্তরঙ্গ ভক্ত দেবেন্দ্রনাথ মজুমদার মহাশয়ের বহু চিত্রসমন্বিত জীবনচরিত। লেখক—ব্রহ্মচারী প্রাণেশকুমার। মূল্য—২৲ ও ১॥০ টাকা।

১১। দেবগীতি।

মহাত্মা দেবেন্দ্রনাথবিরচিত পরমার্থবিষয়ক অতি সুললিত সঙ্গীতসমূহ। মূল্য—।৵০ আনা।

১২। শাঙ্করগ্রন্থরত্নাবলী ১ম ভাগ।

ইহাতে ভগবান্ শঙ্করাচার্য্যের রচিত ৩৬ অমূল্য উপদেশ-পূর্ণ ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র গ্রন্থ আছে। মূল, টীকা, অনুবাদ ও তাৎপর্য্যাদি

সহ। ইহাদের মধ্যে বহু গ্রন্থ এ পর্য্যন্ত বঙ্গভাষায় অনূদিত হয় নাই। অনুবাদক পণ্ডিতপ্রবর—শ্রীযুক্ত অক্ষয়কুমার শাস্ত্রী পঞ্চতীর্থ; ৭১৮পৃষ্ঠা, মূল্য ৩৲ টাকা।

১৩। শাঙ্করগ্রন্থরত্নাবলী ২য় ভাগ।

ইহাতে ভগবান্ শঙ্করাচার্য্যকৃত শতাধিক শ্লোকের ৭ খানি অমূল্য উপদেশপূর্ণ অদ্বিতীয় গ্রন্থ আছে। মূল, টীকা, অনুবাদ তাৎপর্য্যাদিসহ। ইহাদের মধ্যে কয়েকখানি গ্রন্থ এ পর্য্যন্ত বঙ্গভাষায় অনূদিত হয় নাই। ৭২৪ পৃষ্ঠা, মূল্য—৩৲ টাকা।

১৪। অদ্বৈতসিদ্ধিঃ।

মূল, বালবোধিনী টীকা, অনুবাদ ও বিশদ তাৎপর্য্যসহ মুদ্রিত হইতেছে। অনুবাদক ও টীকাকার সংস্কৃত কলেজের বেদান্তশাস্ত্রের অধ্যাপক পণ্ডিতপ্রবর শ্রীযুক্ত যোগেন্দ্র নাথ তর্কতীর্থ। সম্পাদক শ্রীরাজেন্দ্রনাথ ঘোষ। এই টীকামধ্যে এই দুরূহ গ্রন্থখানিকে বুঝাইবার জন্য বিশেষ যত্ন করা হইয়াছে। অদ্বৈতসিদ্ধির যে টীকা ও 'টীকার টীকা' আছে তাহা পড়িয়া মূলগ্রন্থের মর্ম্মাবগতি সহজসাধ্য নহে। এইজন্য এই বালবোধিনী টীকা রচিত হইয়াছে। ইহার পাঠে উক্ত প্রাচীন টীকাগুলি সহজবোধ্য হইবে। তাৎপর্য্যমধ্যে বঙ্গ-ভাষায় উক্ত সকল টীকারই প্রায় সকল কথাই আছে। অদ্বৈতসিদ্ধি যেমন দুরূহ গ্রন্থ, ইহাকে বুঝাইবার জন্য এই চেষ্টাও তদ্রূপ অভূতপূর্ব্ব সন্দেহ নাই। মূলগ্রন্থসহ সম্পাদক-কৃত একটী ৪৫০ পৃষ্ঠাব্যাপিনী ভূমিকা আছে, তাহাতে গ্রন্থপাঠে প্রবৃত্তি ও সামর্থ্য উৎপাদনের জন্য যথাসম্ভব সকল কথাই বলা হইয়াছে। যথা—১। ভূমিকার লক্ষণ ও উদ্দেশ্য নির্ণয়, ২। অদ্বৈতচিন্তাস্রোতের আমূল ইতিহাস এবং ১৮১ জন

আচার্য্য ও পণ্ডিতপ্রবরগণের পরিচয়, ৩। গ্রন্থকার মধুসূদ
সরস্বতী মহাশয়ের আবির্ভাবকালনির্ণয়, ৪। গ্রন্থকারে
সম্পূর্ণ জীবনচরিত, ৫। গ্রন্থপ্রতিপাদ্যবিষয়ের পরিচয়, ৬
গ্রন্থপাঠের ফলে ব্রহ্মজ্ঞানে অবশ্যম্ভাবিত্ব, ৭। সমগ্র নব্য
প্রাচীন ন্যায়শাস্ত্রের পরিচয়মুখে বেদান্ত ও মীমাংসা শাস্ত্রে
তুলনামূলক পরিচয়, ৮। অপরাপর ২২।৩৩ খানি প্রচলি
দার্শনিকমতের সংক্ষিপ্ত পরিচয়, ৯। দ্বৈতবাদী মাধ্বমতের পরিচয়
এবং ১০। দ্বৈতমতের সহিত অদ্বৈতমতের তুলনা,—প্রভৃ
বিষয়গুলি মুখ্যভাবে বর্ণিত হইয়াছে। এই ভূমিকা ও এ
অদ্বৈতসিদ্ধিপাঠে বেদান্তের মতটী নানামতবাদসহ বিশদভাবে
জানিতে পারা যাইবে। অদ্বৈতবেদান্তের এতদপেক্ষা উৎকৃ
ও সর্ব্বাবয়বসমাম্বিত সর্বতোমুখী অকাট্য যুক্তিপূর্ণ গ্রন্থ আ
নাই। মনে হয়—ভবিষ্যতে বুঝি আর হইতেও পারিবে না
বেদান্তসিদ্ধান্তের চরম সূক্ষ্মতা এবং পরিষ্কার এই বাঙ্গালী
কীর্ত্তি অদ্বৈতসিদ্ধান্তেই পূর্ণতাপ্রাপ্ত। বেদান্তের চরম সিদ্ধা
ইহাতেই পরিস্ফুট। ১৫০০ হাজার পৃষ্ঠায় সম্পূর্ণ হইবে-
আশা হয়। সহস্র পৃষ্ঠা মুদ্রিত হইয়াছে। মূল্য—৬৲ টাক
হইতে ৮৲ টাকার মধ্যে হইবার সম্ভাবনা।

প্রাপ্তিস্থান—প্রকাশকের নিকট ও কলিকাতার
প্রসিদ্ধ পুস্তকালয় সমূহ।

কমারসিয়াল গেজেট প্রেস.
৬নং পার্শিবাগান লেন, কলিকাতা।
১লা মাঘ, সন ১৩৩৭।

প্রকাশক—
শ্রীক্ষেত্রপাল ঘোষ।